সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ

ব্যক্তি ও শিল্পী

ড. নন্দকুমার বেরা, এম এ. [ট্রিপল] পি-এইচ. ডি.
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রামলক্ষ্মণ সিংহ যাদব কলেজ, রাঁচি

পরিবেষক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
১ জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীরুশো মিত্র
সাহিত্যপ্রকাশ
৬০ জেমস লঙ সরণি
কলিকাতা ৩৪

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

মুদ্রক :
শ্যামল সাউ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

: যাঁর হাতে গ্রন্থটি তুলে দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম :

সেই স্নেহময়ী ৺মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

বাংলা ও হিন্দী এই দুই প্রতিবেশী সাহিত্যে কিছু স্রষ্টার নাম যুগপৎ উচ্চারিত হয়ে থাকে এবং সেটা নিশ্চয়ই অকারণে নয়। বাংলার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র এবং হিন্দী সাহিত্যের স্মরণীয় স্রষ্টা প্রেমচন্দের নাম অথবা বাংলার নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং হিন্দী নাট্যকার জয়শঙ্কর প্রসাদের নাম এই যুগ্ম-স্মরণের তালিকাভুক্ত। সেই তালিকায় আরো দুটি নাম সংযোজিত হওয়ার দাবী রাখে। আমরা অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের সতীনাথ ভাদুড়ী এবং হিন্দী সাহিত্যের ফণীশ্বরনাথ রেণুর কথা বলতে চাইছি। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা দুজনেই সমকালীন এবং সমস্থানিক। আরো মজার ব্যাপার এই যে, উভয়ের সাহিত্য-ভূগোলের মধ্যেও এক আশ্চর্য ঐক্য ও সংহতি। বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলটি শুধু যে এঁদের বাসভূমি তাই নয়, এঁদের সৃষ্ট সাহিত্যেরও পরিবেশভূমি। লক্ষণীয় যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক সব উপন্যাসেই উভয়েই এই পরিচিত পরিবেশের বাইরে পা ফেলেননি। যে পরিবেশটিতে তাঁরা আজন্ম নিঃশ্বাস নিয়েছেন সেই পরিবেশটির মধ্যে তাঁদের মানসসন্তান-সন্ততি-গুলিও জন্মগ্রহণ করেছে, প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, রেণু আবাল্য সতীনাথের সংস্পর্শে ছিলেন। কারাকক্ষেও উভয়ে একত্রে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রেণু স্বয়ং সতীনাথকে তাঁর সাহিত্যের গুরু বলে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণে সমকালীন এবং সমস্থানিক এই উভয় লেখকের সাহিত্য সাধনায় পারস্পরিক প্রভাব পড়ারই কথা এবং সে প্রভাব আছেও। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, একে অপরের নিছক প্রতিচ্ছবি। উভয়ের মধ্যে মিল যেমন আছে অমিলও তেমনি আছে। এবং সে অমিলের ক্ষেত্রেই তাঁদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশ। বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের এই দুই প্রতিভাবান স্রষ্টার তুলনামূলক আলোচনা শুধু উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় সংহতির পথেও এক অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

স্মরণ রাখতে হয় যে, বাংলা ও হিন্দী একই মাতামহীর দুই দৌহিত্রী। পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গ পরিচয় যত প্রতিষ্ঠিত হয় ততই মঙ্গল। ড নন্দকুমার বেরা এই মঙ্গলকর্মের যোগ্য অধিকারী যেহেতু বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষা-সাহিত্যেই তাঁর সমান দখল। ড. বেরা এই কর্মটি কতখানি আন্তরিকতা ও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন সে বিচারের ভার বিদগ্ধ পাঠকের।

শ্রী চিত্তরঞ্জন লাহা

নিবেদন

অবশেষে 'সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ : ব্যক্তি ও শিল্পী' প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটির শিরোনাম দেখে বিষয়বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকেরই নানারূপ বিভ্রান্তি হতে পারে। এ বিষয়ে একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। বাংলা ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী ও হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর জন্ম বিহারের পূর্ণিয়াতে। উভয়ের জীবনের অধিকাংশ সময় এখানেই অতিবাহিত হয়েছে। তাই উভয়ের সৃষ্ট উপন্যাসে এই বিশিষ্ট অঞ্চলের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা বিধৃত হয়েছে। ফণীশ্বরনাথ নিজেই সতীনাথকে 'গুরু' বলে স্বীকার করেছেন।। শৈশব থেকেই 'রেণু' সতীনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন। উভয়ে দীর্ঘ দিন একই জেলে একই কারাকক্ষে সময় অতিবাহিত করেছেন।

আমি এই গ্রন্থে উভয়ের জীবন এবং সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সাহিত্যিকদের জীবন পর্যালোচনা ছাড়া তাঁদের সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন করা যায় না। তাই উভয়ের সাহিত্য সৃষ্টির আলোচনার তাগিদে উভয়ের। জীবনের কিছু ঘটনা এবং মূল্যবান তথ্য বর্তমান গবেষণা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।

ফণীশ্বরনাথ রেণু নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই লেখেননি। এজন্য তাঁর জীবনের তথ্য সংগ্রহ করতে আমায় যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবনী সম্পর্কে হিন্দীতে দিল্লীর রাজকমল প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'রেণু স্মরণ এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রন্থ' ও 'ধর্মযুগ', 'ইণ্ডিয়ান নেশন' এবং 'দিনমান' ও 'সারিকা'তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া আর কোন গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয়নি। এ ব্যাপারে সিমলী মুরারপুর পাটনা সিটির শ্রীসত্যদেব নারায়ণ সিন্হা এবং রেণুর পত্নী শ্রীমতী লতিকা রেণু—রেণুর জীবনের কয়েকটি অমূল্য স্মৃতিচিত্র দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ ড. দীনেশ্বরপ্রসাদ এবং দিল্লীর জাকির হোসেন কলেজের হিন্দীর বিভাগীয় অধ্যক্ষ ড. কমলকিশোর গোয়েঙ্কা মহাশয় তাঁদের কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝখানে আমাকে উপদেশ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমার প্রণাম জানাই।

আর যাঁর সুনিপুণ নির্দেশনা ও সস্নেহ আশীর্বাদের ভিত্তিভূমিতেই এই গবেষণা-গ্রন্থটির প্রতিষ্ঠা হলো সেই দেবতুল্য পরম শ্রদ্ধাভাজন রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় অধ্যক্ষ ড. চিত্তরঞ্জন লাহা মহাশয়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁর তত্ত্বাবধান ব্যতীত এই গবেষণার কাজে হাত দেওয়া এবং গ্রন্থটি প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণাকর্মটির জন্য আমাকে পি-এইচ. ডি. উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আমার পরীক্ষক ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর-প্রাপ্ত বাংলা বিভাগীয় অধ্যক্ষ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ হয়েছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. রামরঞ্জন সেন মহাশয়ের নির্দেশনায়। এই গ্রন্থের সঙ্গে যে এঁদের নাম জড়িত রয়েছে তা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এঁদের সকলের প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটি প্রকাশে ডঃ সনৎকুমার মিত্র এবং প্রুফ সংশোধনে শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

সর্বশেষে উল্লেখ্য যে, আমার পত্নী শ্রীমতী যশোদার অকুণ্ঠ সহায়তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আমি এই গবেষণাটি সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি।

ওল্ড পীস রোড
রাঁচি

শ্রীনন্দকুমার বেরা

● সূচীপত্র ●

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তি জীবন ও লেখক জীবন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে যেমন সতীনাথ ভাদুড়ী, হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যে তেমনি ফণীশ্বরনাথ রেণুর মতো শক্তিমান ঔপন্যাসিক খুবই কম। উভয়েই উত্তর বিহারের এক খণ্ড-অঞ্চল [পূর্ণিয়া]-কে উপন্যাসের ঘটনাভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা আঞ্চলিক উপন্যাসের কোনো ক্ষেত্রেই ভাদুড়ী মশায় বা রেণু, ঐ খণ্ড অঞ্চলের সীমারেখা অতিক্রম করেননি। উভয়েই একই অঞ্চলের অধিবাসী। প্রথম থেকেই ভাদুড়ী মশায়ের পরিবারের সঙ্গে রেণুর পরিবারের মধ্যে একটা বিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কও ছিল। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন দুজনে একসঙ্গে একই জেলে কাটিয়েছেন। ভাদুড়ী মশায়েরই প্রেরণায় রেণু উপন্যাস রচনা করেন। 'রেণু' নিজে ভাদুড়ী মশায়কে তাঁর সাহিত্যগুরু বলে শ্রদ্ধা করতেন।[১] উভয়ের ব্যক্তিজীবন ও লেখকজীবনের মধ্যে বেশ কিছু মিল ও অমিল আছে। উভয়ের সাহিত্যকৃতির আলোচনার নিরিখে উভয়ের ব্যক্তিজীবন ও লেখকজীবনের তুলনামূলক পর্যালোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৩১৩ সালের বিজয়া দশমীর দিন বৃহস্পতিবার ১১ই আশ্বিন (ইং ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) সন্ধ্যাবেলা উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া জেলার 'ভাট্টাবাজার'-এ সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম। পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী এবং মাতা রাজবালা দেবী। আট ভাই-বোনের মধ্যে সতীনাথ ছিলেন ষষ্ঠ, তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ; তাঁর অগ্রজ দুই ভাইয়ের নাম শিবনাথ (১৮৯৫—১৯৬৭) এবং ভূতনাথ (১৯০২)। বড়ো তিন বোন হলেন ভবরাণী (১৮৯৩—১৯৪৩), করুণাময়ী (১৯০১-১৯২৮), রাধালতা (১৯০৪) সতীনাথের পরের দুই বোন শুভময়ী (১৯০৮—১৯৩৪), সুনীতি (১৯১০—১৯১৩)।

পূর্ণিয়া সতীনাথের জন্মস্থান হলেও তাঁদের আদি বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরের ভাদুড়ী বংশ বেশ সম্ভ্রান্ত এবং বর্ধিষ্ণু পরিবার ছিল। সতীনাথের পিতামহ শশধর খাঁ ভাদুড়ী (মৃত্যু ১৯০৪) কৃষ্ণনগরের ধনী-মানী-প্রতিষ্ঠিত

গৃহস্থ ছিলেন। সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণ (১৮৬৯) কৃষ্ণনগরেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা মুক্তকেশী দেবীও ছিলেন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। তিনি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ এবং সমাজ সংস্কারক রামতনু লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রসাদ লাহিড়ীর কন্যা। সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী অতি কৃতি ছাত্র ছিলেন। ১৮৯০ সালে স্বর্ণপদক নিয়ে কেমিষ্ট্রিতে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ইন্দুভূষণ, চন্দ্রভূষণ এবং জ্যোতিভূষণ—তিন ভাই একই বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কোন কারণে প্রিন্সিপালের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ইন্দুভূষণ অধ্যাপনা ছেড়ে আইন পাঠ শুরু করেন এবং আইনজীবী হয়ে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে জীবিকার জন্য দেশ ছেড়ে পূর্ণিয়ায় আসেন। সেই থেকেই পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজারে সতীনাথদের বাসস্থান।

"পূর্ণিয়া শহরে বাঙ্গালী সমাজের পত্তন হয় আজ থেকে এক শতাব্দী আগে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকারের চাকরিতে অফিসের কেরাণী (সে যুগে 'বাবু' সম্বোধনে সম্মানিত), কোর্টের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার হিসেবে তখন পূর্ণিয়ার বাঙ্গালী সমাজ গড়ে ওঠে।..."[২]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগ অবসানে কুইন ভিক্টোরিয়ার হাতে যখন শাসন-ভার আসে তখন রামবাগ থেকে সদর কাছারি বর্তমান পূর্ণিয়া শহরের ভাট্টা-বাজারের কাছে চলে আসে। এই পূর্ণিয়া কোর্টে, কিষণগঞ্জ ও আরারিয়া মহকুমা হাকিমের অফিসে চাকরি নিয়ে গড়ে ওঠে এই জেলার বাঙ্গালী সমাজ।

সেই সময় এই অঞ্চলে দুশোর বেশি নীলকর সাহেব স-পরিবারে বসবাস করতেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ শাসনের সে এক বিচিত্র যুগ।

কিন্তু এরই মাঝে বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী সম্মানের স্থান পেয়েছিল স্থানীয় জন-জীবনে। পূর্ণিয়া শহরে সেই সময়কার মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সুর, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাধিকা দে, ভুবন লাহিড়ী, পার্বতী সেন, কামাখ্যাপ্রসাদ ঘোষ, জানকী ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন।

ইংরেজ রাজত্বের সেই স্বর্ণ-যুগে পূর্ণিয়া কোর্ট উকিলদের স্বর্গ। প্রচুর পয়সা, সাহেবদের কাছ থেকে সুনজর ও সম্মান পেতো বাঙ্গালীবাবুরা। ভাগলপুর থেকে বিখ্যাত লেখক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মুঙ্গের থেকে লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয়) পূর্ণিয়ায় এসে অল্প কিছুকাল স্থানীয় কোর্টে ওকালতি করেছিলেন।

এই পরিবেশে কৃষ্ণনগর থেকে পূর্ণিয়ায় এলেন প্র্যাকটিস করতে শ্রীইন্দুভূষণ ভাদুড়ী।[৩]

সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণের খুবই খ্যাতি ছিল। তাঁর সম্বন্ধে প্রখ্যাত হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর পিতা শীলানাথবাবু স্মৃতিচারণ করেছেন—

"...আর ইন্দুবাবুর কথা? দেওয়ানী কোর্ট ছাড়া ফৌজদারী কাচ্‌হারির ধারে কাছেও যাবেন না কোনদিন—হাজার টাকা ফী দিলেও নয়। কিন্তু নিজের ভাই বা ভাতীজার ভাত মারতে চায় এমন মক্কেল শ্রীইন্দুভূষণ ভাদুড়ীর কাছে ভুলেও যেন না যায়। যেমন গিয়েছিল আমাদের গ্রামের এক মামলাবাজ। দলিলের এক পাতার আধা 'মিশিল' পড়েই ইন্দুবাবু খপ করে ওর হাতের কব্জি ধরে ফেলেছিলেন—তুম অপনেকে ব্রাহমণ কহতা হ্যায়? মরা হুয়া ভাই কা হক মার কর ওস্কা নাবালগ কে মারনা চাহতা হ্যায়? ভাগো—।"[৪]

পূর্ণিয়া জেলা স্কুলে সতীনাথের লেখাপড়া শুরু হয়। তাঁর দাদা ভূতনাথও এখানেই পড়েছেন।[৫] মেধাবী ও কৃতী ছাত্র হিসেবে স্কুলে সতীনাথের বিশেষ নাম ছিল। হেডমাস্টার থেকে সহকারী শিক্ষক পর্যন্ত সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন সতীনাথ। সংস্কৃত পণ্ডিত তুরন্তলাল ঝা তাঁকে 'ক্লাসকী রোশনী' বলে ডাকতেন।[৬]

সতীনাথের সহপাঠী ও সমসাময়িক ছিলেন কৃপানাথ ভাদুড়ী, সুধীর চট্টোপাধ্যায় (নীলুবাবু), তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীপদ মৈত্র, ফণীগোপাল সেন, প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়।

"সতীনাথের পিতা ইন্দুবাবু খুবই গম্ভীর, রাশভারী লোক ছিলেন। সতীনাথ পিতাকে ভয় করতেন এবং অনেক সময় চুপি চুপি খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ীতে যাওয়া আসা করতেন। সহপাঠীরাও ভয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতো না। সতীনাথকে বাড়ী থেকে ডাকতে গেলে তারা ভয়ে ভয়ে দূর থেকে খোঁজ নিতো। সতীনাথ যখনই ক্লাসের প্রথম পুরস্কার নিয়ে আসতেন, ইন্দুবাবু গম্ভীরভাবে বলতেন, 'বেশ আছে রেখে দাও।' সতীনাথ লেখাপড়ায় যা কিছু উৎসাহ, প্রেরণা তা মায় কাছ থেকে পেতেন। তিনি ছিলেন মাতৃ-ভক্ত। মাতার স্নেহে সতীনাথের জীবন ছিল সিঞ্চিত।"[৭]

ডিভিসন্যাল স্কলারশিপ নিয়ে প্রথম বিভাগে সতীনাথ ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে পাটনায় গমন করেন। দাদা ভূতনাথের আগ্রহে আই. এস-সি. পড়েন পাটনা সায়েন্স

কলেজে এবং ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে সেখান থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ম্যাট্রিকের তুলনায় এই পরীক্ষায় ফল খারাপ হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান থেকে আর্টসে চলে আসেন। এরপর পাটনা কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০-এ অর্থনীতিতে এম.এ. পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে। পাটনা আইন কলেজ থেকে ১৯৩১-এ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর পূর্ণিয়ায় ফিরে এসে সতীনাথ তাঁর পিতার সহকর্মী হিসেবে আইন ব্যবসায়কে তাঁর জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন।

পাটনা থেকে আইন পাশ করে সতীনাথ পূর্ণিয়ায় ফিরে আসেন ও পিতার সহকর্মী হিসেবে ওকালতি করেন (১৯৩৩—১৯৩৯) সাত বছর।

আইন ব্যবসায়ে সতীনাথের মন যত না প্র্যাকটিসের দিকে ছিল, তার চেয়ে অনেক গভীর ঝোঁক ছিল পড়াশুনার দিকে। বার লাইব্রেরীতে গিয়ে বইয়ের স্তূপের মধ্যে ডুবে যেতেন। তাঁর কাছে বার লাইব্রেরী হচ্ছে 'জেলার ব্রেণট্রাষ্ট'। মক্কেল ধরার প্রতি তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। কারণ তিনি তা ঘৃণা করতেন।

সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণবাবু ছিলেন রাশভারী লোক। সতীনাথ তাঁর কাছ থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন বরাবরই। একান্ত প্রয়োজনে বা জিজ্ঞাসিত হলে তবেই দু-চারটি কথাবার্তা হতো উভয়ের মধ্যে। কারণ ছোটবেলা থেকেই গম্ভীর প্রকৃতির পিতাকে তিনি ভয় করতেন, পারতপক্ষে তাঁর মুখোমুখি হতে চাইতেন না। মা তাঁর সবখানি জুড়ে ছিলেন। সতীনাথের লেখাপড়ায় যা কিছু উৎসাহ প্রেরণা তা জোগাতেন তাঁর মা। পাটনায় পড়ার সময়েই বারাণসীতে ডায়াবিটিসে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় (৪ এপ্রিল, ১৯২৮)। সাতদিন পরে সেখানেই কলেরায় মেজদিদি করুণাময়ীর মৃত্যু হয়। এই দুজনেই ছিলেন সতীনাথের প্রিয়। সেই মা ও দিদির অকালমৃত্যুতে সতীনাথ গভীর দুঃখ-বেদনায় মর্মাহত হন। মাতৃবিয়োগ অপূরণীয় হলেও মাতৃসমা দুই মহিলা পরবর্তী জীবনে সতীনাথের মায়ের অভাব পূরণ করেন। 'সতীনাথের জীবনে মাতার অভাববোধ পরবর্তী কালে দুইজন মহীয়সী মহিলা পূরণ করেন। এঁরা হলেন শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী এবং পরলোকগতা দাক্ষায়ণী দেবী। পূর্ণিয়ার খোকা ডাক্তার (ড. অমর ভট্টাচার্য) ও ড. গোপাল ভট্টাচার্যের মাতা। এই দুইজন মাতৃসমা নারীর স্নেহ-ভালবাসায় সতীনাথ মাতৃবিয়োগের ব্যথা ভোলেন।'[৮] আমার মনে হয়—কুসুমকুমারী দেবী ও দাক্ষায়ণী দেবীর প্রেরণায় সতীনাথ

'অচিন রাগিণী'র নতুন দিদিমা চরিত্র সৃষ্টি করেন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করেছি।

পড়াশুনা ছাড়া, খেলাধুলা, আড্ডা ছিল সতীনাথের জীবনচর্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে রাজনীতি, সমাজসেবা তাঁর অনেকখানি সময় কেড়ে নিয়েছিল। ভাল রান্না করতে পারতেন এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। সেলাই শুধু জানতেন না, ভালমন্দ বিচার ছিল নিখুঁত। বাগান, ফুলের শখ এবং নানা পশু-পাখি পোষার সখ ছিল। 'সবদিক দিয়ে সতীনাথ ছিলেন স্বয়ং নির্ভর; স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংতন্ত্র।' তিনি অপরের সেবায় সব সময় তৎপর ছিলেন, কিন্তু নিজের জন্য কারোর সেবা গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করতেন। নিজের জামাকাপড় নিজেই কাচতেন—খাবার এক গ্লাস জল নিজেই গড়িয়ে খাওয়ার অভ্যাস তাঁর ছিল।

১৯৩১ সালে আইন পড়ার সময় তাঁর বন্ধু বিভুবিলাস ভৌমিককে পূর্ণিয়া থেকে লেখা পত্রের খানিকটা উৎকলন করা হলে সতীনাথের সে সময়কার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বহুমুখী জীবনধারার ও চিন্তাভাবনার একটা পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে।

"ভাই বিভু,

...Daily routine বলছি—৭টা থেকে ৯টা good boy তাই পাঠ। ৯টা থেকে ১২টা—কেদার বাঁড়ুয্যে সাহিত্যিকের বাড়ী আড্ডা। খাওয়া দাওয়ার পর ছোট্ট একটা ঘণ্টা তিনেকের ঘুম। ঘুম থেকে উঠে চা পানের সঙ্গে খবরের কাগজ পাঠ। তারপর সান্ধ্যভ্রমণ। তারপর রাত ৯টা পর্যন্ত বাজী রেখে Bridge খেলা, রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সাহিত্যচর্চা। 'নবশক্তি' পড় না বোধ হয়। ওতে আমার লেখা গোটাকয়েক Satire বেরিয়েছে। এখন দ্বিগুণ উৎসাহে লিখছি। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি, এছাড়া একটু ড্রয়িংও করছি—নমুনা পাঠালাম। এই হচ্ছে বাঁধা routine। এছাড়া বাহাদুরী আর বাহবা নেবার জন্য কতকগুলি Public activity দেখাচ্ছি। টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও মারচি! একটা Public Trust Fund দেখবার জন্য এখানকার লোকদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি। পুজোয় বলি তুলে দেবার জন্য mass meeting আহ্বান করছি। বাড়ী এসে নিজেরই হাসি আসে এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর জন্য। জার্মান কিছুদিন শিখেছিলাম। সম্প্রতি

বইগুলি যাঁর কাছ থেকে এনেছিলাম, তাঁকে ফেরত দিয়েছি। এই তো গেল আমার কথা, জানতে চেয়েছিলে বলেই এত ফেনিয়ে বলতে সাহস করলাম।"[১০]

সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পূর্বে সতীনাথের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার যে স্কেচ পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যায় যে অনেকগুলি বিপরীত গুণের সমাবেশে তাঁর চরিত্র গঠিত। 'লিখতে তাঁর ভাল লাগে না। তবু সে হয়ে পড়েছিল একজন লেখক দশচক্রে পড়ে।'[১১] এটা লেখকের বিনয়। আমার মনে হয় ঠিক তেমনি বিনয় বলেই মনে হবে যখন লেখক বলেন—'ভালো লাগে তাঁর পড়তে, কিন্তু পড়া জিনিসটাকে হজম করার মতো ক্ষমতা আর ধৈর্য্য তার নেই।'[১১] পড়ার প্রতি তীব্র অনুরাগ, তাঁর খেলার প্রতি একটুও বীতরাগ সৃষ্টি করতে পারেনি।

'ছোটবেলা থেকেই সতীনাথের স্বাস্থ্য মাঝারি গোছের ছিল। বাইরে খেলা ধুলায় বেশী অংশ নিতেন না, তবে মার্বেল খেলায় ক্যারাম আর ব্যাডমিণ্টনে অসাধারণ নিপুণ ছিলেন।'[১৩]

'কোর্ট থেকে ফিরেই সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতেন টেনিস খেলতে।'[১৪]

এ সময়েই সতীনাথের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। সম্ভবত ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়। আরও কিছু লেখা বিচিত্রায়।[১৫] 'নবশক্তি' প্রকাশিত (৮ ভাদ্র, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ) প্রবন্ধ ইংলণ্ডে গান্ধীজী। 'বিচিত্রা'য় এ সময় ছাপা হয় প্রথম গল্প 'জামাইবাবু' (অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ সংখ্যা)।

সতীনাথ ভাদুড়ীর বন্ধু সহযোগী এবং শিষ্য-প্রতিম প্রখ্যাত হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' ৪২-এর আন্দোলনে তাঁর কারাবাস সঙ্গী তিনি লিখেছেন: "ভলি বলের দুই টিম ছিল। এক টিমের ক্যাপটেন ছিলেন—কে. বি. সহায় (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী), অন্য দলের অধিনায়ক রণেন রায় চৌধুরী। কে. বি. সহায় খেলাকে এত সিরিয়াসলি নিতেন যে খেলার মাঠের জের টেনে খাবার টেবিলে পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। আর রণেন রায় চৌধুরী কে. বি.-কে রোজ ক্ষেপিয়ে তুলবার চেষ্টাই করতেন। ভাদুড়ীজী প্রথম দুদিন নাকি কে. বি.-র সাইডে খেলেছিলেন। আর এতই খারাপ খেলেছিলেন যে কে বি, খেলার মাঠেই বলে দিয়েছিলেন—

'এ সাহেব। কাল সে আপ হামারি তরফ সে মত খেলিয়ে গা। সমঝে?'

প্রথম পরিচয়েই রণেনদা খেলার কথা তুলেছিলেন। ওঁর মুখেই শুনলাম—যদি সতীনাথ ভাদুড়ী প্রথম দিন ভাল খেলতে পারতেম তাহলে আমাদের

নয়াগোলোর টিমের 'টি' পর্যন্ত থাকত না। ভাদুড়ী মহাশয়ের পরের দিনের এবং প্রায় প্রত্যেক দিনের খেলা দেখে কে. বি.-র আর দুঃখের সীমা থাকে নি। একবার 'হামারে সাইড সে মত খেলিয়ে' বলে আবার 'হমারে সাইড সে খেলিয়ে কৃপা কর' বললেও ভাদুড়ীজী কদাপি রাজি হবেন না, ও জানে।"[১৬]

পিতার সহযোগীরূপে আইনচর্চায় নেমে (১৯৩২-৩৩) সতীনাথের জীবন-যাত্রা মোটামুটি একই ধরনের ছিল। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সাহিত্যের আড্ডা, ক্লাবে টেনিস খেলা, আর আদালতে হাজিরা। মক্কেলের জন্য ব্যাকুল ছিলেন তা বলা যায় না। তবে আইনে পারঙ্গম ছিলেন। 'মক্কেল ধরা বুদ্ধি তাঁর হয়নি এবং আদর্শবাদী মন এইসব ঘৃণা করতো। আইনের সম্বন্ধে সতীনাথের জ্ঞান ছিল গভীর। আইন শাস্ত্রের জটিল মারপ্যাঁচ তিনি সহজেই বুঝতেন এবং তখনকার দুর্ধর্ষ ব্যবহারজীবীরা—জ্যোতিষ ভট্টাচার্য, নিশিকান্ত সেন, শশি কোণার প্রমুখ—সতীনাথের কাছে অনেক জটিল তত্ত্ব জেনে নিতেন। তাঁর মেধা এত প্রখর ছিল যে জুনিয়র উকিল সত্ত্বেও জেলা জজেরা ওঁকে ডেকে নানা রুলিং জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন।'[১৭]

তাঁর বৌদি শ্রীমতী রেণুকা ভাদুড়ীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়—সাহিত্যচর্চা, টেনিস খেলা, ব্রিজ খেলা—এইসব নিয়েই পূর্ণিয়া শহরে তরুণ সতীনাথের জীবন কেটে যাচ্ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আত্ম-নির্ভর, সংসার উদাসীন, নিঃসঙ্গ, অন্তর্মুখী। অথচ বন্ধুদের সঙ্গে, ছোটদের সঙ্গে-তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে ব্যক্তিগত জীবনে কষ্টসহিষ্ণু আত্মনির্ভর মানুষ, পরের সেবায় উন্মুখ, কিন্তু নিজে অন্য কারো সেবা কখনো নিতেন না।

কলেজে ছাত্রাবস্থায় সতীনাথ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েননি। তবে এই সময় এম. এন. রায়ের রচনা পড়ে কিছুটা রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সতীনাথ নিজেও ছিলেন একটু 'ডেস্‌পারেট টাইপের' এবং পছন্দ করতেন চরমপন্থীদের—'গতানুগতিক জীবন লেখকের কোনদিন ভাল লাগে নি।'[২১]

পিতার জুনিয়ার রূপে ওকালতি করতে করতে হঠাৎ একদিন সমস্ত পূর্ণিয়াকে বিস্মিত করে সতীনাথ ঝাঁপিয়ে পড়লেন সক্রিয় রাজনীতিতে। (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯)। বাড়ী ছেড়ে আশ্রয় নিলেন পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত সর্বোদয় নেতা শ্রীবৈদ্যনাথ চৌধুরীর টিকাপটি আশ্রমে। তাঁর বাবার আদেশে বড় ভাই ভূতনাথ সতীনাথকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সতীনাথকে

ফেরাতে পারেননি। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ এই ন'বছর তিনি রাজনীতিতে ছিলেন, তারপর স্বেচ্ছায় রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন।

১৯৩৯-এর পূর্বে সতীনাথ ভাদুড়ী প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন নি, তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, ১৯৩৯-এর আগে ছাত্রাবস্থায় সমাজসেবামূলক অনেক কাজ করেছিলেন, যার কয়েকটি হলো, মিটিং সভা-সমিতিতে যোগদান ও ইস্কুলে পিকেটিং জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ। তবে তিনি যে গান্ধী-বাদকে সমর্থন করতেন এবং এক সময় নিজেকেও গান্ধীবাদে দীক্ষিত করেছিলেন তার মূলে ছিল ১৯২১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীজীর সাড়া জাগানো আবির্ভাব। সতীনাথ ভাদুড়ী তখন ছাত্র। চম্পারণ, খয়রা ও আমেদাবাদে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে এই অভিনব অহিংস আন্দোলনে সাফল্য লাভ করে গান্ধীজী সহজেই জনসাধারণের এবং কংগ্রেসের আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে নেতা হয়ে উঠলেন। তারপর বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে অহিংস সত্যাগ্রহকে গ্রহণ করে সারা ভারতব্যাপী এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীযুগ শুরু হয়।

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর এই ভূমিকা ছাত্র সতীনাথের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। তাই সে সময় প্রত্যক্ষভাবে তিনি 'রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়লেও এই গান্ধী আন্দোলন এবং গান্ধীজীর একটি ভাবমূর্তি তাঁর অন্তরে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। তাই সমাজসেবামূলক এবং অন্যায়-অবিচারমূলক কিছু কিছু কাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে দু-একটা সভা-সমিতি করে পিকেটিং করে বা কোন public trust fund দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে, কখনও বা পুজোর বলি তুলে দেওয়ার জন্য mass meeting করে সতীনাথ সম্ভবত রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ১৯৩০-৩১ থেকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মতো বিহারেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ণিয়াও সে স্পন্দন থেকে বাদ পড়েনি। গোকুলকৃষ্ণ রায় গড়ে তুললেন পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেস—'সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরী, ব্যবহারজীবী সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অনাথকান্ত বসু, পুণ্যানন্দ ঝা প্রমুখ কর্মীদের সাহায্যে কর্মবীর গোকুলবাবু কংগ্রেসের আন্দোলন পূর্ণিয়ায় গড়ে তোলেন। সতীনাথ সেই সময় প্রথম দিকে সক্রিয়ভাবে এসব ব্যাপারে যোগদান না করলেও বিক্ষিপ্তভাবে

কিছু ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। যেমন, স্থানীয় যুবকদের নিয়ে ভাট্টাবাজারে মদের দোকানে পিকেটিং। একদিন বন্ধু সুধীর চট্টোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন স্থানীয় যুবককে সঙ্গে করে সতীনাথ ভাট্টাবাজারের মদের দোকানে (স্থানীয় ভাষায় 'কালালী') পিকেটিং শুরু করলেন। দু-একদিন করার পর আবগারী বিভাগ থেকে লোকেরা এসে এই প্রতিরোধ ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের লাঠি দেখে অন্যান্য সকলে পালিয়ে যায়। কিন্তু নির্ভীক সতীনাথ দাঁড়িয়ে থাকেন এবং আবগারী কর্মচারীদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হন। (ইতিকথা —সতীনাথ স্মরণে, সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৭) বা 'একদল ছাত্র নিয়ে ইংরেজি শিক্ষা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে জেলা স্কুলে পিকেটিং করা ইত্যাদি।'[২২]

এইভাবেই একদিন সহজ নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা গড়ে ওঠে তাঁর মধ্যে। পূর্ণিয়া জেলার অনেকের কাছেই তখন সতীনাথ হয়ে উঠেন 'সতুদা'। কাজেই কেউ যখন বলেন যে,

'মানুষের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ মানব জীবনের অপার রহস্য এবং দেশের জন্য কাজ করার দুর্দমনীয় নেশা তাঁকে বার বার ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল। এরই জন্য তিনি পরিণত বয়সে রাজনীতিতে অনেকটা আকস্মিক ভাবেই যোগদান করেন। রাজনীতিতে যোগদানের বিশেষ কোন প্রস্তুতি পূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি'[২৩]—তখন তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে, 'সতীনাথের সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান ও সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে গৃহত্যাগ' এই ব্যাপারটিতে আত্মীয় বন্ধু পরিচিতরা হতচকিত হয়ে পড়ার বা সমস্ত পূর্ণিয়া শহরের বিস্মিত বা সচকিত হয়ে ওঠার প্রথম কারণ 'অন্তর্মুখী সতীনাথের চিন্তার অংশীদার সেদিন কেউ ছিলেন না।' দ্বিতীয়ত কলেজ-জীবনে সতীনাথ সোসালিস্টদের পক্ষে ছিলেন, কমিউনিস্টদের প্রশংসা করতেন ও 'রায়-ইস্ট' জাতীয় দলকে সমর্থন করতেন। ড. বীরেন ভট্টাচার্য তাঁর 'সকল কাজে সেরা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'সতীনাথ কলেজ জীবনে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন প্রথম। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসে যোগদান করলেও মনে প্রাণে সতীনাথ তখন সোসালিস্টদের পক্ষপাতী। কম্যুনিস্টদের সংগঠন ক্ষমতার তিনি প্রশংসা করতেন, কিন্তু পরদেশ মুখাপেক্ষী কোন রাজনৈতিক নীতি তিনি সমর্থন করেন নি।'[২৪]

যাই হোক, সতীনাথ ছাত্রজীবন থেকে দেশের ও দশের কল্যাণমূলক কাজ করলেও প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন ১৯৩৯-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর। ঠিক তখনই যখন 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনায়মান ছায়া কায়ালাভ করেছে।' সতীনাথ কংগ্রেসের কাজ করবেন বলে টিকাপট্টি আশ্রমে যোগদানের কথা শুনে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী, সাহিত্যিক আড্ডায় দাদামশাই শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরীতে (২৭-৯-৩৯)-তে লিখেছেন—'কালকে বললে—সতু টিকাপট্টি গিয়েছে। Law practice ছেড়ে দিল। কথাটা বিশ্বাস হয়নি।

'আজ শুনছি সত্যই সে congress-এ কাজ করবে তাই গিয়েছে। ওরূপ intellect ছেলে, চাকরী কি Court attend করতে উৎসাহ পায় না। তারা বরাবর বড় aspiration পোষণ করে। সাধারণে যা করে তাতে মন বসে না। কিন্তু congress circle-এই বা তার মন তুষ্ট থাকবে কি করে? সে হল একটি ক্ষুরধার intellect-এর ছেলে, সত্যপ্রিয়, বিদ্যাপ্রিয়, sincere কিন্তু ও circle-এ যে প্রায়ই মূর্খ, মিথ্যাভাষীর সঙ্গ জুটবে। মনের মত দোসর বা বন্ধু পাবে না। কারো সঙ্গে বনবে না, কি করে কাটবে।'[২৫]

জেনে শুনে এবং জীবন সম্পর্কে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েই সতীনাথ রাজনীতিতে পুরোপুরি (whole-timer) হয়ে যোগদান করেছিলেন। গৃহের আরাম, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুই ত্যাগ করে আশ্রমজীবন বেছে নিয়েছেন। তাঁর রাজনীতির উদ্দেশ্য ধান্দাবাজী বা স্বার্থসিদ্ধি করা নয়। তাঁর উদ্দেশ্য দেশ-সেবা। গান্ধীজীর ত্যাগ-আদর্শ, তাঁর সাধকোচিত জীবনচর্চা সতীনাথের জীবনদর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশমাতৃকার মুক্তি, সমাজসেবা, ও মানবসেবার জন্য প্রকৃত দেশপ্রেমের যে রাজনীতি সেই রাজনীতিকে বুকে নিয়ে সতীনাথ কংগ্রেসের 'টিকাপট্টি আশ্রমে' ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কোন হুজুগে পড়ে নয় বা বিশেষ রাজনীতির টানে আপ্লুত হয়ে তিনি রাজনীতিতে আসেননি, রাজনীতির সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। 'রাজনীতির মত জটিল শাস্ত্র সতীনাথ পড়েছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন তিনি। ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম, রাশিয়ার অর্থনীতি, বৃটিশ ডিমোক্রেসী—সব ছিল তাঁর নখদর্পণে।'[২৬]

টিকাপট্টি আশ্রমে এসে সতীনাথের কাজ ছিল সাধারণ কর্মীদের আচার-আচরণ এবং রাজনৈতিক তত্ত্বাদর্শে শিক্ষিত করে তোলা। আশ্রমে কংগ্রেস কর্মীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে তিনি পড়াতেন। 'এখন কংগ্রেস স্কুলে কাজ করছে, training দিচ্ছে।'[২৭] 'প্রিয় ভূতনাথের (ভূতনাথ সতীনাথ ভাদুড়ীর অগ্রজ) সঙ্গে খোকার (খোকা—ড. অমর ভট্টাচার্য; সতীনাথের বাল্যবন্ধু) দোকানে দেখা হল। সতীনাথকে দেখে এসে তার জন্য ভাবনা কমে গিয়েছে। সে ভালই আছে। প্রথমে শুনে সত্যই বড় কষ্ট হয়েছিল—তার মনের মত সঙ্গ পাবে না এই ভয়ে। এখন ভাবছি যে সে সকল বিষয়ে যথেষ্টই বোঝে এবং শেষ পর্যন্ত ভেবে নিয়ে এ কাজ করছে। adopt করে নেবার শক্তি নিশ্চয়ই রাখে। Risk না নিলে কোন বড় কাজ হয় না।'[২৮] সব সময়ের কংগ্রেস কর্মী হয়ে সতীনাথ ঘুরে বেড়াতেন সারা বিহারে, বিশেষ করে পূর্ণিয়া জেলায় টিকাপট্টি আশ্রমে থাকাকালীন (১৯৩৯) পূর্ণিয়ার গ্রামে গ্রামে 'ভাদুড়ীজী' নামে বিখ্যাত হন। পরনে খাটো ধুতি, পায়ে চটি, গায়ে দু-পকেটঅলা হাফ হাতা জামা, শীতে কাঁধে একটি চাদর এই বেশে তিনি তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। "কংগ্রেসের টিকাপট্টি আশ্রমে যোগদান করলেও সতীনাথ প্রায়ই ভাট্টাবাজারে নিজেদের বাড়ীতে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন। সঙ্গে একটি কম্বল মশারি আর ধুতি।'[২৯]

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধশুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ভারতবর্ষ আবার অশান্ত হয়ে ওঠে, গড়ে ওঠে নতুন ধরনের বিক্ষোভ; কারণ সে সময় বৃটিশ সরকার ভয়াবহ যুদ্ধের বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ভারতকেও এই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে, কিন্তু তার জন্য ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মতামত নেয়নি। ফলে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এজন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে—'the Congress took exception to the fact that India was dragged into the war without her consent.'[৩০] জাতীয় কংগ্রেস জার্মানি ও ইতালীর ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও এখন অনুরূপ মত প্রকাশ করে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ অসহযোগিতার কথাই বৃটিশ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিল।[৩১]

মহাত্মাগান্ধী শেষ পর্যন্ত ১৯৪০-এর অক্টোবরে শেষ অস্ত্র হিসেবে পুনরায় অসহযোগ আন্দোলনের পথই গ্রহণ করেন। কিন্তু এবারের এই আন্দোলনকে

তিনি খুবই সীমিত গণ্ডীর মধ্যে রাখেন। 'ব্যক্তিগত অসহযোগ আন্দোলন' (Individual Civil Disobedience)। এই আন্দোলনে গান্ধীজী প্রথমে যাঁদের নাম ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরাই কারাবরণ করেন এবং পরে তা সাধারণ স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের বিষয় ছিল বৃটিশের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার জন্য বক্তৃতাদান ও কারাবরণ।

পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসও ১৯৪০-এর এই 'ব্যক্তিগত অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলন' পরিচালনা করেন। সতীনাথ পূর্ণিয়ায় এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কারাবরণ করেন।

সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তি নয় বছর (১৯৩৯—৪৮)। এর মধ্যে তিনি তিনবার কারাবরণ করেন। প্রথমবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে (১৯৪০) এক বছরের বন্দীজীবন হাজারীবাগ জেলে। দ্বিতীয়বার—ছ-মাসের জন্য (১৯৪১) তৃতীয়বার বিয়াল্লিশের আন্দোলনে (১৯৪২—৪৪)। প্রথমে পূর্ণিয়া জেলে। সতীনাথ ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকার সময়েই (১৯৪৩—৪৪) তাঁর বিখ্যাত 'জাগরী' উপন্যাসটি রচনা করেন। সতীনাথ ১৯৪০-এ পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। ১৯৪৭-এর জানুয়ারীতে কিষণগঞ্জের বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে জেনে তিনি কংগ্রেস ছাড়েন ১৯৪৮-এ। সোসালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন, তাও ছাড়েন। সরে আসেন রাজনীতির পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্ত থাকে। সতীনাথ ভাদুড়ী বিশেষভাবে বিহারের আগষ্ট আন্দোলনে জড়িত ছিলেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কারাবরণ করেন 'ব্যক্তিগত অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলন' করে। পূর্ণিয়া থেকে তাঁকে হাজারীবাগ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই জেলে তখন ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, মন্ত্রী অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ প্রমুখ। 'হাজারীবাগ জেলে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেন যে ঐ সময় সতীনাথ অবসর সময়ে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।" দরজার পর্দা একটু ফাঁক, পড়ন্ত সূর্যের আলো চিক্ চিক্ করছে, সেই আলোয় সতীনাথ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তেন, অজস্র নোট নিতেন এবং উর্দু, ফারসী ভাষার চর্চা করতেন। সম্ভবত এসব ছিল জাগরীর প্রস্তুতি পর্ব।'[৩২]

হাজারীবাগ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সতীনাথ কংগ্রেসের সংগঠনের দিকে

মনোনিবেশ করেন। পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সচিবের দায়িত্ব তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীবৈদ্যনাথ চৌধুরী। দেখতে দেখতে সারা ভারত জুড়ে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের বৃটিশ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের জোয়ার উত্তাল হয়ে ওঠে। ঐ সালেই বোম্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে (৭ ও ৮ আগষ্ট) বৃটিশ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ৯ই আগষ্ট থেকে শুরু হয়ে যায় ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন। সেদিনের অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষে বিহারও ছিল অন্যতম এক আগ্নেয়গিরি।[৩৩] এতে পূর্ণিয়াও পিছিয়ে ছিল না। সেই সময় পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সংগঠনের দায়িত্ব ছিল সতীনাথের। আগষ্ট আন্দোলনে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া নেওয়া টাকা পয়সার হিসাব ও সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্বও ছিল তাঁর।[৩৪]

ঐ সময়কার সতীনাথের জীবনধারা ও কাজকর্মের পরিচয় শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে জানতে পারি—'এই সময় পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য সতীনাথ রাতে ট্রেনে করে ভ্রমণ করতেন অথবা গভীর রাতে জল কাদা ভেঙে বিনা টর্চের আলোয় ১৫-২০ মাইল হেঁটে গিয়ে সভা সমিতি তৈরি করতেন। এই সময়েই পূর্ণিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে 'ভাদুড়ীজী' নামে তাঁর খ্যাতি। একবার তিনি নরপতগঞ্জ গ্রামে ডাক্তার অবনী চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় গভীর রাতে গিয়ে ওঠেন। ডাক্তার অবনী চট্টোপাধ্যায় নানা প্রকারের উপাদেয় খাদ্য তৈরি করান অতিথির জন্য। কিন্তু সতীনাথ সাদামাটা খাবার ছাড়া কিছুই স্পর্শ করেন না। তিনি বললেন দেশের লোক যখন এইভাবে খেতে পারবে তখনই আমি উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারবো।[৩৫] সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন ত্যাগী, দেশপ্রেমিক এবং মানবপ্রেমিক তাই তিনি ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সুখাদ্য অবলীলায় ত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

১৯৪২-এর আন্দোলনে সতীনাথেরা পূর্ণিয়া জেলে প্রথম কারারুদ্ধ হন, কিন্তু সেখানে সবাই দলবদ্ধ হয়ে জেল ভাঙার চেষ্টা করলে ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলি হন। এবারের কারাজীবনের সঙ্গী ছিলেন হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু, যাঁকে সবাই সতীনাথের শিষ্য হিসেবেই গণ্য করতেন। ফণীশ্বরনাথ তাঁর 'ভাদুড়ীজী' শীর্ষক স্মৃতিচারণায় সতীনাথের জেলজীবনের অনেক ঘটনাই প্রকাশ করেছেন। আমরা শুধু তাঁর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ঘটনাই এখানে উল্লেখ করব। কারণ

এই ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলেই সতীনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'জাগরী' রচিত হয়েছে।

'জেলের মধ্যে সতীনাথ দিন কাটাতেন লেখাপড়া নিয়ে। জেলে বসেই তিনি উর্দু, হিন্দী, ফারসী চর্চা করতেন। নিজে পড়ছেন, অপরকে পড়াচ্ছেন। ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকার সময়েই সতীনাথ জাগরী উপন্যাস লেখেন। ভাগলপুরে রাজবন্দীদের ভলিবল-খেলায় তিনি ছিলেন নিপুণ খেলোয়াড়। ভাগলপুর জেলের টি সেলে থাকার অনুমতি তিনি স্বেচ্ছায় চেয়েছিলেন। খুবই নিরিবিলি, লেখাপড়ার উপযোগী, তাই সিগ্রিগেসন ওয়ার্ড থেকে চলে আসেন চার নম্বর টি সেলে।'৩৬

সাহিত্য-সাধনার জন্য একটা নির্জন পরিবেশ করে নেওয়ার জন্য সতীনাথ স্বেচ্ছায় জেলের মধ্যে 'সেলে'র জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর জেলজীবনের সঙ্গী ফণীশ্বরনাথ রেণু স্মৃতিচারণ করেছেন, "ভাদুড়ীজী একদিন জেল সুপারিন-টেনডেণ্টকে বললেন, সাহেব। আপনাদের টি সেলের 'ডিগ্রি'গুলো তো খালি আছে, ওখানে আমাদের রাখা যায় না? ইংরেজ জেলসুপার অবাক হয়ে একবার ভাদুড়ীজীর দিকে তাকালেন, নিজের ইচ্ছায় সেলে থাকতে চায়? এ কেমন 'প্রিজনার'রে বাবা। বললেন, 'আমরা জোর করে কাউকে ওখানে পাঠাতে পারি না। তবে স্বেচ্ছায় যারা ওখানে যেতে চায়, তাদের ওখানে ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।"

"কিন্তু নিজেকে নিজেই এই দণ্ড কেন দিতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না। টি সেলে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে ভাদুড়ীজী কেন এই সেলের জন্য জেল সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে 'ওজুর' করেছিলেন। লেখাপড়ার জন্য এমন চমৎকার জায়গা এই জেলে আছে আমরা জানতাম না।"৩৭

জেলে সতীনাথের জীবনচর্যা ফণীশ্বরনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ—

"তখন আমরা 'নয়া গোল' ওয়ার্ডে ছিলাম। ছাব্বিশে জানুয়ারীর দিবস সম্ভবত ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ২৬শে জানুয়ারীর দিনটিকে 'পূর্ণস্বরাজ' লাভের প্রতীক হিসাবে ব্রিটিশ শাসন উপেক্ষা করেই ভারতের সর্বত্র পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে।"৩৮

"আমরা যাতে তা পালন না করতে পারি—জেল কর্তৃপক্ষ সাতদিন আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন। একদিন আগেই আমাদের সমস্ত ওয়ার্ডে তন্ন তন্ন করে

সার্চ করিয়ে জাতীয় পতাকা, 'কলার' বাকূল, লালকালি, লাল এবং সবুজ কাগজ ইত্যাদি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ছাব্বিশ জানুয়ারীর দিনে আমাদের সারাদিন 'লক আপ' করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ওয়ার্ডের ভিতরেও কোনো রকমের গোলমাল বা 'হল্লা-গুল্লা' করলে লাঠি চার্জ করা হবে এই হুমকি বা ধমকিও দেওয়া হয়েছিল। বেশির ভাগ তথাকথিত গান্ধী-বাদী নেতারা ওয়ার্ডের ভিতর কোনো রকমের কার্যক্রম পালনের বিরুদ্ধে ছিলেন। ওঁদের বক্তব্য আমাদের 'লক-আপে' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা নিরুপায়। তাই এই সারাদিন বন্ধ থাকাই হল আমাদের ছাব্বিশ জানুয়ারী দিবস পালন।"

"এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে দুই দল হওয়ার খবর জেলের সাহেবরাও পেয়েছিলেন। তাই লাঠি-ওয়ালা-ওয়ার্ডাররা ঘন ঘন প্যারেড করতে করতে সকাল থেকে কয়েকবার 'রাউণ্ড' দিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা আমাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করবার যোগাড়ে ব্যস্ত থাকলাম। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে প্রথমে কয়েকটা 'শ্লোগান' দিলাম। তারপরে বন্দেমাতরম গান আরম্ভ করলাম। আমাদের প্রথম জয়ধ্বনি শুনে ওয়ার্ডের বাইরে ওয়ার্ডারদের 'অফিসর' একটা বিকট চিৎকার করে কোনো 'অর্ডার' দিল। গান্ধীবাদী নেতারা মেঝেয় কম্বল পেতে বসে 'চরকা' চালাতে থাকলেন। ওয়ার্ডারদের 'কুইক মার্চ' ··বুটের আওয়াজ আমাদের ওয়ার্ডের বাইরে শোনা যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে ভাদুড়ীজী লেখার টেবিল থেকে উঠে সোজা আমাদের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ালেন।···পূর্ণিয়া জেলের লাঠি চার্জে ভাদুড়ীজী আহত হয়েছিলেন। ঘাড়ের কাছে সেই আঘাতের কালো দাগ অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। সেদিন 'বন্দেমাতরম' গাইবার সময় ওঁর ঘাড়ের পিছনের ওই দাগ দেখে আমি ভাবছিলাম···এবারে ও লাঠির ঘা ঠিক ওই দাগের কাছে পড়বে?"[৪০]

এই নিবিষ্ট পরম সাধনা ছাড়াও সতীনাথের একটি বিশাল কর্মজগতও ছিল। পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের তিনি ছিলেন কর্ণধার। সে সময় তাঁর বাড়ীতে অতিথি হিসাবে আসতেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতাগণ। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যসভা সদস্য ভোলা শাস্ত্রী, ভূতপূর্ব বিধানসভা সদস্য কমলদে ও নারায়ণ সিন্‌হা প্রমুখ ছিলেন সতীনাথের অনুগত শিষ্য। দেশের কাজ সতীনাথের কাছেই এঁরা শিখেছেন।

এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাদ দিলে 'সতীনাথের আর একদল বন্ধু ছিল অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত গ্রামের লোকেরা। সে যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তখনই এদের সঙ্গে তার পরিচয়। এদের সঙ্গ পাবার জন্য পায়ে হেঁটে-হেঁটে সে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছে। এদের মুক্তির জন্য সে জেল খেটেছে. অপমান নির্যাতন সহ্য করেছে।'[৪১]

হাজারিবাগ জেলেও যেমন ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলেও ঠিক তেমনি সতীনাথের অধিকাংশ সময় কাটত লেখাপড়া নিয়ে। তাঁর পড়ানোতেও বিশেষ আগ্রহ ছিল। এমনকি জেলে বসেও তিনি পড়াতেন। জেলজীবনে তাঁর শিক্ষক হওয়ার একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন তাঁর কারা-সঙ্গী শিষ্যপ্রতিম ফণীশ্বরনাথ রেণু :

"ভাদুড়ীমশাই ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে এঁকে ইংরাজী পড়াতেন। গান্ধী-বাদী বৈদ্যনাথ চৌধুরী একহাতে চরকা কাটতেন। আর একই সঙ্গে ভাদুড়ী-মশায়ের কাছে ইংরাজী পড়তেন। পড়ানোর সময় ভাদুড়ীমশাই গ্রামের ভাষায় কথা বলতেন, বি ইউ টি বল ভেলই, পি ইউ টি পট ন ভেলই। তখনকার রাজনৈতিক ভাষায় সবাই উর্দু ব্যবহার করতেন প্রচুর মাত্রায়, আর লেখার সময় কথায় কথায় শিরোনাম দিতেন, বৈদ্যনাথ চৌধুরী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। এ সবই ভাদুড়ী মশায়ের চোখে পড়েছিল। ভাদুড়ীমশায়ের শিক্ষকতায় মাত্র পনেরো দিনে চৌধুরীজী 'ইণ্ডিয়ান নেশনে'র সম্পাদকীয় অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন, মাত্র ৩৬ দিনে ইংরাজীতে দক্ষ—বিশ্বাস করবেন। এই বৈদ্যনাথ চৌধুরীই সেবার রানীপত্রাশ্রমে কনফারেন্সের জায়গার নাম রাখেন ভাদুড়ীনগর, সতীনাথ ভাদুড়ীর নামে।"[৪২]

লেখাপড়ায় যেমন সতীনাথের আগ্রহের অভাব ছিল না, তেমনি খেলাধুলায়, নানারকম রান্নায়ও তাঁর বিশেষআগ্রহ ছিল, তিনি নানারকমের খাবার নিজে তৈরি করে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে ভালবাসতেন। ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে তিনি যেসব মানুষকে দেখেছিলেন যাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের অনেকেই 'জাগরী' উপন্যাসে স্থান পেয়েছিল, সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছিল তাঁর দেখা আগষ্ট আন্দোলনে শরিক উত্তর বিহারের গ্রামীণ মানুষেরা ; সদ্য ফেলে আসা উত্তেজনাময় আগষ্ট বিপ্লবের দিনগুলি ও উৎসাহী পূর্ণিয়া অঞ্চলের মানুষগুলি জাগরীতে পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

"জনতা চলিয়াছে। আগে চলিয়াছে, পিছন ফিরিয়া তাকাইবে কেন ?...

ইহাদের হাতে এখন কত কাজ। মাথায় কত বড়ো দায়িত্ব।…একদল বলিতেছে, বোম্বাই সে আই আওয়াজ; আরেক দল বলিয়া দিতেছে সে আওয়াজটি কী। উহার সহিত স্বর মিলাইয়া বলিতেছে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।…রেললাইন। দূরে কৃত্যানন্দনগর গ্রামটি দেখা যাইতেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সিকি মাইল রেললাইন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। রেলগুলি ও কাঠের স্লিপারগুলি সকলে কাঁধে করিয়া ভুট্টার খেতে বা রেল-লাইনের ধারে ধারে জলের মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে।”[৪৩]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে 'জাগরী' উপন্যাসের এই প্রসঙ্গ সতীনাথের কল্পনা-প্রসূত নয়। এসব তাঁর চোখে দেখা। এই জনতার সঙ্গেই ছিলেন সতীনাথ। ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলের 'নিভৃত'-টি সেলে বসে যখন তিনি 'জাগরী' লিখেছেন তখন জনতার ঐ কোলাহল দূরাগত প্রতিধ্বনির মতই তাঁর মনোলোকে ধ্বনিত হত।

জেল থেকে ছাড়া পেলেও সতীনাথের ওপর সি. আই. ডি.-পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি তুলে নেওয়া হয়নি। তার কারণ, গান্ধীবাদী কংগ্রেসের একজন সদস্য হলেও সতীনাথকে বৃটিশ সরকারের পুলিশ বিভাগ উগ্রপন্থী হিসাবে 'এক্স'-বর্গে চিহ্নিত করেছিল। “জেল থেকে ছাড়া পেয়ে—ভাদুড়ীজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দূর থেকে দেখলাম, ভাট্টাবাজারের মোড়ের কাছে সি. আই. ডি. ইন্সপেকটার—'গোঁফওয়ালা শুক্লা' দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির কাছে পৌছবার আগে আরও একজন পুলিশের লোককে সাদা পোশাকে সাইকেলে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। পূর্ণিয়া জেলায় তখনও দুর্ধর্ষ 'আজাদ দস্তা' সক্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে ওদের দ্বারা সি আই ডি-ওয়ালাদের হত্যার খবর এবং পুলিশের সঙ্গে 'এনকাউণ্টার'-এর সংবাদ পাওয়া যেত। কিন্তু ভাদুড়ীজী তো 'খাঁটি অহিংসায় বিশ্বাস করনেওয়ালা' ব্যক্তি? কিন্তু না—জেলে উনিই একমাত্র 'ডিটেন্যু' ছিলেন যাঁকে উগ্রপন্থীদের মত 'এক্স' বর্গে চিহ্নিত করেছিল তখনকার সি. আই. ডি. বিভাগ। গান্ধীবাদী ডিটেন্যুদের উপর 'চার্জ' ছিল—'দ্যাট হি ওয়াজ ট্রায়িং টু ওভারথ্রো দি গভর্ণমেণ্ট।' আর বামপন্থীদের উপর—'দ্যাট হি ওয়াজ ট্রায়িং টু ওভারথ্রো দি গভর্ণমেণ্ট বাই মিন্স অফ টেররিস্ট এ্যাক্ট এ্যাণ্ড ভায়লেন্স…।' গান্ধীবাদীদের 'ওয়াই' বর্গে অর্থাৎ 'লেস ডেনজারাস' এবং যাদের 'এক্স' মার্কা দেওয়া ছিল তাঁদের 'ভীষণ সাংঘাতিক' ধরা হত। ওই 'এক্স'-এর ঘোর জেলের বাইরেও চলছে বুঝেছিলাম।”

"ভাদুড়ীজীর বাসায় গিয়ে ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝেছিলাম : 'আজাদ দস্তা'র দলপতি কুলদীপ ঝা গতরাত্রে ভাদুড়ীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসে রাত্রে ফিরে যেতে পারেন নি। ওঁর বাড়ির ভিতরের এক 'কুঠরী'-তে মশারি ফেলে ঘুমোচ্ছিলেন। ভাদুড়ীজীকে গুপ্তচর পুলিশদের ব্যস্ততার কথা বলাতে উনি কোনো রকমের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। বললেন—'ও কিছু নয়। ওরা রোজ এ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে।'"[৪৪]

সতীনাথের বিষয়ে এই জাতীয় ঘটনাগুলি দেখে আমাদের মনে স্বাভাবিক-ভাবেই সংশয় জাগে—সতীনাথ কি সত্যই গান্ধীবাদী কংগ্রেসী ছিলেন? সি. আই. ডি. দপ্তরের খাতায় তো তিনি 'এক্‌স' মার্কা, জেলে উনিই একমাত্র গান্ধী-বাদী 'ডিটেন্যু'। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের অনেকেই তাঁকে 'রাইটিস্ট' মনে করতেন।[৪৫] কিন্তু প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণু পরে সিদ্ধান্ত করেছেন 'সেই দিন বুঝলাম উনি কোনো 'ইস্ট' ছিলেন তা 'পূর্ণিয়া ইস্ট' ছাড়া।'[৪৬]

১৯৪৪ সালে সতীনাথ তৃতীয়বার কারারুদ্ধ হন।[৪৭] 'সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন যাপন' অংশে শ্রী শঙ্খ ঘোষ এবং নির্মাল্য আচার্য বলেছেন : '১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত কাটল তাঁর তৃতীয় বন্দীদশা। মধ্যে কেবল দশ দিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁর মুমূর্ষু বাবাকে দেখতে যাবার জন্য। কিন্তু ১৯৪৪ সালের ২০শে জানুয়ারী যখন মৃত্যু হলো ইন্দুভূষণের, যখন তাঁর পাশে ছিলেন না সতীনাথ।" (স. গ্র., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬)। আমার মনে হয় এটিই গ্রহণযোগ্য তথ্য। শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছাড়া পাওয়ার পর আবার ১৯৪৪ সালে তৃতীয় দফা কারাবাস' তথ্যের মূলে বিশ্বাসযোগ্য কোন ঘটনা বা কারণ কিছু দেখাননি তিনি। 'ইতিকথা'-য় শ্রী সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সতীনাথের তিনবারের কারাবরণের যে তথ্যপঞ্জী দিয়েছেন তা হল—১) প্রথম ১৯৪০ সালের জানুয়ারী, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য; ২) ১৯৪২ আগস্ট-আন্দোলনের জন্য; ৩) ১৯৪৪ সালে তৃতীয় দফা কারাবাস। অপরদিকে সতীনাথ গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয়ের তথ্যানুসারে—

১) কংগ্রেসে যোগ দেবার এক বছরের মধ্যেই সতীনাথের প্রথম কারাবরণ, ১৯৪০ সালের জানুয়ারী।

২) আবার ১৯৪১ সালে ছ-মাসের জন্য বন্দী।

৩) তারপর এল বিয়াল্লিশের আন্দোলন, কয়েক হাজার লোকের সঙ্গে এবার তিনি বন্দী হলেন পূর্ণিয়া সেণ্ট্রাল জেলে।

"জেল থেকে বেরিয়ে এলেও দুর্ধর্ষ 'আজাদ দস্তা' দলের সঙ্গে সতীনাথের যোগাযোগ ছিল।"[৪৮] এছাড়া কাটিহার জুট-মিলের ধর্মঘটের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন তিনি।[৪৯] একদিকে 'ন্যাশনাল ওয়ার ফাণ্ডে'র জন্য জোর করে চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, অপরদিকে 'সার্চলাইটে' প্রতিবাদ পাঠানো[৫০]—ইত্যাদি নানা সমাজ সংগঠনমূলক কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। এই সময়েই পূর্ণিয়ার গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, সঙ্কট-সমস্যার, আশা-নিরাশার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। তিনি ছিলেন এদের সবার প্রিয়, সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'ভাদুড়ীজী'।

"সতীনাথের প্রকৃত সাহিত্য-জীবন শুরু হয় রাজনৈতিক জীবন-অধ্যায় শেষ হওয়ার প্রাক্ লগ্নে। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই তিনি অনেকটা আকস্মিকভাবেই কংগ্রেসী রাজনীতি সক্রিয়ভাবে পরিত্যাগ করেন। এরপর দীর্ঘকাল তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সাধনা করেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য-বাসরে আবির্ভাব অনেক পরিণত বয়সে। তিনি নিজেকে লেখক অপেক্ষা পাঠকই মনে করতেন বেশী।"[৫১]

বই পড়া সতীনাথের একটা নেশা ছিল। দিনের অনেকখানি সময় নিয়মিত-ভাবে তিনি পড়াশুনা করে কাটাতেন। আড্ডা, সমাজসেবা যেমন ছিল, তেমনি তাঁর পড়াশুনায় নিমগ্নতা ছিল। তাঁর বন্ধু-বান্ধব-সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন, জেলের সঙ্গী-সাথী সকলেই সতীনাথের গভীর পড়াশুনার কথা উল্লেখ করেছেন। 'ভাল লাগে তার পড়তে, কিন্তু পড়া জিনিসটাকে হজম করার মতো ক্ষমতা আর ধৈর্য তার নেই। তাই জ্ঞানের বদলে তার মনের ওপর চেপে বসেছিল অসংখ্য খবরের বোঝা যাকে সরল লোকে বলে পাণ্ডিত্য। এই বোঝার চাপে তার হাঁপ ধরেনি কোনদিন, বরঞ্চ এর ওজন ও পরিধি বাড়ানোর নেশা তার চিরকালের।'[৫২] সতীনাথের নিজের কথা। সরল স্বীকারোক্তি—পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহে, জ্ঞান আহরণে তাঁর ক্লান্তি তো ছিলই না, বরং সেটা ছিল নেশা। জেলে সতীনাথের অধিকাংশ সময় কাটতো পড়াশুনা নিয়ে। হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু সতীনাথের কারাবাস জীবন প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন সতীনাথ স্বেচ্ছায় বাঙালী টেররিস্টদের জন্য তৈরি 'নির্জন টি সেলে' চলে এসেছিলেন শুধুমাত্র লেখাপড়া করার জন্যই। শ্রীকৈলাসবিহারী সহায় 'একটি

সন্ধ্যার স্মৃতি' রচনায় সতীনাথের গভীর অধ্যয়ন মননের কথাই শুধু বলেননি, ফরাসী সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে বুঝেছিলেন, ফরাসী সাহিত্যের কত গভীরে সতীনাথ পৌঁছেছেন, মার্কসবাদী সাহিত্য বোঝার জন্য জর্জ লুকাচের কথা যেমন বলেন তিনি, তেমনি ইলিয়া ইরেনবুর্গ প্রতিভাশালী হওয়া সত্বেও কেন মহান লেখক হতে পারেননি, কিংবা আঁদ্রে জিদের লেখার মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের অধিক বাস্তববাদী ও উদার হওয়ার উপদেশ দেন ; আরাগঁ, প্রুস্ত থেকে মণীন্দ্র রায় পর্যন্ত অবাধ সঞ্চরণ তাঁর। এরই মধ্যে এসে পড়ে 'ভক্তমাল' এবং 'চুরাশী বার্তা'র আলোচনা, রসখানের মূল্যায়ন করতেও তাঁকে থামতে হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীসহায় বুঝতে পারেন যে, ফরাসী, রাশিয়ান স্প্যানিস, ইংরেজি, হাঙ্গেরিয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্য যেমন যত্নের সঙ্গে তিনি পড়াশুনা করেছেন, তেমনি প্রাচ্য সাহিত্যও; আবার অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি তত্ত্বমূলক, মননধর্মী গ্রন্থ পাঠেও তাঁর সমান আগ্রহ।

"দেশের সাহিত্য সতীনাথ সযত্নে পাঠ করেছিলেন—'সংস্কৃত', বাংলা, হিন্দী ও উর্দুতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এছাড়াও তিনি আরো দু-একটি ভাষা জানতেন। ইংরেজির কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণত তার মধ্য দিয়েই আমরা মোটামুটি মানব সভ্যতার নানা রূপের সংবাদ জানি। আর সে জানায় ছেদ থেকে যাওয়াও স্বাভাবিক। সতীনাথের জ্ঞানপিপাসা তাই ফরাসীকেও ইংরেজির মত নিজের আয়ুধ করে নিয়েছিল। কোন বিদ্যাই ফলাবার জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল না, তেমন স্থূলতা সতীনাথের সম্বন্ধে কল্পনাতীত। বাইরের বাগানের মতই তাঁর গৃহের সযত্ন-লালিত লাইব্রেরির ঘর আর দেখেছেন সেই লাইব্রেরী তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে সেই লাইব্রেরির একটা বড় অংশই ফরাসী গ্রন্থের দ্বারা অধিকৃত। সে বই সুনির্বাচিত এবং সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্যবান উৎস। (সতীনাথের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থগুলি 'দি চন্দননগর ইনস্টিটিউট'-এ সমর্পিত হয় যা এখনও সেখানে গচ্ছিত আছে)। ফরাসী উৎস থেকে তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন পৃথিবীর বিশেষ করে য়ুরোপীয় মানসের ভাবসম্পদ ও রসসম্পদ। অবশ্য জার্মান ভাষাও তিনি শিখেছিলেন, রুশ ভাষা শেখারও পরিকল্পনা ছিল।"[৫৩]

আমার মনে হয় সতীনাথ সম্পর্কে শেষ কথাটি যথার্থ নয়, কারণ ফ্রান্সে থাকাকালীন রুশ ভাষার ক্লাশও তিনি করতেন। তিনি নিজেই লিখেছেন— 'থাকবার মধ্যে আছে কেবল এক বেশি রাতের রুশ ভাষার ক্লাসটা। ভাল না

লাগলেও সেখানে যেতে হয়, কেননা রুশ দেশ দেখতে যাবার উৎসাহের রেশ এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি মন থেকে।"[৫৪]

সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রবল পড়াশুনা, জ্ঞানার্জন তাঁর মনকে পাণ্ডিত্যের তথ্যভারে এবং তাত্ত্বিকতায় উদ্ধত, দুর্বিনীত বা পিষ্ট করেনি—আত্মীকরণের (assimilation) ক্ষমতায় তত্ত্ব ও তথ্যের ভারকে প্রজ্ঞার আলোয় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন যা তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলি পাঠ করলে আমরা জানতে পারি।

সতীনাথ ১৯৪২-এ ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে বসে 'জাগরী' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"জেলে আসবার আগেই শুনেছিলাম—মানুষের আসল চেহারা জেলের ভিতরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। মুখোস খোলা আসল মানুষ। বাইরে থাকতে গলা ফাটিয়ে যাঁদের 'জয় জয়কার' করতাম—তাঁদের সঙ্গে জেলে মাত্র কয়দিন থেকেই মনের আসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের প্রতিমাগুলো নিজেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অনেক শ্রদ্ধেয় 'মূর্তি'কে নিজের হাতে ভাঙ্গতেও হয়েছিল ··যতদূর আমি জানি 'জাগরী'র পাণ্ডুলিপি কেউ পড়েন নি। আমার মাঝে মাঝে খুব হাসি পেত। অনেক ব্যক্তিকে দেখে মনে মনে ভাবতে থাকতাম···আপনাদের 'স্কেচ' জাগরীতে আঁকা হয়ে গেছে—নিখুঁৎ ভাবে।"[৫৫]

'জাগরী'র নীলু ও বিলু চরিত্র দুটির কম বেশী অধিকাংশ সতীনাথের ব্যক্তি-জীবনের উপাদানে গঠিত। "একদা সারা পূর্ণিয়া জেলায় সতীনাথ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সুখ্যাত ছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। গান্ধীর আদর্শ ও কংগ্রেসের সেবায় মন প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন এই যুবক। 'জাগরী' স্বপ্নোদ্যানের ফুল নয়, জীবনের স্পর্শ থেকে তার পাপড়িগুলি ফুটেছিল, তার চরিত্রগুলি প্রাণহীন নয়, রাজনৈতিক রঙের ছোপ ধরানো কাঠ বা পুতুল নয়। সেগুলি যথার্থ মানুষ।"[৫৬]

ভাগলপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পূর্ণিয়ায় ফিরে আসেন সতীনাথ (১৯৪৪)। পূর্ণিয়ার ছেলে তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ডাঃ বীরেন ভট্টাচার্যকে জাগরীর পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশ পত্র নিয়ে বীরেন ভট্টাচার্য কলকাতায় 'সাহিত্য' পত্রিকার—সম্পাদক ও প্রকাশকদের সঙ্গে দেখা করেন। অচেনা নূতন লেখকের উপন্যাস ছাপতে কেউ আগ্রহী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন বিপ্লবীদের দ্বারা চালিত সমবায় প্রেস থেকে 'জাগরী'

মুদ্রিত হয় ও সমবায় পাবলিশার্স-এর মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে।[৫৭] প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা' বাংলা পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। দু বছরের মধ্যে আরো দুটি সংস্করণ হয়। 'জাগরী' উপন্যাসটিকে হিন্দীতে অনুবাদ করেন বিশিষ্ট লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ভর্মা। সতীনাথ নিজে হিন্দী ভাল জানতেন। তাই নারায়ণপ্রসাদকে অনুবাদের কাজে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অনুবাদক আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর এই অনুবাদকর্মে সতীনাথের সাহায্য ও পরিমার্জনার কথা। " 'জাগরী' যখন বাংলা-সাহিত্যে স্বীকৃতি পেলো এবং সতীনাথ প্রথম সারির সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত হলেন, তখন তার হিন্দী অনুবাদের প্রশ্ন ওঠে। কয়েকজন অনুবাদকের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথাবার্তা হয়। অনুবাদের কিছু কিছু নমুনা তিনি দেখলেন। কিন্তু তা তাঁর পছন্দ হলো না। অতঃপর আমার সৌভাগ্য যে অনুবাদের কাজ আমার উপর পড়লো। আমি জানালাম, 'আমি চেষ্টা করবো, আর সতীনাথের পছন্দ হলে তাহলেই অগ্রসর হবো।' সতীনাথ কিছু অনুবাদকর্ম দেখলেন, আর সম্মতি জানালেন। হিন্দী সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রচুর আর তাই অনুবাদের কাজে আমার খুব সুবিধা হলো। কিছু কিছু অনুবাদ করে তাঁর কাছে পাঠাতাম; সে-সব পড়ে যথোচিত পরিবর্তন, পরিবর্ধনের পরামর্শ দিয়ে তিনি আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন। এইভাবে অনুবাদের কাজে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।"[৫৮]
(মূলের হিন্দী অনুবাদ—শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ভর্মা।)

বিহার সাহিত্য ভবন থেকে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীনারায়ণ-প্রসাদ ভর্মার করা 'জাগরী'-র হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সংস্করণের জন্য যে 'প্রাক-কথন'টি লিখে দেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো—

"বঙ্গসাহিত্য-গগনকে উদীয়মান জ্যোতিষ্কমেঁ শ্রীমান সতীনাথ ভাদুড়ী এক অ্যায়সে উজ্জ্বল নক্ষত্র হ্যায়, জিনকী জ্যোতি স্থির চপলা সী ন কেবল বঙ্গ সাহিত্যকে রসিকোঁকে, পর নিখিল ভারতকে তথা বিশ্বকে সাহিত্য রসিকোঁকে চিত্তকো সমুদ্ভাসিত করে রখেগী।"...[৫৯]

সতীনাথের প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'র খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। পাঁচের দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাসরূপে 'জাগরী' 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' পুরস্কৃত হয়েছিল। সুতরাং বইটিকে বিদেশের তথা বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে

নিবেদনের প্রয়োজন অনুভব করে স্বনামধন্য লেখক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্নী শ্রীমতী লীলা রায় 'জাগরী' (THE VIGIL) অনুবাদ করেন। অনুবাদটি শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইউনেসকো-র প্রযোজনায় এশিয়া পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে রাজনীতি ছেড়ে সতীনাথ পুরোপুরিভাবে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গণনায়ক' (বৈশাখ ১৩৫৫, এপ্রিল ১৯৪৮), এর পাশে পাশে তিনি লিখতে শুরু করেন 'ঢোঁড়াইচরিত মানস।' এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১৩৫৬, এপ্রিল ১৯৪৯)। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার চারমাস পর প্রকাশিত হয় আরেকটি উপন্যাস 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (ভাদ্র ১৩৫৬, আগষ্ট ১৯৪৯), 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় দু-বছর পরে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, মে ১৯৫১)।

সতীনাথ যখন রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যপাঠে ও সাহিত্য-রচনায় নিরত ছিলেন ঠিক সেই সময়ে পূরণ হয়েছিল তাঁর আবাল্য ইচ্ছা—ইউরোপ-ভ্রমণ। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানির 'ম্যালোজা' জাহাজে তিনি বোম্বাই থেকে রওনা হয়েছিলেন সমুদ্রপথে। এই ভ্রমণেরই ফসল তাঁর 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' (প্রকাশ আশ্বিন ১৩৫৮, সেপ্টেম্বর ১৯৫১)। প্যারীতে থাকতেই খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি 'জাগরী' উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' পেয়েছেন। উল্লেখ্য সতীনাথই প্রথম রবীন্দ্র-পুরস্কার পান (১৯৫০)। মূলত অতুলচন্দ্র গুপ্তের উদ্যোগেই তা সম্ভব হয়েছিল। সতীনাথের কুড়ি বছরের স্বপ্ন ছিল সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করবেন। কিন্তু প্যারীর সোভিয়েত দূতাবাস ভিসা দিলেন না, চুরমার হয়ে গেল তাঁর স্বপ্ন। রাশিয়া বেড়ানো হলো না, হাতের পয়সাও ফুরিয়ে আসছে। তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্পেন যাওয়াও সম্ভব হয়নি। তাই প্যারী থেকে ফিরে গেলেন লণ্ডনে (১৬ই মে ১৯৫০)। সাদাম্পটন বন্দর থেকে পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে ২রা জুন রওনা হলেন ভারতের উদ্দেশ্যে।

সতীনাথ ভারতে ফিরে জীবনের বাকি পনের বছর (১৯৫১-৬৫) উত্তর বিহারের পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজারের বাড়িতে একাই থাকতেন। বিবাহ করেননি। সঙ্গী বই এবং একটি কুকুর। কুকুরটির নাম দিয়েছিলেন 'পাহারা'। 'ঈর্ষা' গল্পে তার উল্লেখ আছে। একটি মালী, একটি পাচক। দিনে তাঁর নিজের হাতের

তৈরি বহু শখের ফুলের বাগান, সন্ধ্যাবেলায় বাল্যবন্ধু খোকা ডাক্তারের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। এই ছিলো তাঁর প্রধান কার্য-পঞ্জিকা।

পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজারে সতীনাথের জীবনের বাকি পনের বছরে প্রবীণ সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা এবং তাঁর সাহিত্যিক আড্ডার নিয়মিত সদস্য হওয়ার ঘটনা তাঁর সাহিত্য সাধনায় প্রত্যক্ষ প্রেরণা যুগিয়েছিল বললে বোধ করি খুব অসমীচীন হবে না। এছাড়া দেশ-বিদেশের সাহিত্যপাঠের পরোক্ষ ফল তো ছিলই। তাঁর পাঠের জগৎ থেকে যেমন তাঁর শিল্পভাবনা ও রচনা-পদ্ধতি কৌশলের আভাস পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি সাহিত্যিক আড্ডায় তাঁদের আলোচনার ও মতামত-মন্তব্যগুলির ধারাবিবরণী পাওয়া যেত তাহলে সতীনাথ সাহিত্য বিচারে তা খুব মূল্যবান দলিল হতে পারত। নিয়মিত ডায়রী লেখার অভ্যাস তাঁর না থাকায় অথবা তাঁর কোন ডায়রী আমাদের হাতে না আসায়, সতীনাথের সাহিত্যবিচার করতে হয় প্রধানত তাঁর লিখিত সাহিত্য গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করেই।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যচর্চার কাল বিশ বছর (১৯৪৫-১৯৬৫)। এই সময়ের মধ্যে তিনি ছ-খানি উপন্যাস, ছ-খানি গল্পগ্রন্থ আর একটি জার্নাল জাতীয় ভ্রমণগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'জাগরী' ১৯৪৫, 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' ১৯৪৯, 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' প্রথম খণ্ড ১৯৪৯ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫১, 'অচিন রাগিনী' ১৯৫৪, 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' ১৯৫১, 'দিগ্‌ভ্রান্ত' ১৯৬৬, 'সংকট' ১৯৫৭, গল্পগ্রন্থ-'গণনায়ক' ১৯৪৮, 'অপরিচিতা' (ছোটগল্প সংকলন-১৯৫৪) 'চকাচকী' (ছোট গল্প সংকলন ১৯৫৬), 'পত্রলেখার বাবা' (ছোট গল্প সংকলন ১৯৬৪)। এ ছাড়া, টুকরো-টাকরা কিছু লেখা দু-একটি ছেঁড়া পাতা প্রভৃতি সংকলিত করে সতীনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'সতীনাথ বিচিত্রা' ১৯৬৫। সতীনাথের শেষ উপন্যাস দিগ্‌ভ্রান্ত 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয় পূর্ণিয়ার বাড়িতে ৩০ মার্চ, ১৯৬৫ (বাংলা ১৩৭২)। 'দিগ্‌ভ্রান্ত' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে, ১৯৬৬-তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩)।

১৯৫১ থেকে ১৯৬৫—এই পনের বছরে সতীনাথ মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছেন। অল্প কিছুদিনের জন্যে। ফিরে গেছেন পূর্ণিয়ায়। সেখানেই তাঁর ভাল লাগত। পূর্ণিয়ার প্রতিটি ভালমন্দ যেন তাঁর নিজের। পূর্ণিয়ার প্রতিটি

ধূলিকণাকে ভালবেসেছিলেন সতীনাথ।[৬০] যার ছাপ তাঁর প্রত্যেকটি রচনার মর্মমূলে বাসা বেঁধেছে।

৫৯ বছর বয়সে সতীনাথের মৃত্যু ঘটে ১৯৬৫-এর ৩০শে মার্চ হার্টের উপর টিউমার ফেটে, কিন্তু ১৯৫২-এর জুলাই মাসে হঠাৎ একদিন বুকে ব্যথা বোধ করেন সতীনাথ। এরপর তিনি বাল্যবন্ধু খোকা ডাক্তারকে (ড. অমরনাথ ভট্টাচার্য) তাঁর অসুস্থতার কথা জানান। খোকা ডাক্তারেরই পরামর্শে সতীনাথ কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে আসেন। সেখানে ডাক্তার শম্ভু মুখার্জী তাঁর হার্ট পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেন সে সতীনাথের হার্টের উপর মিডিয়াণ্টাই নামে একটি টিউমার হয়েছে। যার চিকিৎসার বিশেষ কোন ব্যবস্থা সে সময় আমাদের দেশে ছিল না। তাই সে সময়কার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের বিশিষ্ট হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শম্ভুনাথ মুখার্জী সতীনাথকে বিদেশে চিকিৎসা করানোর প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিদেশে চিকিৎসা করানোর ইচ্ছা ছিলো না সতীনাথের। তিনি জানতেন, এই রোগেই তাঁর জীবন শেষ হবে। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনে সেই দিন। ১৯৬৫ সালের ৩০শে মার্চ সকালে তাঁর নিজের বাড়ী পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজারে কুয়োর পাশে পড়ে গিয়ে টিউমার ফেটে মারা যান সতীনাথ। সে সময় সতীনাথের পাশে কেউ ছিল না। পাচক গিয়েছিল বাজারে। প্রজ্ঞাদীপ্ত, শিল্পসচেতন, মিতবাক, মহান লেখক সতীনাথ একাই পৃথিবীর বুক থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জী রচনা করার মতো তথ্য তেমনভাবে পাওয়া যায় না। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী লতিকা রেণু ও স্ত্রী পদ্মা দেবী এবং সাহিত্যানুরাগী বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া সামান্য জীবন তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর শিল্পীমানসের পরিচয় সন্ধান করলে দেখা যায় ফণীশ্বরনাথ রেণু সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, দেশী-বিদেশী, বিশেষত বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য-অনুরাগী, সমাজ-অর্থনীতি সচেতন, স্বকীয় চিন্তা-শিল্প ভাবনায় স্বয়ংক্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির অনেকটাই সতীনাথের থেকে পাওয়া, যা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতায়, জীবন-রসিক মানবিক বোধসম্পন্ন শিল্পচেতনার সামগ্রিকতায়।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলার 'ঔরাহী হিঙ্গনা' গ্রামে ফণীশ্বরনাথ রেণুর জন্ম হয়। তাঁর পিতা বাবু শীলানাথ কুর্মাক্ষত্রিয় বংশের সম্পন্ন এবং সহৃদয় কৃষক ছিলেন। শুধু 'ঔরাহী হিঙ্গনা'ই নয়, সেই অঞ্চলে সামাজিক দিক দিয়ে রেণুর পিতা বিশেষ সম্মানীয় ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। রেণু নিজেই লিখেছেন :

"বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি সাধারণত কৃষকদের মধ্যে অশিক্ষা অজ্ঞানতার জন্য জমি জায়গা নিয়ে সব সময় ঝগড়া লেগে থাকত। তার চূড়াতে পৌছালে সবাই বাবার কাছে আসতো। বাবা বকাবকি করে শান্ত করতেন। অনেক সময় মামলা মোকদ্দমায় পৌছাতো। বাবাই আবার ওদেরকে বুঝিয়ে মামলা উঠিয়ে দিতেন।......ছোটবেলা থেকে দেখেছি অনেক বাঙালী উকিলবাবুর আমাদের বাড়ীতে আনাগোনা ছিল।"[৬১]

ভৌগোলিক দিক দিয়ে দেখা যায় যে পূর্ণিয়ার একদিক নেপালের সঙ্গে যুক্ত, অপর দিকে বাঙ্গাল বা বর্তমান বাংলাদেশ আর অপর পার্শ্বে মিথিলা। ফণীশ্বরনাথ রেণুর পরিবারে মিথিলা ও বাংলা সংস্কৃতির অনেক প্রভাব ছিল। ফারবিসগঞ্জ সে সময় একটি ছোট খাটো শিল্পনগরীরূপে বিকশিত হয়েছিল। এই ফারবিসগঞ্জ থেকে পূর্ব নেপালের বিরাটনগর অতি নিকটে। পাহাড়ী পথে দার্জিলিংও বেশী দূরে নয়। মিথিলার এই অঞ্চল নেপাল এবং বাংলাদেশের সীমান্তে। রেণুর গ্রাম 'ঔরাহী হিঙ্গনা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (এন.ই. এফ. আর.)-এর উপর সিমরাহা স্টেশনের কাছে ফারবিসগঞ্জ থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে। আমের বাগান এবং সবুজ খেতের মধ্যে অবস্থিত। যাতায়াতের জন্য আজও একমাত্র সম্বল 'গরুর গাড়ী'। এরূপ গণ্ডগ্রামে ফণীশ্বরনাথ রেণুর জন্ম।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর জন্মের পর তাঁর পিতামহী (ঠাকুমা) তাকে 'রিনুআ' বলে ডাকতে শুরু করেন; কারণ, এই শিশুটি নিজের ঋণ আদায় করতে এসেছে।[৬২] অনেকের মতে রেণুর জন্মের সময় তাঁর পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই তাঁর নাম 'রিনুআ' (অর্থাৎ ঋণ নিয়ে যার জন্ম বা যার কারণে ঋণ হয়েছে)।[৬৩] পরে এই গ্রামীণ নাম পরিবর্তিত হয়ে 'রেণু' হয়। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক গঠনমূলক কাজের জন্য রেণুর পিতা শীলানাথবাবুর বাঙালী বন্ধুর সংখ্যা অনেক ছিল। বাঙালী এবং নেপালী অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে রেণুর পিতার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল।

পূর্ণিয়ায় তখন ধীরে ধীরে একটি বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে এই বাঙালী সমাজের পত্তন। ইংরেজ সরকারের চাকরিতে অফিসের কেরানি, কোর্টের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার হিসেবে তখন পূর্ণিয়ায় বাঙালী সমাজ গড়ে ওঠে।[৬৪]

তখনকার দিনে কালাপানির দেশ হিসাবে পূর্ণিয়াকে চিহ্নিত করা হত। উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ণিয়া বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন (১৯০৫)। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় (১৯১১)। দুটি নূতন প্রদেশ স্থাপিত হয় ও বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় (১৯১১)। পূর্ণিয়া বিহার রাজ্যের একটি জেলা রূপে পরিগণিত হয়।[৬৫]

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে জানা যায় যে পূর্ণিয়া বাংলাদেশেরই একটি অংশ ছিল, তাই সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যায় বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার প্রভাব পড়ে। রেণু নিজেই বর্ণনা করেছেন, "আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত পূর্ণিয়া জেলার গ্রাম সমাজের সাধারণ গৃহস্থেরা নিজের ঘরে বাংলা শিশুবোধ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং বাংলা পঞ্জিকা রাখা অতি আবশ্যক মনে করতেন, পড়ুয়া ছেলেদের প্রশ্ন করা হত · বাংলা রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারো? ভগতাই গায়নে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পালা গাইতে পারো? প্রত্যেক গ্রামে একাধিক বারোয়ারি বা ব্যক্তিগত খোল নিশ্চয়ই থাকত। খোল মানে সরাসরি নদীয়া থেকে আনানো শ্রীখোল। তাই ভাদ্রমাসের রাত্রে—শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর কয়দিন আগে থেকেই, আগের রাত পর্যন্ত খোল-করতালের তালে তালে ভগতাই গায়েনের কলিগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াত। সারা জেলায় রেলওয়ে স্টেশনের মাষ্টার থেকে আরম্ভ করে স্কুলের মাষ্টার, উকিল-মোক্তার হাকিম, ডাক্তার বৈদ্য, রোড সরকার পর্যন্ত—বাঙ্গালীদের 'রাজ' ছিল।"[৬৬]

ফণীশ্বরনাথ রেণুর প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষা বাঙালী শিক্ষকের কাছে এবং গ্রামেরই বাংলা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাঙালী ছেলেদের সাহচর্যে সম্পন্ন হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার পর ফণীশ্বরনাথ রেণু নেপালের বিরাটনগর স্কুলে ভর্তি হন। বিরাটনগর স্কুলে শিক্ষালাভের সময়েই তিনি ঐ স্থানের বিখ্যাত কোইরালা পরিবারের সংস্পর্শে আসেন। ফণীশ্বরনাথ রেণু নেপালের যে স্কুলে

পড়তেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নেপালের মুক্তিযুদ্ধের নায়ক বিপ্লবী বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কোইরালা ; যিনি রেণু'কে আপন সন্তানের মত স্নেহ করতেন।[৬৭]

এরপর ফণীশ্বরনাথ রেণু বিরাটনগরের স্কুল থেকে সসম্মানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অররিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অররিয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনেরই। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মী সন্ন্যাসীদের জীবন-যাত্রা প্রণালী কিশোর রেণুর মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে ; যার সম্বন্ধে তিনি পরে তাঁর 'কিতনে চৌরাহে' নামক উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। ফণীশ্বরনাথ নিজেই তাঁর প্রারম্ভিক শিক্ষা ও শৈশবকাল সম্পর্কে লিখেছেন :

"আমার শৈশব, বিরাটনগরের (নেপাল) 'কোইরালা নিবাসে' অতিবাহিত হয়। 'কোইরালা পরিবারে'ই আমার লালন পালন হয়। পিতৃদেব স্বর্গীয় কৃষ্ণাপ্রসাদ কোইরালা নেপালের প্রথম বিপ্লবী নেতা রূপে পরিচিত। তিনি নিজের পরিবারকে আপন আদর্শে গড়ে ছিলেন। তাই এই 'কোইরালা নিবাসে' যে নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল তা কোন আশ্রমেই সম্ভব। নিজের থেকে বয়সে বড়—যদি সে সাধারণ চাকর, বাগালও হয়, আমরা কখনো তার সঙ্গে কোন অশোভন আচরণ করতে পারতাম না। প্রত্যেক দিনই প্রার্থনা করতে হতো। প্রার্থনার প্রথম চরণ ছিল "তেরে হী জলবে সে জগ কে কর্তা য়ে বাগে আলম মঁহক রহা হে।' অর্থাৎ 'হে বিশ্বনিয়ন্তা প্রভু তোমারই করুণায় এই বাগানের সব ফুলগুলি সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।' পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই নিজেকে স্বেচ্ছাসেবক মনে করতো। একটি হস্তলিখিত দৈনিক বুলেটিন ইংরেজী, হিন্দী এবং নেপালী ভাষায় প্রকাশিত হতো—যাতে 'কোইরালা নিবাসে'র খবর, এবং এই নিবাসে যেসব অতিথিরা, গণ্য-মান্য লোকেরা আসা-যাওয়া করতেন তাঁদের সম্বন্ধে এবং বাজার দরের খবর ইত্যাদি প্রকাশিত হতো।

কিন্তু এসব ছাড়া এই 'কোইরালা নিবাসে' এমন দু-জন প্রাণী ছিলেন যাদের উপর এই নিবাসের নিয়ম উলঙ্ঘনের জন্য দোষারোপ প্রায়ই করা হতো। এঁরা হলেন তারিণীপ্রসাদ কোইরালা ও ফণীশ্বরনাথ রেণু। যাঁদের নাম 'কালা রেজিষ্টার' (Black Registar)-এ লেখা হয়েছিল। কারণ দুজনেই সকাল আটটার সময় ঘুম থেকে উঠতো। মা ও বাবা আমাদের এই অভ্যাস ছাড়ানোর বহু চেষ্টা করেন। আমাদের কোইরালা পরিবারের সমাজ থেকেও বহিষ্কৃত করা হলো। সমস্ত নিবাসের সদস্যদের সামনে এমন কি বাহিরের লোকদের সামনেও আমাদের অপমানিত করা হলো। 'নিবাস বুলেটিন'-এ আমাদের উপর অনেক

তির্যক মন্তব্য প্রকাশ করা হলো। আমাদের ব্যঙ্গ চিত্র ছাপানো হলো। আবার অনেক সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারও প্রয়োগ করা হয়েছে।

এইবার মা, বাবার সামনে আমাদের ডেকে খুবই স্নেহ করে বললেন, ঠিক আছে আজ থেকে তোমরা দুজন যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমাও। তোমাদের মধ্যে কে আগে উঠে দেখা যাবে? ভাল কথা, কাল থেকে তোমরা এক কাজ করো তোমাদের মধ্যে কে আগে উঠে কালেণ্ডারের তারিখ এবং দিন-এর কার্ড বদলাতে পারে—তা দেখতে হবে। এক সপ্তাহে যে অধিক নম্বর পাবে তাকে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা খুব সুন্দর উপহার দেওয়া হবে, বুঝেছ?

আমরা দুজন বন্ধু আজ্ঞাকারী বালকের মতো মাথা নত করে এই কথা মেনে নিলাম এবং নিজের নিজের কামরায় ফিরে এলাম। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা কথা বলতে থাকলাম। কিন্তু রাত ঠিক একটায় যখন আমি বৈঠকখানা-ঘরের দেওয়াল খুঁজছিলাম তখন একটা শব্দ হলো। মা নিজের কামরা থেকেই জিজ্ঞেস করলেন—কে-রে? আমি বললাম আমি রেণু। ক্যালেণ্ডারের তারিখ ও দিন বদলাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরেই বাবার কামরা থেকেই বাবার অট্টহাসি শোনা গেল। তারপরেই 'কোইরালা নিবাসে'র সব সদস্যেরাই উঠে এলে সবার মাঝে আমি মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিলাম এবং মা আমায় খুব বকছিলেন আর তারিণী আমার হয়ে মাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল—(আম্মা) মা, নূতন দিন এবং তারিখ তো বারো বেজে এক মিনিটেই শুরু .....

মা আরো রেগে বলেছিলেন—'চুপ করো। কাল সকালে তোমাদের দুজনের জলপান বন্ধ। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ। আর ক্যালেণ্ডারের দিন তারিখ বদলানোও বন্ধ .....।'[৬৮]

ফণীশ্বরনাথ তাঁর বাল্যকালের ছাত্রজীবনের স্মৃতিচিত্র সম্পর্কে লিখেছেন:

"সে ১৯৩০-৩১ সালের কথা। আমি সে সময় অররিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তাম। মহাত্মা গান্ধীর কারারুদ্ধ (অ্যারেষ্ট) হওয়ার খবর শুনে সমস্ত বাজার বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সব ছাত্র স্কুল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দ্বিতীয় দিনও আমরা গান্ধীজীর কারারুদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে হরতালে থাকলাম। যেহেতু আমি খদ্দরধারী ছিলাম, তাই স্কুলে হরতালের সঙ্গে সঙ্গে পিকেটিংও করছিলাম। অর্থাৎ আমি হাত জোড় করে যারা স্কুলে বা কাজে

যাচ্ছিল তাঁদের মানা করছিলাম। আমি এত বেশী উৎসাহিত ছিলাম যে স্কুলের অ্যাসিস্টেণ্ট হেড মাষ্টার সাহেবকেও স্কুল যেতে বাধা দিলাম।

দ্বিতীয় দিন আমি স্কুলে এসে শুনলাম প্রত্যেক হরতালী ছাত্রকে আট আনা জরিমানা দিতে হবে। দু-তিনটে ঘণ্টা পড়া হওয়ার পর হেড মাষ্টার সাহেবের নোটিস বের হলো—যে সব ছাত্ররা কাল স্কুলে অনুপস্থিত ছিল তার দণ্ড হিসেবে আট আনা জরিমানা দিতে হবে···আর যারা নিজের দোষ স্বীকার করে মাফ চাইতে চায় তাদের দরখাস্ত দিতে হবে···।'

নোটিসের শেষে বিশেষ করে আমার নাম এবং ক্লাশ, রোল নং দিয়ে লেখা হয়ে ছিল যে অ্যাসিস্টেণ্ট হেড মাষ্টারের সঙ্গে অশোভনীয় ব্যবহার (ইম্পার্টিনেণ্ট বিহেবিয়রের) জন্য সমস্ত স্কুলের ছাত্রদের সামনে, পঞ্চম ঘণ্টার পর এই ছেলেকে দশ ঘা বেত লাগানো হবে।'

নোটিশ বের হওয়ার পরেই আমি হঠাৎ 'হীরো' হয়ে গেলাম। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা কেউ এসে আমাকে সাবাসী দিতে লাগলো, আবার অনেকে আমায় ধৈর্য ধরতে বললো, আবার কেউ আমার দুঃখে দুঃখী হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলতে লাগলো।

কিন্তু আমি জালিয়ানওয়ালাবাগের মদন গোপালের কাহিনী পড়েছিলাম। আমার মাথায় মদন গোপালের আত্মা এসে যেন চড়ে গেল। অনেক অধ্যাপক এসে আমায় অনেক বোঝালো—আমাকে ভয় দেখাতে লাগলো। কিন্তু আমি ক্ষমা চাইতে রাজী হলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুরা কোথা থেকে ফুলের মালা, চন্দন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে নিয়ে এল।" স্বয়ং রেণু স্বীকার করেছেন যে, এই ঘটনাটার উল্লেখ তিনি তাঁর 'কিতনে চৌরাহে' উপন্যাসে করেছেন।[৬৯]

ফণীশ্বরনাথ রেণু সম্পর্কে যতটুকু যা জানা যায় তা থেকে একথা বোধ হয় বলা যায় যে, অনেকগুলি বিপরীত গুণের সমাবেশ হয়েছিল তাঁর চরিত্রে। নেপালের 'বিরাটনগর' থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে কলেজে পড়ার সময় ১৯৪২-এ লেখাপড়া বন্ধ করে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ফণীশ্বরনাথ বেনারসের হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় রাজনীতির জন্যই তিনি পড়া ছেড়ে দেন। এরপর জীবনের বাকি অংশ তিনি নিজের অঞ্চল পূর্ণিয়া ও উত্তর

বিহারেই অভিবাহিত করেন। বেনারস থেকে এসে তিনি সাহিত্যচর্চা ও রাজনীতি নিয়ে সময় কাটান। পূর্ণিয়াতে 'নঈদিশা' ১৯৪৫ এবং 'নয়াকদম' ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। এবং পূর্ণিয়া অঞ্চলের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে এই পত্রিকায় অনেক গল্প, প্রবন্ধ এবং 'রিপোর্টাজ' (সম্পাদকীয়) ইত্যাদি গভীর সংবেদনার সঙ্গে রচনা করেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মত তাঁরই অঞ্চলের অধিবাসীদের কেন্দ্র করেই পরিপুষ্ট হয়েছে। ফণীশ্বরনাথ রেণু নেপালের শ্রী বি. পি. কোইরালার সহযোগী থেকে সেখানকার সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিহারের বিপ্লবী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের তিনি একনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। আপৎকালীন জরুরী অবস্থায় (ইমারজেন্সী) তাঁকে জেলে আবদ্ধ করা হয়। ভারত সরকার কর্তৃক তাঁর সাহিত্য-কৃতির জন্য তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে (১৯৫৫) সম্মানিত করা হয়, কিন্তু সরকারের দমনকারী নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সেই উপাধি তিনি ফিরিয়ে দেন। ১৯৫৫তে বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ থেকে 'উদীয়মান যুবা সাহিত্যকার' হিসেবে সান্ত্বনা পুরস্কারে তাঁকে বিভূষিত করা হয়। বিহার সরকার রেণুকে সাহিত্যিক রূপে এক বিশেষ মাসিক বৃত্তি দেন, কিন্তু ফণীশ্বরনাথ রেণু বিহার সরকার প্রদত্ত মাসিক সেই বৃত্তিও গ্রহণ করেননি।

পড়াশুনা ছাড়া, গান-বাজনা, গল্প করা, আড্ডা জমানো ছিল ফণীশ্বরনাথের জীবনচর্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটা খুবই ছোট ঘটনাকে তিনি রসিয়ে তিল থেকে তাল করে বলে জমিয়ে তুলতে পারতেন। খুবই আলাপী ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে যে কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গেও তিনি আলাপ করে বন্ধু করে নিতে পারতেন। এদিক দিয়ে তিনি সতীনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। সতীনাথ চায়ের আড্ডা, তাসের আসর বা হৈ-হৈ, নিমন্ত্রণ বাড়ির হট্টগোল মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু ফণীশ্বরনাথ রেণু আড্ডায় গানবাজনা এবং খেলার মাঠে হৈ-হৈ করতে গল্পগুজব করতে বেশ ভালবাসতেন। তিনি 'ভাদুড়ীজী' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে নিজেই স্বীকার করেছেন: "আমি দুই মাসে যত কথা জেলে বলেছিলাম, ভাদুড়ীজী তিন বছরের মধ্যে ওর চেয়ে অনেক কম কথা বলেছিলেন নিশ্চয়ই।"

ফণীশ্বরনাথ রেণুর একটা বিশাল কর্মজগতও ছিল। তিনি 'নঈদিশা', 'নয়াকদম' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতেন। ১৯৫০ সালের

নেপালের মুক্তিসংগ্রামের একনিষ্ঠ বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। দীর্ঘদিন সোশালিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মকর্তা ছিলেন। একনিষ্ঠ কৃষক আন্দোলন করেন, নেপালের প্রথম ঐতিহাসিক কৃষক-মজদুর আন্দোলনের তিনি এক বিশেষ কর্মী ছিলেন।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর বিশাল কর্মজীবন, সাহিত্যিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তাঁর অনুজপ্রতিম সহকর্মী বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কোইরালা (নেপালের ক্রান্তিকারী নেতা কৃষ্ণপ্রসাদ কোইরালার জ্যেষ্ঠ পুত্র) লিখেছেন :

"ফণীশ্বরনাথ রেণু আমায় সান্দাজু বলতেন। নেপালী ভাষায় সান্দাজু'ওর অর্থ বড় ভাইয়ের থেকে ছোট, কিন্তু নিজের থেকে বড় ভাই।......রেণু শুধু-মাত্র একজন বিপ্লবী ছিলেন না তিনি একজন প্রকৃত মানুষ ছিলেন। হাসি-খুশী, প্রাণবন্ত মানুষ। নেপালের বিপ্লবী (১৯৫০-এর সশস্ত্র বিদ্রোহ) রূপে তিনি সাধারণ কর্মী ও নেতাদের মধ্যে বিশেষ সম্মানীয় ও জনপ্রিয় ছিলেন।"[৭০]

বস্তুত ফণীশ্বরনাথ রেণু গ্রামের সর্বত্রই ভক্তি এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বিভিন্ন ঘটনায় জানা যায়, আপামর জনসাধারণ তাঁর মতামতকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন।

১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় কলেজে পড়া বন্ধ করে রাজনীতির সক্রিয় জীবনে প্রবেশ করার পর ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবনের পরিধি আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর লোকদের সংস্পর্শে তিনি আসেন। তাঁর সাহিত্যিক গুরু সতীনাথের সঙ্গে পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের তিনি একজন কর্মকর্তা ছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছেন। এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাদ দিলে আর যাঁরা বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনটাকে ভরিয়ে তুলেছিলেন তাঁরা হলেন উত্তর বিহারের সাধারণ মানুষ। যাঁদের বিচিত্র চরিত্রের মিছিল তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতির মধ্যে বহুবর্ণে ধরা আছে।

হিন্দী কথাসাহিত্য জগতে ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবনচর্যা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি একদিকে যেমন বিদ্রোহী যুবা সাহিত্যিক, অপরদিকে সঙ্গীতপ্রিয় আড্ডাবাজ, সাংবাদিক, খেতে ভালবাসতেন, গল্প করতে ভালবাসতেন, প্রচণ্ড জেদী, কোন অন্যায়কে সহ্য করতে পারতেন না আবার রসিক প্রেমিকও ছিলেন। মানুষের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ-মানব, জীবনের অপার রহস্য এবং দশের জন্য কাজ করার দুর্দমনীয় নেশা তাঁকে বার বার ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল।

এজন্য তিনি ছোটবেলা থেকেই স্বাভাবিকভাবে রাজনীতিতে চলে এসেছিলেন।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর বেশ লম্বা ও বাবরি চুল ছিল, তাঁর এই লম্বা চুল দেখে স্বরেশ শর্মা এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন নবযুবক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে রেণু হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন :

'মুঝে ইন লম্বে বালোঁ কো দেখকর অপনে লিয়ে গৌরব মহসুস হোতা হে কেঁউকি উন দিনোঁ। সে বাল রখতা হুঁ যব ইস তরহ কা বাল রখনে কা চলন নঁহী থা। ইসতরহ তো মেঁ উনকা দাদা হুয়া।'[৭২]

এই বলে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত হো-হো করে হাসতে লাগলেন। এরূপ হাসি তাঁর চরিত্রের বিপরীত, কারণ তাঁর হাসিরও একটা স্বমার্জিত রূপ ছিল। কোন প্রসঙ্গে মৃদু হেসে আবার গম্ভীর হয়ে যেতেন। তাঁর সঙ্গে যেসব বিচিত্র ঘটনা ঘটতো তা গ্রামে হোক, ট্রেনে হোক, কফির আড্ডাতে হোক, কিংবা নিজের ঘরে-ই হোক তাকে তিনি রঙ চড়িয়ে বলতে ভালবাসতেন। তাঁর বলার এমন এক বিশিষ্ট ক্ষমতা ছিল যে তিনি যে-কোন প্রসঙ্গেই বলতে আরম্ভ করতেন লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনতো। এই অদ্ভুত বলার ক্ষমতার জন্য গ্রামের দুঃখ-পীড়িত মানুষদের সান্ত্বনা দিতেন। তিনি তাঁর লম্বা চুলগুলিকে খুব ভালবাসতেন। এই চুলগুলি প্রতি রবিবারে একবার বিশেষ করে ধুয়ে যত্ন নিতেন। এই চুলগুলির জন্য তাঁকে অনেক কষ্টও পেতে হয়েছিল। ১৯৪২-এর আন্দোলনে যখন তিনি জেলে ছিলেন সে সময় এই লম্বা চুলগুলি ধরে পুলিশেরা নিষ্ঠুরভাবে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিত। তিনি নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন 'সে সময় এই লম্বা চুলগুলোর জন্য আমার বিশেষ দুঃখ হতো।' (ধর্মযুগ, ২৩শে মার্চ, ১৯৭৫। ফণীশ্বরনাথ রেণুর সঙ্গে পত্রকার গীতার সাক্ষাৎকার)।

ফণীশ্বর গদ্য বা প্রবন্ধের চেয়ে গল্প-নাটক এবং উপন্যাসের চেয়ে কবিতা পড়তে বেশী ভালবাসতেন। নজরুলের কবিতার ওপর তাঁর বিশেষ রুচি ছিল। তিনি কবিতা প্রসঙ্গে বৈঠকি আলাপ করতে ভালবাসতেন। নিজেও কবিতা লিখতেন। তিনি নাটক দেখতেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পূর্ণিয়াতে নাটক, মুক্কড় নাটক মুখস্থ করার জন্য যুবকদের উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি ছবিও আঁকতেন। তাঁর গ্রামে নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য তিনি ছবি বানিয়ে দিতেন। প্রতি সন্ধ্যায় পূর্ণিয়ার একেক স্থানে মুক্কড় নাটক দেখানো হতো। সেখানে প্রথমে ফণীশ্বরনাথ রেণুর অঙ্কিত কোন সরকারী অত্যাচারের ছবি,

তারপর কবিতা পাঠ এবং শেষে নাটক মঞ্চস্থ করা হতো। সে সময় প্রত্যেক দিন খবর আসতো পুলিশ গ্রেফতার করতে আসছে। সত্য সত্যই একদিন নাটক মঞ্চস্থ করার সময় পুলিশ ফণীশ্বরনাথ রেণুকে ধরে নিয়ে যায়। এমারজেন্সীর সময় ফণীশ্বরকে জেলে বন্দী করা হয়।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবনটাই নাটক। তাই তিনি নাটক বিশেষ ভালবাসতেন। পাটনাতেও নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সে সময়কার প্রসিদ্ধ নির্দেশক নবনীত শর্মাকে বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছিলেন। এমনকি 'অন্ধের নগরী চোপট রাজা' নাটকে সাধুর ভূমিকায় তিনি নিজে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে সময় (এমারজেন্সীর) সরকার এ নাটক মঞ্চস্থ করতে নিষেধ করে। তাতে তিনি দুঃখ করে বলেছেন : 'ইংরেজ শাসনকালে এই নাটক আমি নিজের বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের নিজের শাসন ব্যবস্থায় এই নাটক আমরা মঞ্চস্থ করতে পারব না।'[৭৩]

সে সময় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা, সরকারের সমালোচনা করা অপরাধ ছিল। যার ফল তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। নবনীত শর্মার নির্দেশিত মোহন রাকেশের 'আষাঢ় কা একদিন' নাটক দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। নাটক শেষ হওয়ার পর রেণু নবনীত শর্মাকে ডেকে বলেছিলেন : 'কালিদাসের দুঃখে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। কাল লতিকাকেও দেখাতে আনব, যাতে এই নাটক দেখে তিনদিন তাঁর চোখের পাতা ভিজে উঠবে। এবং লোককে এই নাটক দেখার জন্য উৎসাহিত করবে।'[৭৪]

ফণীশ্বরনাথ রেণু বাহ্যজীবন এবং ঘটনা অন্তরের সঙ্গে মিশিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন তখন যেমন বাল্যাবস্থার অনেক স্মৃতি ভুলতে পারেননি, ঠিক তেমনি ভুলতে পারেননি তিনি যাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের কথা। তাঁর স্কুলজীবনের অনেক স্মৃতিই তাঁর পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন ফণীশ্বরনাথ রেণু। কোন হুজুগে পড়ে নয়, বা কোন বিশেষ রাজনীতির টানে আবেগাপ্লুত হয়েও নয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি এমন এক পরিবেশে বড় হয়েছিলেন যেখানে রাজনীতি করা স্বাভাবিক। তাঁর নিজের বাড়ী 'ঔরাহী হিঙ্গনা'তে সে সময় অনেক বড় বড়

মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনা ছিল। তাঁর পিতা শীলানাথবাবু যদিও সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না বা কখনও জেলে যাননি কিন্তু রাজবন্দীদের তিনি লুকিয়ে রাখতেন, তাঁদের নিষিদ্ধ বই, নিষিদ্ধ অস্ত্র-শস্ত্র তাঁর বাড়ীতে থাকতো। এরপর রেণু বিরাটনগরের কোইরালা পরিবারের সংস্পর্শে আসেন। সে সময় নেপালের প্রথম বিপ্লবী নেতা, নেপালের সশস্ত্র আন্দোলনের নায়ক কৃষ্ণপ্রসাদ কোইরালা রেণুকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন, তাঁরই সাহচর্যে থেকে তিনি নেপালের মুক্তি সংগ্রামের জন্য দীক্ষিত হয়েছিলেন।

ফণীশ্বরনাথ রেণু স্থির সংকল্প নিয়ে ১৯৩১ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রাজনীতি করার অর্থ ধান্দাবাজী করা নয় বা স্বার্থসিদ্ধির উপায়ও নয়। দেশসেবার জন্য প্রকৃত দেশপ্রেমীর যে রাজনীতি সেই রাজনীতি ছিল ফণীশ্বরনাথ রেণুর। ত্যাগ, আদর্শ, সাধকোচিত জীবনচর্যার সঙ্গে রেণুর জীবনাদর্শ ও জীবনাচরণের মধ্যে যেন নাড়ীর যোগ ছিল। 'ছাত্রকাল থেকেই রেণুর নেতৃত্ব করার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল।'[৭৫] এই নেতৃত্ব করার শখ তাঁর এত বেশী ছিল যে তার জন্য সাহিত্য রচনাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্কুলজীবন থেকেই তিনি সমাজসেবামূলক এবং অন্যায়-অবিচার-মূলক কাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা, ছাত্রদের নিয়ে 'পিকেটিং' করা ইত্যাদি কাজ করেছেন। তিনি ক্লাসে ভাষণও দিতেন। 'ফণীশ্বরনাথ রেণুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তিনি রাজনীতিতে কোন বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না—কিন্তু সমাজসেবামূলক অনেক, সভা-সমিতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।'[৭৬] ১৯৪১-এ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধের নামে ইংরেজ সরকার অর্থসংগ্রহের জন্য পাটনাতে ক্রিকেট ম্যাচ-এর আয়োজন করেছিল ফণীশ্বরনাথ রেণু পিকেটিং করে সেই ক্রিকেট ম্যাচকে বিফল করে দিয়েছিলেন।[৭৭] ফণীশ্বর ১৯৪১-এর শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন (আণ্ডারগ্রাউণ্ড) করেছিলেন এবং সেই অবস্থাতে ১৯৪২-এর আন্দোলনে জুন মাসে মুজফ্‌ফরপুরের কৃষক সম্মেলনে গোপনে যোগ দিয়েছিলেন এবং সবার সামনে থেকে সহজে বেরিয়েও এসেছিলেন।

১৯৪২-এর অগস্ট-আন্দোলনে রেণু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'জয়-প্রকাশ নারায়ণ যখন হাজারীবাগ জেল থেকে পালিয়ে যান তার পরেই ফণীশ্বরনাথ রেণু বন্দী হন এবং তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে বিহারের

বিভিন্ন জেলে তাঁকে রাখা হয়।"[৭৮] সেই সময়েই পূর্ণিয়ার জেলে তিনি সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে একসঙ্গে ছিলেন এবং সেখানে থেকে তিনি হিন্দী যা বাংলায় যা কিছু লিখতেন তা সতীনাথ ভাদুড়ীকে অবশ্যই শোনাতেন। জেলে সতীনাথের জীবনচর্যা ফণীশ্বরনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন :

"জেলে আসবার আগেই শুনেছিলাম—মানুষের আসল চেহারা জেলের ভিতরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। মুখোস খোলা আসল মানুষ। বাইরে থাকতে গলা ফাটিয়ে যাদের 'জয়জয়কার' করতাম তাঁদের সঙ্গে জেলে মাত্র কয়দিন থেকেই মনের আসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের প্রতিমাগুলো নিজেই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অনেক শ্রদ্ধেয় মূর্তিকে নিজের হাতে ভাঙ্গতেও হয়েছিল। ভাদুড়ীজীর সঙ্গে ওই তিন বছর থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বলে জীবন সংগ্রামের আঘাতে আমি কোনদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাইনি। (মূল হিন্দীর অনুবাদ—'ভাদুড়ীজী'--ফণীশ্বরনাথ রেণু 'বনতুলসী কী গন্ধ'। ভারত যাযাবর, পৃ. : ১১৭।)

১৯৪৩-এর শেষলগ্নে ফণীশ্বরনাথ রেণুকে ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে চালান করে। সে সময় রেণু বিহারের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক রাজবন্দী ছিলেন। ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে সে সময় বিখ্যাত সোসালিষ্ট নেতা শ্রী বি. পি. সিন্‌হা ছিলেন। রেণু ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকাকালীন সিন্‌হা মশায়ের কাছ থেকে 'সমাজবাদ' সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। সেখানেই একটি হাতে-লেখা পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। সমাজবাদ সম্পর্কে কবিতা-কাহিনী-গল্প লিখে প্রায় ৩০ মাস সময় অতিবাহিত করেন।

এইরূপে আড়াই বছর ধরে কারাজীবন কাটানোর পর ফণীশ্বরনাথ রেণু যখন জেল থেকে বাইরে আসেন তখন বিহারের বিদ্রোহী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং বেণীপুরীজী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রকৃত সাহিত্যিক ছিলেন, তাই প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের তিনি, বিশেষত রেণুকে খুবই স্নেহের সঙ্গে উৎসাহ দিতেন। রেণুকে জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্মানের চোখে দেখতেন। দিনকর, বেণীপুরী, নর্মদেশ্বরপ্রসাদ প্রমুখ প্রগতিশীল বিখ্যাত সাহিত্যিক জয়প্রকাশ নারায়ণের সাহচর্যে ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণেরই প্রেরণায় ফণীশ্বর সোসালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং কয়েক বছর কেন্দ্রীয় কার্যকর্তারূপে পার্টির কাজ করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে

ফণীশ্বরের মন রাজনীতি সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে পড়ে। তিনি অনুভব করেন স্বাধীনতার পর রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের কোন স্থান থাকবে না। যতটা জনসেবা, মিছিল, শ্লোগান, সভা-সমিতি অথবা বিধানসভার সদস্য হয়ে করা যেতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী দেশের দশের কাজ লেখার দ্বারাও (সাহিত্যরচনার) করা যায়। ১৯৫২-র প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সমাজবাদী দলের অপ্রত্যাশিত অসফলতাতেও তাঁর মনে বেশ আঘাত লাগে। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা তাঁর স্বাস্থ্য, তিনি জেল থেকে পেটের রোগ ও লেখার রোগ নিয়ে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। এই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বিরোধী রাজনীতিতে দৌড়াদৌড়ি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ১৯৫৩ সালে ফণীশ্বর রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যরচনায় মনোনিবেশ করেন।

এইরূপে ফণীশ্বরনাথ রেণু ১৯৫৩ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। মাঝে-মাঝে অনেকবার কংগ্রেসের দিক থেকে অনেক প্রলোভন তাঁর কাছে এসেছে। 'একেকটা এমন প্রলোভন ছিল যে তা পেয়ে যে কোন সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা বাদ দিয়ে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।'[৭৬] কিন্তু রেণু এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি বুঝেছিলেন এই খেতাবের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও নানা দুর্নীতি ছড়িয়ে আছে। তাই কোন স্বার্থসিদ্ধির আশায়, কোন বড় পদ বা খেতাবের আশায় ফণীশ্বরনাথ রেণু কংগ্রেসে যোগদান করেননি। ১৯৭২-এ নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে 'নৌকা' ছাপ নিয়ে নির্বাচনে নামেন। কিন্তু দলীয় রাজনীতির স্রোতে নৌকা ডুবে যায়। 'রেণুর জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার নিজের অঞ্চলের অধিবাসীদের হাতে তাঁর পরাজয়। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তিনি বলেছিলেন:

'হারা হুঁ তো ক্যা, বহুত সা কচ্চা মাল লে আয়া হুঁ। 'কাগজ কী নাঁও' লিখুঁগা।' (অর্থাৎ পরাজিত হয়েছি তো কি হলো অনেক কাঁচা মাল নিয়ে এসেছি তা দিয়ে 'কাগজের নৌকা' বানাবো।) কিন্তু দুঃখের বিষয় রেণুর এ স্বপ্ন সফল হয়নি। তার আগেই তিনি কালের কবলে পড়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।

ফণীশ্বরের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তিনি শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়, নেপালের মুক্তি সংগ্রামেও তিনি মুক্তি-যোদ্ধারূপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। 'তিনি নেপালকে মাসী এবং ভারতকে মা বলতেন।'[৭৭] বাস্তবিক-

ভাবে ফণীশ্বরনাথ মানুষের মুক্তির জন্য চিরদিন বিদ্রোহ করে গেছেন। ১৯৬৭তে অনাবৃষ্টির জন্য যখন বিহারে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয় তখন তিনি পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রিপোর্তাজ লিখেছিলেন যা কোন রাজনৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধি বা কোন বড় পদ বা খেতাবের জন্য নয়। সম্পূর্ণ মানবিকতার দিক দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে মহৎ আদর্শ নিয়ে স্বেচ্ছায় দুর্গতের পাশে দাঁড়িয়ে অশেষ দুর্গতি ভোগ করেছিলেন।

১৯৭৪-এর মার্চ মাসে বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে ছাত্র আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনে ফণীশ্বরনাথও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮ই মার্চ পাটনাতে কার্ফু জারী হয়েছিল তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ রোগশয্যা থেকে জেলা-আধিকারিককে ৮ই এপ্রিল 'মৌন মিছিল' বের করার অনুমতির জন্য তিনি একটি আবেদনপত্র লিখেছিলেন। আবেদনপত্রে একথা লিখলেন যে যদি অনুমতি না পাওয়া যায় তাহলে সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করেই মিছিল বের করা হবে। ৮ই এপ্রিল মিছিল বের হলো। তার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণ সংখ্যা স্থির করেছিলেন এক হাজার। সেই মিছিলে যারা সম্মিলিত হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের মুখে গেরুয়া রঙের পট্টি বাঁধা হয়েছিল। সেই মিছিলে অসুস্থ প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথও মুখে গেরুয়া কাপড় বেঁধে যোগদান করেছিলেন। তাঁর মুখ বন্ধ ছিল, কিন্তু তাঁর চোখে যেন আগুন, ধোঁয়া, বাষ্প সব কিছু ছিল।

সেই মিছিলে রামদয়াল পাণ্ডে, ডাঃ অমরনাথ সিন্‌হা, ডাঃ রামবচন রায় এবং ডাঃ বীণারানী শ্রীবাস্তব, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ শৈলেন্দ্র শ্রীবাস্তব প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে এপ্রিলের দুপুরের গরমে ৪ ঘণ্টা ধরে অসুস্থ রেণুর সেই পদযাত্রা পাটনাবাসীদের কাছে এক বিচিত্র অনুভব ছিল।

'বিহারের আন্দোলনে' আরও একটা নতুন রূপ দেওয়ার জন্য এরপর জয়প্রকাশ নারায়ণ অনশন করার কার্যক্রম প্রস্তুত করেন। শুধু পাটনা শহরেই নয় বিহারের অন্য শহর ভাগলপুর, গয়া, মজফ্‌ফরপুর, রাঁচি, জামশেদপুর শহরের অলিতে গলিতে স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণীরা অনশন করতে আরম্ভ করেন। শহরের অলিতে-গলিতে (নুক্কড়) সভার আয়োজন করা হয়। ১৭ই এপ্রিল ফণীশ্বরনাথ রেণু কিছু সাহিত্যিকের সঙ্গে পাটনার 'লখনউ স্যুইট হাউস' দোকানের কাছে ঠিক ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের সামনের বেদীতে (যাকে

বর্তমানে পাটনার অনশন ত্রিকোণ বলা হয়।) প্রসিদ্ধ হিন্দী বিপ্লবী কবি নাগার্জুন, রবীন্দ্র রাজহংস, জুগনু শারদেয়, মধুকর সিং এবং প্রসিদ্ধ ছায়াকার এবং চিত্রকার দামোদরপ্রসাদ অম্বষ্ঠ-এর সঙ্গে অনশনে বসেন। রেণু নিজে সাদা পোস্টারে রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের, সুকান্তের কিছু কবিতা বাংলাতে এবং হিন্দীতে দিনকরের কিছু কবিতার তর্জমা করে অনশনস্থলের চারিদিকে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। দিনকরের একটি কবিতা :

'সমরক্ষেত্র হৈ, নঁহী পাপ কা ভাগী কেবল ব্যাধ
জো তটস্থ হৈ, সময় লিখেগা উনকা ভী অপরাধ।'

এখানে রেণু 'সমশেষ' শব্দটিকে 'সমরক্ষেত্র' করে লিখেছিলেন। ফণীশ্বরনাথ রেণুর সেদিনের অনশন (১৭ই এপ্রিল ১৯৭৪) বিহারের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন।[৭৯] সেদিন রাজধানীর এই ছোট গলিতে বিনা আহ্বানে কিছু সাহিত্যিক জন-আন্দোলনের সমর্থনে সমস্ত দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে অনশনে বসেছিলেন। তাঁদের ঠিক সামনে বিহারের প্রাচীনতম শিক্ষা নিকেতন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ জন বিভিন্ন বিভাগের প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিমান অধ্যাপকেরা অনশনে বসেছিলেন। ফ্রেজার রোডের সেই চৌরাস্তার মোড় সেদিন ধন্য হয়ে উঠেছিল। সে রাস্তায় সেদিন যাঁরা যাচ্ছিলেন প্রত্যেকেই কিছুক্ষণের জন্য সেখানে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন—পদ্মশ্রী উপাধিপ্রাপ্ত রেণু, 'তিসরী কসম' হিন্দী ফিল্মের গল্পকার রেণু, মৈঁলা আঁচল রচয়িতা রেণু, লম্বা বাবরি চুলওয়ালা রেণু, অসুস্থ রেণু গলায় মালা পরে অনশনে বসেছিলেন। ধীরে ধীরে ফ্রেজার রোডে জনসংখ্যা বাড়তে লাগলো। প্রায় ৪০ হাজার জনগণের মাঝে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত ফণীশ্বর চিৎকার করে বলে উঠলেন—'হোঁগে দক্ষিণ, হোঁগে বাম, জনতা কো রোটি সে কাম।' অনশন শেষ হওয়ার পর সেখানে উপস্থিত সব কবিগণ নিজের নিজের কবিতা পাঠ করেন। ফণীশ্বরনাথ রেণুর নেতৃত্বে সেদিনের কবিসভায় ছিলেন—সত্যনারায়ণ গোপীবল্লভ, আলোক ধন্বা, বালেশ্বর বিদ্রোহী এবং ডাঃ অমরনাথ সিং প্রমুখ। "১৭ই এপ্রিল ১৯৭৪-এর বিহারের আন্দোলন বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিক আন্দোলন রূপ এক 'নবীন সাহিত্যিক আন্দোলনের' জন্ম হলো, যার নেতা হলেন ফণীশ্বরনাথ রেণু।"[৮০]

এরপর ফণীশ্বরনাথ রেণু জনবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে রামচরণ রায়, জুগনু শারদেয় এবং হিন্দীর অন্যান্য বিদ্রোহী কবিদের সঙ্গে শুধুমাত্র পাটনার বিভিন্ন অঞ্চলে নয়—রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে

কবিসভার আয়োজন করে এক বিশাল জন-মানসকে আন্দোলিত করেন। সেই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ভেলোরে চলে যান, আর ধীরে ধীরে জনবাদী আন্দোলনের সমস্ত নেতৃত্বের ভার ফণীশ্বরনাথ রেণুর কাঁধে এসে পড়ে। তিনি পাটনাতে **'জন-সংঘর্ষ'**, কমিটি সংগঠন করেন। এই দলের সংযোজক হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা রেণুর ছিল। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের নির্দেশ ছিল যে এই দলের সংযোজক কোন নির্দলীয় ব্যক্তিকেই যেন করা হয়। যেহেতু একটি বিশেষ দলের সঙ্গে রেণুর সম্বন্ধ ছিল, তাই সর্বোদয় নেতা শ্রী এস. এচ. রজীকেই জন-সংঘর্ষ কমিটির সংযোজক করা হয়। ফণীশ্বরনাথ রেণু এই জন-সংযোজক কমিটির প্রত্যেকটি কার্যকারিণী সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন।

৫ই জুন ১৯৭৪ লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে এক বিশাল ঐতিহাসিক মিছিল বের হয়। পাটনার গান্ধী ময়দান থেকে রাজভবন পর্যন্ত এই মিছিলে প্রায় পাঁচ লক্ষের অধিক লোক অংশগ্রহণ করে। এই মিছিলের আগে আগে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে ফণীশ্বরনাথ রেণুও ছিলেন। সেদিন অত্যধিক গরম ছিল। অসুস্থ রেণুর অবস্থা দেখে একজন সদস্য এসে তাঁর মাথায় তোয়ালে বেঁধে দিল। অনেকেই তাঁকে গাড়ীতে চড়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু রেণু কারো কথা না শুনে সেই ভীষণ গরমে বেলা ১১টার সময় প্রায় ৭ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে রাজভবনে পৌছালেন এবং রাজ্যপালকে পাঁচ লক্ষ লোকের সামনে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য কাগজ এগিয়ে দিলেন। ৫ই জুনের পর আন্দোলনের আগুন বিহারের সর্বত্র গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে, ছড়িয়ে পড়ে। সেদিনের শান্তি মিছিলের ওপর ফণীশ্বরনাথ রেণুকে লক্ষ্য করে একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস বিধায়কের বাড়ী থেকে গুলি চালানো হয়। তাতে রেণু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এরপর জুলাই মাসে রেণু তখন গ্রামের বন্যা-পীড়িত লোকদের সাহায্য প্রার্থনা করতে সরকারী আধিকারিকদের কাছে যান, তখন তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে পূর্ণিয়া জেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৮১] সরকার অনেকদিন থেকে রেণুকে জেলে বন্দী করার জন্য সুযোগ খুঁজছিল। সরকারী অফিসারের সঙ্গে অপমানজনক আচরণের অপরাধে রেণুর তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই জেলযাত্রায় তাঁর স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়ে।

এরপর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ফণীশ্বরনাথ পাটনায় ফিরে আসেন। কিন্তু ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭৪ লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের ওপর

বর্বরভাবে লাঠি চালানো হয়। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে রেণু গুরুতর আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুস্থ হয়ে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের উপর বর্বর লাঠিপ্রহারের প্রতিবাদে গান্ধী ময়দানে যে বিশাল জনসভা হয় তাতে ফণীশ্বরনাথ রেণু 'পদ্মশ্রী' পদবী ফেরত দেন। (ধর্মযুগ ৫ই জুন-১৯৭৭)। রেণুর উপর লাঠি প্রহারের জন্য সরকার ব্যবহারিকরূপে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু লাঠির প্রহারে রেণু খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সরকারের অমানবীয় ব্যবহারে তিনি খুবই নির্লিপ্ত নিরাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই কয়েক মাসের জন্য পাটনা থেকে বোম্বাইতে চলে যান, সেখান থেকে নিজের গ্রাম ঔরাহী হিঙ্গনাতে ফিরে আসেন। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি পাটনায় এসে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে দেখা করতেন এবং আন্দোলন সম্পর্কে কিছু পরিকল্পনা তৈরি করতেন।

২৫শে জুন ১৯৭৫ 'জরুরী অবস্থা' (এমারজেন্সী) ঘোষণা করা হয়। সেদিন গ্রামে (ঔরাহী হিঙ্গনা) ফণীশ্বরনাথের মেয়ের বিবাহ ছিল। ২৬শে জুন মেয়ের বিদায়ের দিন। মেয়েকে বিদায় দেওয়ার জন্য রেণু জিনিসপত্র ঠিক-ঠাক করতে ব্যস্ত ছিলেন। বিয়ের অতিথি অভ্যাগতের ভীড়ে তিনি রেডিয়োতেও সংবাদ শোনার সময় পাননি। রাত্রে হঠাৎ থানার ইন্সপেক্টর এসে বললো, 'আপনার নামে হুকুমনামা (ওয়ারেণ্ট) আছে। কিন্তু আপনি যদি দু-দিনের মধ্যে গ্রাম থেকে পালিয়ে যান তাহলে গ্রেফ্তার হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। আমি আপনাকে দু-দিন সময় দিতে পারি।' রেণু উত্তর দিয়েছিলেন, 'তুমি যদি বলো আমি এখনই লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে তোমার সঙ্গে যেতে রাজী আছি। অন্য কাপড় আমার কাছে নেই, চুরি হয়ে গেছে। দু-দিন পরে এসো আমি কাপড় সেলাই করে নেবো। পরশু এসো আমি তোমার সঙ্গে যাবো।' দারোগাবাবু রেণুকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, তিনি যাবার সময় বললেন, 'ঠিক আছে, আমি পরে আসবো; কিন্তু আপনি যদি কোথাও চলে যেতেন ভাল হতো, দু-দিন আপনাকে ছেড়ে গেলাম। কাছে নেপাল আছে সেখানেও যেতে পারেন।'

তখন নেপালের নাম শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরানো ফিল্মের চাকার মতো রেণুর মনের পর্দায় ভেসে ওঠে বাল্যকালের স্মৃতি। তিনি মনে মনে ভাবলেন বাস্তবিক যদি লেখার, বলার এবং ছাপানোর স্বাধীনতা শেষ হয়ে গেছে, আবার তা পাওয়া যাবে কিনা তারও আশা নেই, তাহলে এখন ভারতে বেঁচে থেকে

কি লাভ। শুধুমাত্র খাওয়া ও ঘুমানোর জন্য ভারতভূমির কি প্রয়োজন? তাঁর মনে হলো মা মরে গেছে। কথায় বলে মা মরে গেলে মাসীকে বাঁচাও— নেপাল আমার মাসী' ('ক্রান্তিকথা') ফণীশ্বরনাথ নিজের গ্রাম, নিজের ঘর পরিবার, নিজের দেশ ছেড়ে নেপাল চলে গেলেন।'[৮১]

নেপালে এসে তিনি তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলেন, তার মধ্যে কয়েকজন নেপাল সরকারের অফিসার ছিলেন। কোইরালা বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করলেন এবং সবার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, 'আমাকে নেপালের নাগরিকতা দিয়ে দাও, নাহলে কোন বিদেশী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্য কোন দেশের নাগরিকতা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। আমি ভারতীয় নাগরিকত্ব তিলাঞ্জলি দিতে রাজী আছি, ভারত ছেড়ে আমি জাহান্নামেও যেতে রাজী আছি। তখন অনেক বন্ধুরা আমার এরূপ মানসিক অবস্থা দেখে আমাকে বোঝালো এরকম কোরোনা, এতে ভারতের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবে। তোমার মত আন্তর্জাতিকখ্যাতি প্রাপ্ত লেখক যদি নিজের রাষ্ট্রীয়তা ত্যাগ করে তাহলে অন্য দেশের হেড্ লাইনে এই সংবাদ বেরোবে, যা লেখকজগতের কাছে সম্পূর্ণ ক্ষোভজনক সংবাদ হবে। ভারতের অন্য লেখকেরাও দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইবে, তাতে সাধারণ জনসাধারণের মনোবল আরো ভেঙে পড়বে, তাহলে কোন দিনই এই স্বেচ্ছাচারিতার শেষ হবে না। কিছু এমন বন্ধু ছিল যাঁরা উৎসাহিত হয়ে সত্য সত্যই অন্য জায়গার নাগরিকতা এবং লেখকের স্বাধীনভাবে সঙ্গে বাঁচার ব্যবস্থা করে দিল। প্রায় একমাস পর্যন্ত রেণু দ্বিধার মধ্যে থাকলেন—কি করবেন, ভারতে ফিরে যাবেন, না অন্য দেশের নাগরিকতা নিয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচবেন। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়তা-জাতীয়তার ভাবনাই জয়যুক্ত হলো। কিছু সময়ের জন্য তাঁর উপর ভারত সরকারের অমানবীয় আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন। তাই কিছুদিন ফেরারী জীবন কাটিয়ে আবার স্বদেশে ফিরে এলেন। পাটনাতেই থাকতে লাগলেন। এ সময় আর ধরা পড়েননি।

জরুরী অবস্থার (এমারেজন্সী) সময়েই তিনি 'এক রাঁড়, এক ষাঁড়' নামক একখানি লঘু উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু সে সময় তাঁর সৃষ্ট সেই উপন্যাসকে ছাপানোর মত দুঃসাহস কোন পত্রিকার বা কোন প্রকাশকের ছিল না। এ-ছাড়া সে সময় অন্য যা কিছু রচনা করেছিলেন, তা টুকরো

টুকরো অবস্থায় গোপন প্রকাশকের দ্বারা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে।"[৮৩] যার সম্বন্ধে এখন কিছু জানা অসম্ভব। কারণ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার জন্য রেণুর জরুরী অবস্থার রচনাগুলি এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

১৯৭৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত রেণু গ্রামে থাকাকালীন যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন অচেতন অবস্থায় তাঁকে পাটনায় আনা হয়। তিনি পেপ্‌টিক আলসারের পুরনো রোগী ছিলেন। অপারেশন করার প্রয়োজন ছিল, অনেকদিন এড়িয়ে গেছেন। এবারে তাঁকে পরীক্ষা করে ডাক্তারেরা স্থির করলেন 'অপারেশন' করতে হবে। তিনি হাসপাতালেই ছিলেন যখন লোকসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হলো। তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। তারপর যেদিন জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রথম সভা গান্ধী ময়দানে হয়, সেদিন তিনি ডাক্তারকে কিছু না বলে, হাসপাতালের কাউকে না জানিয়ে চুপচাপ গিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের সভায় মিলিত হয়েছিলেন। তারপর হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে এসে 'লোকতন্ত্ররক্ষী সাহিত্য' এর জন্য কিছু লিখে আবার হাসপাতালে চলে আসেন। প্রথমে ২২শে মার্চেই ফণীশ্বরনাথের অপারেশনের দিন ঠিক করা হয়। ২০শে মার্চ পাটনাতে ভোট ছিল। তিনি হাসপাতাল থেকে নির্বাচনকেন্দ্রে (বুথে) চলে এসেছিলেন, সঙ্গে শ্রীমতী লতিকা রেণু—হাতে পোষ্টার নিয়েছিলেন। অসুস্থ ফণীশ্বরনাথ রেণু'কে দেখে অনেকেই ঘিরে ধরলেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রেণুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ডাঃ শৈলেন্দ্র শ্রীবাস্তব ভারাক্রান্ত কণ্ঠে রেণুর কাছে এসে বললেন আপনিও চলে এলেন? তার উত্তরে রেণু বললেন: 'আতা কৈসে নঁহী, প্রজাতন্ত্র কী রক্ষা কে লিয়ে আনা হী থা। মেরা অপারেশন তো ২৪ কো হৈ। তানাশাহী কা অপারেশন তো আজ হী হৈ। অগর তানাশাহী নঁহী হটী, তো মেরা অপারেশন সফল হো য়্যা অসফল, ক্যা ফর্ক পড়তা হৈ।' (অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন: 'না এলে কি করে চলবে। গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য আমায় আসতে হলো। আমার অপারেশন তো ২৪ তারিখে হবে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারের আজ অপারেশন। যদি দেশ থেকে স্বেচ্ছাচারিতা না দূর হয় তাহলে আমার অপারেশন সফল হোক বা অসফল হোক তাতে কি এসে যায়।)

২১শে মার্চ তিনি সুইডেনের এক সাংবাদিককে ইণ্টারভিউ দেন, তারপর 'অপারেশনে'র জন্য 'পাটনা মেডিক্যাল কলেজে' ভর্তি হয়ে যান।

২৪ তারিখে অপারেশন হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সচেতন অবস্থায় নির্বাচনে কংগ্রেস এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরাজিত হওয়ার সংবাদ শুনে এবং 'জনতা সরকার' হওয়ার এবং 'মোরারাজী দেশাই'য়ের শপথ নেওয়ার কথা শুনে অনেক আশা এবং উৎসাহ নিয়ে অপারেশন টেবিলে যান। অপারেশন কক্ষের বাইরে তাঁর সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধবেরা অপেক্ষা করতে থাকেন, রেণু বাইরে আসবেন, জ্ঞান ফিরবে, তাঁকে নতুন সংবাদ শোনানো হবে—কিন্তু রেণু অপারেশন থিয়েটর থেকে বেরোলেন অজ্ঞান অবস্থায়, পরে সে জ্ঞান আর ফেরেনি। ২৫-২৬ তারিখ পার হয়ে গেলে, সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন—ডা. রামবচন রায়, স্ত্রী লতিকা দেবী, জুগনু শারদেয়, সূর্যনারায়ণ চৌধুরী, গোপীবল্লভ, রবীন্দ্র ভারতী এবং তাঁর ভায়রাভাই (সাড়ু), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছাড়া আরও অনেক সাহিত্যিক সবাই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন।

সারা বিহারে রেণুর জ্ঞান না ফেরার খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর দিল্লীতেও যায়। তখনকার প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণ সে সংবাদ শুনে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। তার পরের দিন দিল্লীর প্রসিদ্ধ সার্জন ডাঃ আত্মপ্রকাশ পাটনা এলেন। দু-দিন পর্যন্ত অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর গম্ভীর হয়ে বললেন—'জ্ঞান আসার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দিল্লী নিয়ে আসুন, খুবই বিপজ্জনক অবস্থা, কিছু ঠিক করে বলা যায় না। যতক্ষণ জ্ঞান না আসছে বিপদ আছে।' সন্ধ্যায় ডাঃ রামবচন অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন—'এখন একমাত্র ভগবান ভরসা।'

সন্ধ্যার মধ্যেই সারা পাটনা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়লো। স্থানে-স্থানে পাটনার আবাল-বৃদ্ধ-নরনারী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সাময়িকভাবে রেণুর জ্ঞান ফেরার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণও কয়েকবার হাসপাতালে রেণুকে দেখতে এলেন। কিন্তু রেণু ১১ই এপ্রিল অজ্ঞান অবস্থায় পরলোকে চলে গেলেন। এই মহান সাহিত্যিক, বিপ্লবী নিজের মৃত্যুকে ('সজন রে ঝুট্ মত বোলো, খুদা কে পাস জানা হৈ') সার্থক করে খুদার কাছে চলে গেছেন, পায়ে হেঁটে একাই, যাঁর রাস্তা 'মৈলা আঁচল' এবং 'পরতী পরিকথা' হয়ে যায়। সেই রাস্তার সহজ এবং সঠিক চিত্র কোটি কোটি ভারতবাসীর আজও প্রয়োজন, যাঁরা স্বেচ্ছাচারিতায় স্বেচ্ছাচারে আহত হয়েছেন।

ফণীশ্বরনাথ রেণু হিন্দী সাহিত্য-জগতে সর্বপ্রথম ছোটগল্প নিয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'বটবাবা' ১৯৪৫-এ 'সাপ্তাহিক বিশ্বমিত্র' পত্রিকায় (কলিকাতা থেকে প্রকাশিত) ছাপা হয়। রেণুর প্রথম পরিচয় রাজনৈতিক কর্মীরূপে অর্থাৎ তিনি আগে রাজনীতিবিদ্ পরে সাহিত্যিক। ১৯৫৩ সালে রেণু রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ১৯৭১ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সাধনা করেন। এই সময়েই পুর্ণিয়ার গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় তাঁর সৃষ্ট 'তিসরী কসম', 'উর্ফ মারে গয়ে গুলফাম', 'ঠুমরী' ১৯৫৯, 'আদিমরাত্রি কী মহক' ১৯৬৭ এবং 'অগিনখোর' ১৯৭৫ ইত্যাদি বিখ্যাত গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ফণীশ্বরনাথের 'তিসরী কসম' গল্পটিকে নিয়ে শৈলেন্দ্র ফিল্ম তৈরি করেন ১৯৬১-৬৬তে, যা পরে হিন্দীতে শ্রেষ্ঠ ফিল্ম হিসেবে 'স্বর্ণপদক' লাভ করে। এরপর রেণু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মৈলা আঁচল' ১৯৫৪, 'পরতী-পরিকথা' ১৯৫৭, 'দীর্ঘতপা' ১৯৬৩, 'জুলুস' ১৯৬৫, 'কিতনে চৌরাহে' ১৯৬৬, 'নেপাল ক্রান্তিকথা' ও 'ঋণ-জল-ধন-জল' রিপোর্টাজ দুটি ১৯৭৭ এবং 'পল্টবাবু রোড' ১৯৭৯-এ প্রকাশিত হয়।

'হিন্দী উপন্যাস জগতে প্রেমচন্দ্রের পর ফণীশ্বরনাথ রেণুই গ্রামীণ জীবনের সব চেয়ে বড় উপন্যাসকার'।[৮৫] তিনি পুর্ণিয়া অঞ্চলের প্রত্যেকটি মানুষকে জানতেন। 'ঔরাহী হিঙ্গনা' হোক বা 'ফারবিসগঞ্জ', পাটনা বা পুর্ণিয়া হোক, কথা বলার প্রসঙ্গে তিনি যেখানে থাকুন না কেন সেখানে পৌঁছে যেতেন। তাঁর দাম্পত্য জীবনে যেমন দুটি পত্নী ছিল, ঠিক তেমনি তাঁর দুটি ঘরও ছিল একটি 'ঔরাহী হিঙ্গনা'—অপরটি পাটনায়। এক জায়গা থেকে কাঁচামাল এনে অন্য জায়গায় তৈরি করতেন। তাঁর উপন্যাস শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে রেণুর জীবনে সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিটি স্রোতোধারায় সেই মহীয়সী নারী দু-জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান ছিলো।

রেণুর প্রথমা পত্নী পদ্মা, রূপে লক্ষ্মী, সরল-সহজ, করুণার প্রতিমূর্তি। রেণুর জীবনে যেন প্রথমে লক্ষ্মী, দ্বিতীয়ে সরস্বতী।

রেণুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বেণু। রেণুর মতই তেজস্বী রূপ। ছোট মেয়ের নাম ওয়াহিদা। সে সময় 'তিসরী কসম' চলচ্চিত্র তৈরি হয় সে সময়ে তার জন্ম, তাই নায়িকা ওয়াহিদার নামানুসারে তাঁর ছোট মেয়ের নাম রাখেন ওয়াহিদা।

রেণুর প্রথমা স্ত্রী পদ্মাদেবী ত্যাগ ও আদর্শের প্রতিমূর্তি, তাঁর জীবন-

নাটকের এক অখ্যাত পাত্রী পদ্মাদেবী। আমার মনে হয় ফণীশ্বরনাথ রেণুর আত্মা গ্রামে বাস করতো। সেখানকার প্রতিটি ধূলিকণাকে তিনি ভালবাসতেন। সেখানকার ভালবাসার মাটির প্রতিমা পদ্মাদেবীর কাছ থেকে যে সামগ্রী সংগ্রহ করতেন তা পাটনায় এনে লতিকাদেবীর সংস্পর্শে নন্দিত-পুষ্পিত করতেন। পদ্মাদেবী ত্যাগ-তপস্যার ঐ গোলাপ-চারার শিকড়টির মত ছিলেন, যিনি মাটির ভিতর থেকেও অদৃশ্যরূপে রেণুরূপ ঐ চারাগাছটির জন্য রস জুগিয়ে দিতেন। যার বুকে ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে চারিদিক গন্ধে-সৌরভে রাঙিয়ে মাতিয়ে তুলেছে। অর্থাৎ ফণীশ্বরনাথ রিণুআ-কে প্রসিদ্ধ হিন্দী ঔপন্যাসিক 'রেণু' হয়ে গড়ে তোলার জন্য তাঁর প্রথমা পত্নী পদ্মাদেবীর অবদান অনস্বীকার্য। পদ্মাদেবীর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী লতিকা দেবীর কাছ থেকে যা জানা গেছে; তা ছাড়া তাঁর কন্যা ওয়াহিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যা পেয়েছি তারই উপর ভিত্তি করে এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

পদ্মাদেবী গ্রামের এক অল্পশিক্ষিত নারী ছিলেন। তিনি স্বামীকে দেবতা রূপে পুজো করতেন। স্বামীর কোন কাজে তিনি কোনদিনই বাধা দেননি। স্বামীর সব কথাকে তিনি বেদবাক্যের মত মানতেন। এরকম স্ত্রীর জন্যই ফণীশ্বরনাথ গ্রামের সাংসারিক ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত ছিলেন। সংসারের সব কাজ পদ্মাদেবী একাই চালাতেন। শ্বশুর-শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর সংসারের সব দায়িত্ব পদ্মাদেবীর মাথায় এসে পড়েছিল। রেণু সবসময় রাজনীতি নিয়ে এখানে-ওখানে, গ্রামে-গঞ্জে-পূর্ণিয়ার একেক স্থানে ঘোরাফেরা করতেন—তখন পদ্মাদেবী অল্পবয়সেই পাকা গৃহিণীর মত হাসিমুখে সংসারের সব ভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভাবতেন তাঁর স্বামী অনেক বড়—তাঁর অনেক কাজ, তিনি দেশের অনেকের। তাঁকে সংসারের বেড়াজালে তুচ্ছ স্বার্থে বেঁধে রাখা পাপ, তাই তিনি কখনও কোন সাংসারিক ঝামেলায় ফেলে তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করেননি। এজন্যই 'ফণীশ্বর যখন পাটনার চাইনীজ হোটেলে চাইনীজ খাবার বা পানীয় গ্রহণ করতেন তখন তাঁর একবারও মনে আসতো না যে ধান, পাট কি দামে বিক্রি হবে? কোন জমিতে কি ফসল লাগানো হবে? কোন আত্মীয় বাড়ীতে বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে কি পাঠানো হবে। এসব কাজ পদ্মাদেবী একাই করতেন।'[৮৬] আর এসব কাজের জন্য পদ্মাদেবীর মনে কোন ক্ষোভ, অভিমান বা বিরক্তি কখনও কোন সময়ে প্রকাশ পায়নি। এমনকি পাটনায় লতিকাদেবীকে বিবাহ করার পরও তিনি রেণুর উপর কোন ক্ষোভ

প্রকাশ করেন নি। রেণুর প্রতি তাঁর ব্যবহারে একটুও পার্থক্য দেখা যায়নি। এদিক দিয়ে ফণীশ্বর প্রকৃত ভাগ্যবান ছিলেন।

রেণুর দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী লতিকা দেবী যিনি পাটনা মেডিকেল কলেজের স্টাফ নার্স ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রেণুর বিবাহ ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২তে হাজারীবাগের কুর্া মহল্লাতে হয়। বিবাহের দিন তাঁর শারীরিক অবস্থা এমন ছিল যার সম্বন্ধে লতিকাদেবীকে জিজ্ঞেস করায় তিনি নিজেই বলেছেন: 'শাদী কে দিন উনকী শারীরিক হালত-ইতনে কমজোর, কি শাদী কী তমাম রস্মে উন্‌হোনে দীবার সে টিক কর পূরী কী। ঠিক সে খড়ে ভী নহী হো সকতে থে।'[৮৭] [লতিকাদেবীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার]।

লতিকা দেবীর সঙ্গে ফণীশ্বরনাথের যে সময় বিবাহ হয় সে সময় তিনি কঠিন রাজ-যক্ষ্মা রোগে পীড়িত ছিলেন। অপরদিকে তিনি পেপ্‌টিক আলসারের পুরানো রোগী। রেণুর সঙ্গে বিবাহ করার জন্য লতিকা দেবীর দাদা যিনি তাঁর একমাত্র অভিভাবক ছিলেন, হাজারীবাগ থেকে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন এতবড় কঠিন রোগের রোগীর সঙ্গে বিবাহ না করতে। কিন্তু লতিকাদেবী ছিলেন সেবার প্রতিমূর্তি, তিনি জানতেন সে সময় রেণুকে চিকিৎসা না করলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। তাই রেণুর জন্য তিনি তাঁর সব স্বপ্ন-সাধ তিলাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে বিবাহ করলেন।

বিবাহের পর পাটনা সব্‌জীবাগে একটি ভাড়া ঘরে ফণীশ্বরনাথের সঙ্গে লতিকা দেবী নতুন সংসার পাতেন। পাটনা থেকেই কয়েক মাসের জন্য দুজনেই 'ঔরাহী হিঙ্গনা' গ্রামে যান। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে পাটনায় ফিরে এসে লতিকাদেবীকে নার্সের চাকরী ছেড়ে দেওয়ার জন্য জিদ করতে লাগলেন। লতিকাদেবী রেণুকে বোঝালেন, 'যতক্ষণ অর্থের অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা না হয় আমি কি করে চাকরী ছেড়ে দিই। তখন অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর রেণু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন: 'অব মেঁ লিখুঁগা। সাহিত্য লিখুঁগা। জীনে কে লিয়ে বিকল্প তো ঢুঁঢ়না হী হোগা, লেকিন মুঝে তুম্হারী য়হ নোকরী পসন্দ নহীঁ।'

আর সেদিন থেকেই সব্‌জীবাগ স্থিত ভাড়া বাড়ীতে 'মৈলা আঁচল' লিখতে শুরু করেন। লতিকা দেবী তাঁর স্বামী ফণীশ্বরনাথের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: 'আমাকে সুখী করার জন্যই তিনি সাহিত্য সাধনায় রত হলেন, ১৯৫২-এ বিবাহের কয়েক মাস পরেই সব্‌জীবাগের ভাড়া

বাড়ীতে 'মৈলা আঁচল' উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। এই উপন্যাসে ডাঃ প্রশান্তের কল্পনা তিনি ডাঃ প্রসূন ব্যানার্জী (ডাঃ টি. এন. ব্যানার্জীর পুত্র)—যিনি সে সময় 'হাউস সার্জন' রূপে পাটনা হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন তাঁরই ব্যক্তিত্ব, কথাবার্তা ইত্যাদিকে নিয়ে করেছেন। 'মমতা' রূপে আমাকে নিয়েছেন এবং 'কমলী' রূপে তাঁরই প্রথমা পত্নী পদ্মাকে নিয়েছেন। আর উপন্যাসটির সমগ্র পটভূমি তাঁরই গ্রামের অঞ্চল। এক বছরের মধ্যে যখন উপন্যাসটি লেখা শেষ হলো তখন প্রকাশক নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিল। নতুন লেখকের একেবারে নতুন রকমের উপন্যাসকে ছাপতে কোন প্রকাশকই রাজী হলেন না। সব প্রকাশকই উপন্যাসটি দেখে বললো ছাপলে একেবারে ডুবে যাবে।

সেই সময় রামেশ্বরবাবুর ইউনিয়ন প্রেস ছিল। তিনি রেণুর বিশেষ বন্ধু। রজী সাহেব এবং ফাতমী সাহেবও তাঁর বন্ধু ছিলেন। স্থির হলো নিজেই ছাপবেন। রামেশ্বরবাবু তাঁর প্রেসে ছাপাতে রাজী হলেন। শর্ত স্বরূপ সাতশত টাকার কাগজ রেণু প্রথমে দিলেন। আর ছাপানোর নয়শত টাকা বই বিক্রি করে পরে দেবেন বললেন। প্রকাশকের নাম রাখা হলো 'সমতা প্রকাশন'। এইভাবে 'মৈলা আঁচল' ছাপানো হলো।

ছাপানোর পর রামেশ্বরবাবু হঠাৎ বদলে গেলেন। তিনি এসে বললেন আগে টাকা দিন তারপর উপন্যাসগুলি নিয়ে যান। সময় কাটতে লাগলো। গোপনে উপন্যাসের কপিগুলি বিক্রি হচ্ছিল। এক সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে খুবই দুঃখিত হয়ে বললেন: "জানো লতিকা 'মৈলা আঁচল' বিক্রি হচ্ছে অথচ আমাকে একবার বললোও না। ঠিক আছে, আমি আবার অন্য উপন্যাস লিখবো।"

লতিকা দেবী যখন উপন্যাসগুলি নিয়ে আসার জন্য বোঝাতে লাগলেন তখন রেণু খুবই রেগে বললেন: 'টাকা আছে তোমার কাছে যে যা বাকী আছে নিয়ে আসবো; আগে নয়শত টাকার কথা হয়েছিল এখন দুই হাজার টাকা চায়।'

আমি এদিক-ওদিক থেকে টাকা জোগাড় করে 'মৈলা আঁচলে'র বাকী কপিগুলি—তার মধ্যে অনেকগুলিতে উইপোকা ধরে গিয়েছিল, বাণ্ডিল বেঁধে বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

পরে দিল্লীর রাজকমল প্রকাশনের মালিক ওমপ্রকাশ এই 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। এবং জনগণের সামনে 'মৈলা আঁচল' উপন্যাস

এসে উপস্থিত হয়। এরপর 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসটি দিল্লীর রাজকমল প্রকাশন-এর মালিক ওমপ্রকাশবাবুর আগ্রহে লেখেন। এর আরম্ভ পাটনাতে, কিছু অংশ এলাহাবাদে, বাকী অংশ বেনারসে। এই উপন্যাসটি লেখার সময়ে সমস্ত খরচ ওমপ্রকাশ বাবু বহন করেন। এই উপন্যাসটি লেখার পর তিন বছর পর্যন্ত পাটনার আকাশবাণীতে তিনি চাকরি করেন। 'রেডিয়ো'তে চাকরি ছাড়ার পর 'তিসরী কসম' কাহিনী হিন্দী চলচ্চিত্রের জন্য লেখেন। গল্পটি আগে লেখা হয়েছিল পরে তাতে সংলাপ যোজনা করেন। এই ফিল্মের নির্মাতা শৈলেন্দ্রবাবু মোট বিশ হাজার টাকা দেন। পনের হাজার গল্পের জন্য, পাঁচ হাজার চিত্রনাট্য লেখার জন্য। এর জন্য অনেকবার বোম্বাই যান, সেখানে বড় বড় হোটেলে থাকেন—যার সমস্ত খরচ শৈলেন্দ্রবাবুই বহন করেন।"[৮৮] মূল হিন্দীর অনুবাদ, 'রেণু' স্মৃতিচারণা নিজে তাঁর পত্নী লতিকাদেবী করেছেন" "এক সাক্ষাৎকার লতিকাদেবী ও আমি"।

'ফণীশ্বর স্বাধীনতা-উত্তর হিন্দী সাহিত্য জগতে ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের রূপকার। তিনি রাষ্ট্রীয়তা এবং আদর্শবাদের রোমান্টিক যুগেও ভারতমাতাকে 'সুজলাং, সুফলাং, শস্যশ্যামলাং' রূপে দেখেননি। তিনি শুনেছেন ভেঙে পড়া ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের বুকের কান্না, তুলে ধরেছেন ভেঙে পড়া গ্রামের সর্বহারা মানুষদের ভগ্ন হৃদয়ের ছবি।[৮৯] তাই 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসের আরম্ভে তিনি সুমিত্রানন্দন পন্থের 'ভারতমাতা গ্রামবাসিনী' কবিতার দুটি পংক্তির উল্লেখ করেছেন :

'খেতোঁ মেঁ ফৈলা হৈ শ্যামল
ধূল ভরা মৈলা-সা আঁচল'

প্রশ্ন উঠে যে রেণু স্বষ্ট এই 'মৈলা আঁচল' কি শুধুমাত্র পূর্ণিয়ারই ময়লা-অঞ্চল? সেখানকার রোগ প্রতিকারের জন্য ডাঃ প্রশান্ত অনুসন্ধান করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—এদের রোগের একমাত্র লক্ষণ—'গরীবী অউর জেহালত—ইস রোগ কে দো কীটাণু'। আর এই রোগের প্রতিকারের তাঁর কথা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে : 'দরার পড়ী দীবার। য়হ গিরেগী। ইসে গিরনে দো। য়হ সমাজ কব তক টিকা রহ সকেগা।'[৯০]

এটা শুধু পূর্ণিয়া অঞ্চলেরই নয়, এর সম্বন্ধ মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ—ভারতের সমস্ত অঞ্চল জুড়েই। ভারত আজও গ্রামেরই মহাদেশ। এই পূর্ণিয়া অঞ্চলেই তাঁর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ঘৃণা-প্রেম ইত্যাদি

পরিস্ফুট হয়েছে তাই নয়, তাঁর সমস্ত সাহিত্যকৃতির মধ্যে এই পূর্ণিয়া অঞ্চলের ধূসর-পতিত জমির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল থেকে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চলে আসছে তাতে নিপীড়িত-নির্যাতিত লক্ষ-লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ, অভাব-অভিযোগের বস্তুনিষ্ঠ ছবি তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর সৃষ্ট 'মৈলা আঁচল', 'পরতী পরিকথা', 'জুলুস', 'কিতনে চৌরাহে' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে রেণু আমাদের গ্রামবাসিনী ভারতমাতার দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাসই বর্ণনা করেছেন। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তারই স্বপ্ন এবং সংকল্পকে গভীর সমবেদনার সঙ্গে, গভীর আন্তরিকতায় উদ্ঘাটিত করেছেন।

বাংলা ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী ও হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর সাহিত্যের পটভূমি গ্রামীণ বিহার। উভয়েই পূর্ণিয়ার লোক। সতীনাথের পূর্ণিয়া সম্পর্কে যেমন গর্ববোধ ছিল তেমনি অনুরাগও। তাই পূর্ণিয়াই ছিল তাঁর বেশীর ভাগ রচনার ইতিহাস ও ভূগোল। চরিত্র, পরিবেশ, সংস্কৃতি সবই এই পূর্ণিয়াকে ঘিরে।[১১]

সতীনাথের রচনায় পূর্ণিয়া জেলার গ্রামজীবন—মানুষ ও নিসর্গপ্রকৃতি বাণীরূপ পেয়েছে। পূর্ণিয়ার প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালবেসেছিলেন সতীনাথ।[১২] রেণু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'ওঁর বই-এর চরিত্রদের দেখছি, ওঁর কথার মুহূর্তগুলোর সাক্ষী থেকেছি—একসঙ্গে অনেক দুঃখ ও সুখ পেয়েছি ওঁর সঙ্গে। সারা জেলার গ্রামে গ্রামে কোন্ কোন্ চরিত্র ছড়িয়ে আছে জানি।'[১৩]

সতীনাথ পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চল ও গ্রামের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন। তাঁর প্রধান কীর্তি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। 'পূর্ণিয়ার গ্রামের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে রচিত।

হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুও পূর্ণিয়া জেলার অধিবাসী। পূর্ণিয়া জেলার যে অঞ্চলে তিনি বসবাস করতেন তার সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, জীবন-ধারার সঙ্গে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। সেখানকার সামাজিক ব্যবস্থায় তিনি নিজেই একজন সদস্য। সামাজিক ব্যবস্থার ওপর রাজনীতি যে প্রভাব বিস্তার করে তা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। স্মরণীয় যে তিনি শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, সক্রিয় রাজনীতিবিদও ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর রাজনৈতিক সত্তা তাঁর লেখক সত্তাকে প্রভাবিত করেছেন। ফলে 'মৈলা আঁচল'

ও 'পরতী পরিকথা' ইত্যাদি উপন্যাসের জন্য তিনি যে কাহিনী রচনা করেছেন তা নির্দিষ্ট সত্যে পৌঁছে দেয়। রেণু ছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ীর শিষ্য। জেলে সতীনাথের জীবনচর্যা ফণীশ্বরনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় :

'জেলে আসবার আগেই শুনেছিলাম—মানুষের আসল চেহারা জেলের ভিতরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। মুখোস খোলা আসল মানুষ। বাইরে থাকতে গলা ফাটিয়ে যাদের 'জয় জয়কার' করতাম তাঁদের সঙ্গে জেলে মাত্র কয়দিন থেকেই মনের আসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের প্রতিমাগুলো নিজেই ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, অনেক শ্রদ্ধেয় 'মূর্তি'কে নিজের হাতে ভাঙতেও হয়েছিল। ভাদুড়ীজীর সঙ্গে ওই তিন বছর থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বলে জীবন সংগ্রামের আঘাত আমি কোনদিন ভেঙে চুরমার হয়ে যাইনি।'[১৪]

সতীনাথ শুধু সচেতন শিল্পী ছিলেন না তাঁর শিল্পীকে চেনার, ক্ষমতাও ছিল। অনুজসদৃশ ফণীশ্বরনাথকে তিনি বলেছিলেন : 'এবার লেখার কাজ আরম্ভ করো। যা দেখেছ যথেষ্ট। লেগে পড়ো।' সতীনাথের এই উপদেশেরই ফসল ফলেছে ফণীশ্বরনাথের 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে। পূর্ণিয়া জেলার একেবারে অনুন্নত অঞ্চলের নীচুতলার মানুষদের জীবন-চরিত্র গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটির নামকরণ 'মৈলা আঁচল'-ই সঙ্কেত করে যে সে ক্ষেত্র অত্যন্ত অনুন্নত; শুধু তাই নয়, তা অগম্য ও নিষিদ্ধ এলাকা। সে স্থানের উন্নতি ও বিকাশের জন্য সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থারও যে পরিবর্তন প্রয়োজন 'মৈলা আঁচল' তারই ইঙ্গিত।

রেণুর 'পরতী-পরিকথা'ও পূর্ণিয়া জেলার একটি অনুন্নত গ্রাম। সেখানে কুশীর বিধ্বংসী লীলা নিজের প্রবলতম অবস্থাতে উপস্থিত হতো। এ অঞ্চলও 'মৈলা আঁচলে'র মেরীগঞ্জের মতোই পতিত, অগম্য ও নিষিদ্ধ এলাকা।

সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র জিরানিয়া, ফণীশ্বরনাথের 'মেরীগঞ্জ' ও 'পরনেপুর' হল পূর্ণিয়া—সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথের নিজের জেলা। এই জেলার শহর ও গ্রামের সব কিছুর সঙ্গে উভয়ের পরিচয় ছিল নিবিড় ও ব্যাপক।

চালচিত্র যেমন প্রতিমার মূল আধার, তেমনি সামাজিক পটভূমি কথা-সাহিত্যের প্রধান বিচরণক্ষেত্র। সাহিত্য জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। জীবন স্থাবর নয়, জঙ্গম। চলমান যুগের চিত্রই সাহিত্যের বুকে আঁকা হয়। যুগের

পরিবর্তনে সমাজজীবনের পরিবর্তন দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যেমন সতীনাথ ভাদুড়ী, হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যেও ফণীশ্বরনাথ রেণুর মতো শক্তিমান উপন্যাসিক খুবই কম। উভয়েই উত্তর বিহারের এক খণ্ড অঞ্চলকে উপন্যাসের ঘটনাভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন—সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক কোনো ক্ষেত্রেই ভাদুড়ীজী বা রেণু ঐ খণ্ড অঞ্চলের সীমারেখা অতিক্রম করেননি। সতীনাথের সাহিত্যচর্চার কাল (১৯৪৫—৬৫) বিশ বছর। পক্ষান্তরে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরের উপন্যাস রচনার কাল (১৯৫৪—১৯৬৭)। অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সতীনাথকে যৌবনে (১৯৩৯) আকর্ষণ করেছিল তার সঙ্গে ফণীশ্বরের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমাদের চেনা কালের বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর, মানিক ও সমরেশ বসু যত ঘনিষ্ঠভাবে দেশ ও মানুষকে জেনেছেন সতীনাথ ও ফণীশ্বর ততটাই ঘনিষ্ঠভাবে দেশ ও মানুষকে জেনেছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী ও হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বর মূলত অন্তর্মুখী লেখক হলেও পারিপার্শ্বিক দেশ-কাল সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। রেণুর 'মৈলা আঁচল', 'পরতী পরিকথা' ভাদুড়ীজীর 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ভারতীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

১। 'ভাদুড়ীজী' : ফণীশ্বরনাথ রেণু (বনতুলসী কী গন্ধ) পৃ. ১১৭।
২। 'সতীনাথ ভাদুড়ী—জীবন যাপন' : সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য।
৩। সুবল গঙ্গোপাধ্যায় 'ইতিকথা' এবং তৎ সম্পাদিত 'সতীনাথ স্মরণে' : ভারতী ভবন (পাটনা), নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১-২
৪। ঐ ভাদুড়ীজী—ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ. -২১।
৫। দ্রষ্টব্য, ২নং পাদটীকার গ্রন্থ।
৬। দ্রষ্টব্য, ৩নং পাদটীকার গ্রন্থ পৃ. ১-২।
৭। ঐ
৮। ঐ পৃ. ৫।

৯। 'সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী' : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৫।

১০। 'ইতিকথা', সতীনাথ স্মরণে গ্রন্থে সুবল গাঙ্গুলী এই চিঠিটি মুদ্রিত করেছেন।

১১। সত্যি ভ্রমণ কাহিনী : সতীনাথ ভাদুড়ী, পৃ. ১।

১২। ঐ ঐ পৃ. ২।

১৩। দ্রষ্টব্য, ৩নং পাদটীকার গ্রন্থ।

১৪। দ্রষ্টব্য, ২নং পাদটীকার গ্রন্থ।

১৫। 'সতীনাথ ভাদুড়ী, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়' : ড মৈত্রেয়ী ঘোষ, পৃ. ৪৩।

১৬। ভাদুড়ীজী : সতীনাথ স্মরণে : ফণীশ্বরনাথ রেণু।

১৭। 'ইতিকথা' সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৫।

১৮। ভাদুড়ীজী—ফণীশ্বরনাথ রেণু (বনতুলসী কী গন্ধ), পৃ. ১১৮।

১৯। শ্রীমতী রেণুকা ভাদুড়ীর সাক্ষ্য : সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড ভূমিকা, পৃ. ৪।

২০। 'ইতিকথা'—সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৩।

২১। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' : সতীনাথ ভাদুড়ী, পৃ. ৩-৪।

২২। 'ইতিকথা'—সুবল গঙ্গোপাধ্যায় পৃ. ৭।

২৩। 'সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্য' : ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৮।

২৪। সতীনাথ স্মরণে, পৃ. ৬১

২৫। 'সতীনাথ ভাদুড়ী—আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়' : ড. মৈত্রেয়ী ঘোষ, পৃ. ৩৯।

২৬। 'সকল কাজে সেরা'—ডাঃ বীরেন ভট্টাচার্য, পৃ. ৬২।

২৭। 'ইতিকথা'—সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৮।

২৮। 'সকল কাজে সেরা'—ডাঃ বীরেন ভট্টাচার্য, পৃ. ৬২।

২৯। 'ইতিকথা'—সতীনাথ স্মরণে 'দাদামশাই-এর ডায়রী', পৃ. ৮।

৩০। An Advance History of India : p. 986.

৩১। Freedom Movement in Bihar, Vol III, p. 67-89, 130-36.

৩২। 'ইতিকথা'—সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৯।

৩৩। বীরেন ভট্টাচার্যের কথা—সতীনাথ গ্রন্থাবলী—৪-এ উদ্ধৃত প্র. উ.।

৩৪। 'ইতিকথা'—সুবল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৫। ফণীশ্বরনাথ রেণুর ভাদুড়ীজী—

৩৬। " "

৩৭। " "

৩৮। 'ভাদুড়ীজী'—ফণীশ্বরনাথ রেণু

৩৯। শ্রদ্ধাস্পদ সতীনাথ ভাদুড়ী—বনফুল, দেশ।

৪০। ফণীশ্বরনাথ রেণু, কৃত্তিবাস, ১৩৮১ অগ্রহায়ণ।

৪১। 'জাগরী'—সতীনাথ ভাদুড়ী।

৪২। ভাদুড়ীজী—স. স্ম., পৃ. ৩২।

৪৩। " " "

৪৪। ফণী—স্মৃতিচারণা।

৪৫। ইতিকথা—স. স্ম, পৃ ১০।

৪৬। ভাদুড়ীজী—ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ ৩৪।

৪৭। ইতিকথা—সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৯।

৪৮। ভাদুড়ীজী—বনতুলসী কী গন্ধ।

৪৯। 'সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্য' : ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৯।

৫০। সত্যি ভ্রমণ কাহিনী—সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড।

৫১। 'সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা': গোপাল হালদার, পৃ. ২৫-২৬।

৫২। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'—সতীনাথ গ্রন্থাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৬-৯৭।

৫৩। সতীনাথ স্মরণে—ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ২৮-৩৪।

৫৪। 'সতীনাথ ভাদুড়ী—যেমন ভেবেছি'—বিমল কর, 'দেশ', ১০ই এপ্রিল ১৯৬৫।

৫৫। বীরেন ভট্টাচার্য 'সকল কাজে সেরা', সতীনাথ স্মরণে, পৃ. ৬০-৬১।

'একটি স্মরণ' সতীনাথ স্মরণে, নারায়ণপ্রসাদ ভার্মা, পৃ. ৭৬।

৫৬। ...য়ণপ্রসাদ ভার্মার হিন্দী জাগরী (ভূমিকা) : বিহার সাহিত্য

৫৭। ...—১৯৪৮।

...ল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৮।

৫৮। ... রেণু, পৃ. ১১।

৫৯। বনতুলসী কী গন্ধ— ফণীশ্বরনাথ .

৬০। ফণীশ্বরনাথ রেণু—কুছ স্মৃতি চিত্র—ডাঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ—রেণু স্মরণ ঔর শ্রদ্ধাঞ্জলি, পৃ. ৩৭।

৬১। ঐ পৃ ৩৭।

৬২। সুবল গাঙ্গুলী—ইতিকথা, পৃ. ২২।

৬৩। বিমলচন্দ্র সিংহ—পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী ১৩৬২)।

৬৪। ফণীশ্বরনাথ রেণু—বনতুলসী কী গন্ধ, পৃ. ১১৩।

৬৫। রেণু স্মরণ ঔর শ্রদ্ধাঞ্জলি—ফণীশ্বরনাথ রেণু—নাগার্জুন, পৃ. ১৯।

৬৬। ফণীশ্বরনাথ রেণুর এই স্মৃতিচিত্র তাঁরই হাতের লেখায় শ্রীসত্যদেব নারায়ণ সিন্‌হা, সিমলা মুরাপুর পাটনাতে এখনও সুরক্ষিত আছে।

৬৭। ভাদুড়ীজী—'বনতুলসী কী গন্ধ' ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ১২০।

৬৮। রেণু অউর মৈঁ—বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কোইরালা।

৬৯। রেণু: জীবন্ত স্মৃতিয়োঁ কে কুছ অধুরে শিলালেখ—সুরেশ শর্মা।

৭০। রেণু—স্মরণ অউর শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

৭১। পদ্মাজী—রেণু রঙ্গমঞ্চ কী অচর্চিত যাত্রা—নবনীত শর্মা, পৃ. ১৭৬।

৭২। রেণু ঔর বিহার আন্দোলন—ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ শ্রী বাস্তব, পৃ. ৯৩।

৭৩। ঐ

৭৪। রেণু স্মরণ ওর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

৭৫। ইণ্ডিয়ান নেশন—৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২।

৭৬। দিনমান—বিহারমে হিন্দী সাহিত্যিক কে অনশন—অক্টোবর ১৯৭৯।

৭৭। ধর্মযুগ—বিহার মে বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক আন্দোলন মে ১৯৭৪।

৭৮। দিনমান—জুলাহি, ১৯৭৪।

৭৯। 'রেণু স্মরণ ওর শ্রদ্ধাঞ্জলি' রেণু ওর বিহার আন্দোলন, পৃ. ১০২

৮০। শ্রুত অশ্রুত পর্ব।

৮১। রেণু স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি, পৃ. ১০২।

৮২। ক্রান্তিধর্মী ফণীশ্বরনাথ রেণু—রূপচন্দ্র ঠিঙ্গড়া, পৃ. ১৪৭।

৮৩। ঐ পৃ.১৪৯।

৮৪। 'পদ্মাজী: রেণু রঙ্গমঞ্চ কী অচর্চিত যাত্রা': নবনীত শর্মা, পৃ. ১৭৬-৭৭।

৮৫। লতিকা দেবীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার।

৮৬। অব য়হ মরীজ কভী দরওয়াজা খটখটানে নহী আয়েগা : লতিকা রেণু, 'রেণু স্মরণ ওর শ্রদ্ধাঞ্জলি', পৃ. ১৪৯।

৮৭। উপন্যাসকার ফণীশ্বরনাথ রেণু : ডাঃ বিজেন্দ্রনারায়ণ সিং।

৮৮। মৈলা আঁচল : ফণীশ্বরনাথ রেণু।

৯১। সুধাংশুকুমার চক্রবর্তী—'সতীনাথের সাহিত্যে পূর্ণিয়া'।

৯২। বীরেন ভট্টাচার্য, 'সকল কাজে সেরা' সতীনাথ স্মরণে', পৃ. ৬৪

৯৩। ফণীশ্বরনাথ রেণু—'ভাদুড়ীজী' পৃ. ৩৮

৯৪। ঐ



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৃষ্টি

বাংলা ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯৪৫-৬৫) বিশ বছরে ছয়খানি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৫) উপন্যাসটি সতীনাথ ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে (১৯৪২-৪৪) লিখেছিলেন, দ্বিতীয় উপন্যাস, 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (১৯৪৯)। এই উপন্যাসটি 'মাতৃভূমি' মাসিকপত্রে (ভাদ্র ১৩৫৫ থেকে কয়েকটি সংখ্যায়) ধারাবাহিকভাবে আংশিক প্রকাশের পর মাসিক বসুমতীতে পাঁচটি সংখ্যায় (মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৫৫, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬) পুরোটা প্রকাশিত হয় 'মীনাকুমারী' নামে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ফিরে আসে পুরানো নামে—'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (ভাদ্র ১৩৫৬)। সাত বছর পরে দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩) এরপর সতীনাথ ভাদুড়ী গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ডে তৃতীয়বার মুদ্রিত হয় (মাঘ ১৩৭৯, জানুয়ারী ১৯৭৩) এই উপন্যাসটি পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় পূর্ববর্তী 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের প্রবল আকর্ষণে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর তৃতীয় উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। এই উপন্যাসটি 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসের চারমাস আগে ছাপা হলেও আমার মনে হয় এটাই সতীনাথ ভাদুড়ীর তৃতীয় উপন্যাস। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আগস্ট ১৯৪৯ অর্থাৎ (১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে)। এক বছর আগে তা 'মাতৃভূমি' মাসিক পত্রে (১৯৮৪) কিছুটা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। 'ঢোঁড়াইচরিত মানসের' প্রথম চরণ ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয় ১৩৫৫-এর ১৫ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ২৬ ভাদ্র পর্যন্ত সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে প্রথম চরণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৬-এর বৈশাখে (এপ্রিল ১৯৪৯)। দ্বিতীয় চরণ 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০ ভাদ্র সংখ্যায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (জুন ১৯৫১)। এদিক থেকে বিচার করলে সম্পূর্ণ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯-৫১) সতীনাথের তৃতীয় উপন্যাস।

এরপর 'অচিন রাগিনী' (১৯৫৪) 'সংকট' (১৯৫৭) আর 'দিগ্‌ভ্রান্ত'

(১৯৬৬) এই উপন্যাসত্রয়ী সতীনাথ ভাদুড়ীর শিল্পপ্রয়াসকে এক সম্পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে।

"এই তিনটি (শেষ) উপন্যাসের নাম তাৎপর্যপূর্ণ সংকেতময়। আমাদের পরিচিত জীবনের নিটোল কাহিনী বয়নে তাঁর আগ্রহ নেই। যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে আরো বেশি কিছুর আভাস আছে লেখার মধ্যেই। চেতনালোক থেকে অবচেতনলোকে চরিত্রের নিঃসঙ্গ যাত্রা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিষাদে আক্রান্ত চরিত্রের কনফেশন, আত্মসংলাপ, চিন্তার আপাত খাপছাড়া অনুষঙ্গ ও স্বেচ্ছা-বিহারের আড়ালে সংলগ্ন আত্মকথন, আপাত শিথিল-গ্রথিত মুহূর্তের সমাহারে এক অখণ্ড জীবনবোধ, ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে অপর ব্যক্তি ও সমাজের অদৃশ্য সংগ্রাম, জীবনের অসমঞ্জস্য ও অসঙ্গতির মধ্যে নতুন অর্থান্বেষণ, বাইরের সমাজ ও ঘটনার গুরুত্ব অস্বীকার, আধুনিক জীবনের রোগ নির্ণয় ও বিশ্লেষণে, মনোগহনের জটিল আঁধারে সন্ধানী আলো নিক্ষেপ, সময় ও স্মৃতির সমবায়ে গঠিত এই নতুন শিল্পজগৎ সতীনাথের শেষ উপন্যাসত্রয়ীতে রূপ পেয়েছে।"[১]

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'তে যে হৃদয়াবেগ উপন্যাসের পরিশেষে চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়, তাকে লেখক হয়ত প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে (১৯৪৯)। তার জায়গায় তুলেছিলেন পাথর ঘেরা বুদ্ধির দেওয়াল। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে লেখক এই মানসিকতাকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের নিঃসঙ্গতার বেদনায় সেই দেওয়াল শিথিল হয়ে পড়েছে।২। আর 'অচিন রাগিনী' উপন্যাসে 'অজান্তে চোখের পাতা ভিজিয়ে' তোলার আয়োজন সম্পূর্ণ ও সফল, আর 'সংকট' উপন্যাসে হৃদয়বত্তার প্রাধান্য বিনষ্ট হয়েছে মননের প্রাধান্যে। ঠিক সেইরূপ 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে 'মানব মনের, মানব সম্পর্কের জালে অন্তর্লোকের রহস্য উন্মোচন করেছেন।'[২]

'ঢোঁড়াইয়ের নিঃসঙ্গতা সঞ্চারিত হয়েছে সতীনাথের 'অচিন রাগিনী', 'সংকট' ও 'দিগ্‌ভ্রান্ত' এই তিন উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে। কাহিনীতে হৃদয়বত্তা ও পরিবেশের প্রাধান্যকে ছাপিয়ে উঠেছে মানব হৃদয়ের জটিল রহস্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য মনন-প্রধান পদ্ধতিকে আশ্রয় করে সতীনাথ যেতে চেয়েছেন মানবসম্পর্কের আলো-আঁধারি প্রদেশে, খুঁজতে চেয়েছেন মানবমনের গভীরে লুকানো কথাকে, উন্মোচিত করতে চেয়েছেন মানবমনের জটিলতাকে।

হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর প্রথম উপন্যাস 'মৈলা আঁচল' প্রকাশিত হয় সমতা প্রকাশন, পাটনা থেকে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে। 'মৈলা আঁচল' হিন্দী উপন্যাস-সাহিত্যে প্রথম শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে স্বীকৃতিলাভ করে। ফণীশ্বরও হিন্দী সাহিত্যের জগতে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পরতী পরিকথা' দিল্লীর রাজকমল প্রকাশন থেকে ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় উপন্যাসেও তিনি প্রশংসা পান এবং হিন্দী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

ফণীশ্বরের তৃতীয় উপন্যাস 'দীর্ঘতপা' ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে বিহার গ্রন্থ কুটীর, পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়। পরে এই উপন্যাসটি ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে হিন্দী পকেট বুক দিল্লী থেকে 'কলঙ্কমুক্তি' নামে কিছুটা পরিমার্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই 'দীর্ঘতপা' উপন্যাসটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

"য়হ উপন্যাস…নঁহী, আঞ্চলিক নঁহী হাঁ, আঞ্চলিক হী…কিন্তু…অর্থাৎ য়হ উপন্যাস, উপন্যাস হে। য়হ উপন্যাস ৩০ সিতম্বর ১৯৬৮ কো পুরা হো চুকা থা। তব সোচা গয়া থা কি বর্ষো সে দিন রাত সির পর সওয়ার হোকর পাঁচ (প্রেতনিয়োঁ ?) দেবিয়োঁ কো অলগ অলগ রূপায়িত করকে এক অলবম-পুরা উপন্যাস সংক্ষিপ্ত বক্তব্যো (কমেন্টরী) সে গুঁথ গুঁথ কর 'পঞ্চকন্যা' নামসে প্রস্তুত কিয়া জায়ে। অস্তুতঃ য়হ যোজনা অনেকানেক কারণো সে সফল নঁহী হো সকী। অব ইন্‌হে অলগ অলগ হী পেশ করনে কে ক্রম মে য়হ পহলী দীর্ঘতপা নারী। (হাঁ. চার ঔর হেঁ আ রহী হেঁ, এক এক কর।)"।

এরপর ফণীশ্বরের সুবিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'জুলুস' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন দিল্লী থেকে। এই উপন্যাসটির সম্পর্কে লেখকের কিছু বক্তব্য আছে। ফণীশ্বর 'জুলুস' সম্পর্কে লিখেছেন :

'পিছলে কুছ বর্ষো সে মৈঁ এক অদ্ভুত ভ্রম মে পড়া হুয়া হুঁ। দিনরাত সোতে-বৈঠতে, খাতে-পীতে মুঝে লগতা হৈ কি মৈঁ এক বিশাল জুলুস কে সাথ চল রহা হুঁ অবিরাম।

য়হ জুলুস কহাঁ জা রহা হৈ, য়ে লোক কৌন হৈ, কহাঁ জা রহে হৈঁ, ক্যা চাহতে হৈঁ, মৈ নঁহী জানতা, ইস মহা কোলাহল মেঁ অপনে মুঁহসে নিকালা হুয়া নারা মুঝে সুনাই নহী পড়তা। চারোঁ ওর এক ববণ্ডর উঠরা রহা হৈ, ধূল কা……।

'ইস ভীড় সে নিকল রাজপথ কে কিনারে সুসজ্জিত 'ব্যালকোনী' মেঁ খড়া হোকর জুলুস কো দেখনে কী চেষ্টা কী হৈ, কিন্তু ইস ভীড় সে অলগ হোনে কী সামর্থ্য মুঝমেঁ নঁহী। ইস জুলুস মেঁ চলনে বালে নর-নারিয়োঁ। সে অপনে আস-পাস কে লোগোঁ সে পরিচয় নঁহী। লেকিন উনকী মায়া-মমতা সে মৈঁ ছিটকর অলগ নঁহী হো সকতা।" এর মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের কথা লেখক ব্যক্ত করেছেন।

রেণুর পঞ্চম উপন্যাস 'কিতনে চৌরাহে'—১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে অনুপম প্রকাশন পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত ফণীশ্বর 'আদিম-রাত্রি কী মহক' (১৯৬৭) এবং 'অগিন খোর' (১৯৭৩) ইত্যাদি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। 'নেপালী ক্রান্তিকথা' (১৯৭৭) এবং 'ঋণ জল ধন জল' (১৯৭৭) ইত্যাদি রিপোর্টাজ কাহিনী প্রকাশিত হয়। আর কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর দু-বছর পর শেষ উপন্যাস 'পল্টু বাবু রোড' অনুপম প্রকাশন পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়। (ফণীশ্বরের 'পল্টু বাবু রোড' উপন্যাসটি প্রথমে জ্যোৎস্না পত্রিকা পাটনা থেকে ধারাবাহিক-ভাবে তাঁর জীবিত অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে তাঁর জীবিত অবস্থাতে প্রকাশিত না হওয়ার কারণ কি এ সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন মনে জাগে। কারণ এই 'পল্টু বাবু রোড' উপন্যাসের পরের রচনা 'দীর্ঘতপা' ও 'কিতনে চৌরাহে' তাঁর জীবিত অবস্থাতেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু 'পল্টু বাবু রোড' কেন অবাঞ্ছিত অবস্থায়, বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল এর কারণ জানার জন্য আমি 'জ্যোৎস্না' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে এর কারণ জানতে চাই। তিনি এ সম্পর্কে বলেন :

'রেণুজী অপনে সে হী ইস উপন্যাস কে প্রকাশন কো স্থগিত কর দিয়ে থে। মৈনে ভী খুদ রেণুজী কো ইসকে কারণ পুছে থে। উন্‌হোনে বতায়া কি এক পরিচিত সজ্জন নে:অনুরোধ কিয়া হৈ কি ইসে মৈ প্রকাশিত ন করুঁ। ক্যোঁ কি ইসকী কহানী উনকে পরিবার সে মিলতী হৈ। রেণুজী নে উন সজ্জন কে কহনে পর অনুভব কিয়া কি সচমুচ ইসকী কহানী অনজানে হী অ্যাইসে হী হো গয়ী হৈ। ইসী কারণ অপনে জীবন কাল মে ইসকা প্রকাশন উন্‌হোনে স্থগিত রখা।'

সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ উভয়েই ছিলেন পূর্ণিয়া জেলার অধিবাসী। উভয়েই পূর্ণিয়া জেলার জনজীবনের পটভূমিতেই উপন্যাস রচনা করেছেন।

উভয়ের উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র, আঞ্চলিকতা মিল ও অমিল সম্পর্কে এর পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১। ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ স্মরণে, পৃ. ১০৮।

২। সতীনাথ ভাদুড়ী : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায় : মৈত্রেয়ী ঘোষ, পৃ. ১৯৮।

৩। দীর্ঘতপা—ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ১০-১২।

৪। ফণীশ্বরনাথ রেণু স্মরণ ঔর শ্রদ্ধাঞ্জলিয়াঁ, পৃ. ২৮৬।

৫। হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস—রামচন্দ্র শুক্ল।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিল ও অমিল

দুজন ভিন্নভাষার লেখকের সাহিত্য সমগ্রভাবে বিচার করতে হলে তাঁদের রচনাবলীর শ্রেণীবিন্যাস করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বরনাথ রেণু দুজনে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ হলেও উভয়ে একই অঞ্চলের (বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চল) অধিবাসী এবং উভয়ের উপন্যাসের প্রেক্ষাপটই বিহারের কোন শহর কিংবা গ্রাম। দ্বিতীয়ত হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বরের সঙ্গে বাংলা ঔপন্যাসিক সতীনাথের একটা বিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। দুজনেই রাজবন্দীরূপে দীর্ঘদিন একই জেলে একই সেলে বসবাস করেছেন।

সতীনাথের প্রকৃত সাহিত্যজীবন শুরু হয় ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হওয়ার প্রাক্‌লগ্নে। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই তিনি অনেকটা আকস্মিকভাবেই কংগ্রেসী রাজনীতি পরিত্যাগ করেন। এরপর দীর্ঘকাল তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যসাধনা করেন। সতীনাথের সাহিত্য-বাসরে আবির্ভাব অনেক পরিণত বয়সে। তিনি নিজেকে লেখক অপেক্ষা পাঠকই মনে করতেন বেশী। অনুরূপভাবে ফণীশ্বরও ১৯৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দে রাজনীতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে সাহিত্য-সাধনা করেন। তবে ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অনেক পার্টি তাঁকে টিকিট দিতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। তাঁর সাহিত্যিক গুরু সতীনাথের মত লাভ ও লোভের রাজনীতিকে তিনি ঘৃণা করতেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীই ফণীশ্বরের সাহিত্যগুরু ছিলেন। রেণু তাঁর ব্যক্তিত্বে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। জেলে থাকাকালীন ভাদুড়ী মশায়ের কাছ থেকে তিনি বিশেষ প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং তাঁরই পরামর্শে রেণু উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন।[১]

সতীনাথ ভাদুড়ী যে সময় পূর্ণিয়া জেলা কোর্টে ওকালতি করতেন সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ১৯৩১-এ বন্ধু বিভুবিলাস ভৌমিককে তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যার বিবরণ জানাতে গিয়ে

লিখেছেন : '৯টা থেকে বারোটা কেদার বাঁড়ুয্যে সাহিত্যিকের বাড়ীর আড্ডা।'[২] কেদারনাথের বাড়িতেই কলকাতার বহু সাহিত্যপত্র ও সাময়িক পত্র নিত্য পাঠ করতেন সতীনাথ, কেদারনাথের সঙ্গে সমকালীন বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন। সতীনাথের ডায়েরি ও প্রবন্ধে বাংলা কথাসাহিত্যের মাত্র দু-একজনের নাম পাওয়া যায়, এছাড়া পাশ্চাত্য, বিশেষ করে ফরাসী কথা-সাহিত্যের আলোচনাই বেশী। বাংলা কথাসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ডায়েরীতে তিনি লিখেছেন :

"আমি একজন সাধারণ পাঠক। হৃদয় দিয়ে না নিতে পারলে তৃপ্তি পাই না। শরৎচন্দ্রই বোধ হয় আমার এই রুচিবিকারের মূলে। দুঃখের কাহিনী পড়বার সময় আমি চাই যে চোখের পাতা অজান্তে ভিজে উঠুক।"[৩]

"বলাইদা সম্পর্কে আমার বেশির ভাগ ধারণাই তাঁর লেখা পড়ে। কেদার-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির আড্ডায়, বলাইদার সম্বন্ধে একদিন আলোচনা করছিলাম আমরা। তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন দুটি কথায়—'খুব forceful'—শুনে মনে হয়েছিল কথাটি অসমাপ্ত থেকে গেল। গড়গড়ার টান কথাটাকে শেষ করতে দেয়নি। আর একদিনও 'বনফুল' প্রসঙ্গে গল্পের মধ্যে 'খুব forceful' বলেই থেমে গিয়েছিলেন। এর পরের শব্দটা যেন খুঁজে পেলেন না। এদিন কিন্তু গড়গড়ার নল হাতে ছিল না। লেখা না চরিত্র, কী সম্বন্ধে বলতে চাচ্ছিলেন জানি না। তবে forceful ঠিকই। বলিষ্ঠ লেখনী, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, বলিষ্ঠ চরিত্র বনফুলের।

'গল্প কী করে জমাতে হয় তা তিনি জানেন। স্বাভাবিক মানুষগুলো অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে অপ্রত্যাশিত আচরণ করে। ঘটনার স্রোতে মানুষ-গুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারা বিবেকের চাবুক খায়; ভিতরে তাকিয়ে নিজের বাইরের মুখোশ খুলে ফেলতে চায়; পথ খোঁজে। কেউ ঘাটে পৌছয় কেউ বা আঘাটায়। স্রোত কিন্তু বয়ে যায় দুর্বার গতিতে। কুতূহলী পক্ষপাত-হীন দৃষ্টিতে দূর থেকে দেখেন 'বনফুল'। সবটুকুকে একসঙ্গে দেখেন না। নাটকের দৃশ্যের মত ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে দেখেন। বৈজ্ঞানিক বাইনাকুলার দিয়ে যেন পাখি দেখছেন। এক এক সময় এক সীমাবদ্ধ বৃত্তের উপর তাঁর নজর। এই কাটা কাটা ভাবটাই তাঁর পছন্দ।

সৃষ্টির এই প্রাচুর্যই তাঁর শক্তি ও দুর্বলতা। আমরা পাঠক; ভোক্তা হিসাবে প্রাচুর্যে খুশী। প্রাচুর্যের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী অপচয়টুকু আমাদের স্বার্থে

আঘাত করে না। বরং পরিবেশনে কার্পণ্য দেখলেই আমরা ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু তিনি তো আমার কাছে শুধু লেখক বনফুল নন; তিনি যে আবার আমার বলাইদাও। সেই হয়েছে মুশকিল। সৃষ্টির প্রাচুর্যের জন্য লেখার রস ফিকে হতে দেখলে ব্যথা পাই।"[৪]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সতীনাথ বনফুলের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে যে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন সেরকম আর কোনো বাঙালি কথাসাহিত্যিক সম্পর্কে করেননি। সতীনাথ তাঁর ডায়েরিতে বাংলা কথাসাহিত্য সম্পর্কে আরো লিখেছেন যে:

"এই শ্রেণীর (বিশেষ significant মুহূর্তের যোগফল) বইয়ের মধ্যে অস্পষ্ট অভিনব অতীন্দ্রিয় স্বাদের বাঁধন background-এ থাকলে—extra sensory perception-এর বাঁধন—tradition, মনের স্বপ্নলোক, অজ্ঞাত জগতের স্বাদ ইত্যাদি একটা মাকড়সার জালের মতো মিহি সুতোয় গাঁথা উপন্যাসের সম্মোহ, আকর্ষণ irresistible, এমনি একখানি বই (MAS THEOTIME)-এর স্বাদের ধরণ বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র। তবে 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র স্বাদ খুব ফিকে।"[৫]

সতীনাথ তাঁর রাজনৈতিক কর্মকালের জনজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (দু-পর্ব) এবং কিছুটা 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'-এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তবুও তিনটি গ্রন্থকে একই পর্যায়ে রাখা চলে না। 'জাগরী' উপন্যাস মধ্যবিত্ত মানুষের রাজনৈতিক সত্যের অনুসন্ধান, অপর পক্ষে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' অন্ত্যজ এবং অস্পৃশ্য ভারতের চিত্তজাগরণের ইতিবৃত্ত। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' শ্রমিক সংগঠনী রাজনীতির কাহিনী। তিনটি উপন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক উপাদান থাকলেও তাদের গঠনকৌশল এবং বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য এত প্রবল যে তিনটি উপন্যাসকে একই শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

সতীনাথের অপর চারটি উপন্যাস যথা, 'সংকট', 'অচিন রাগিনী', 'দিগ্‌ভ্রান্ত' এবং 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' এসব উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমিতে রাজনীতির কোনো স্পর্শই পাওয়া যায় না। 'অচিন রাগিনী'কে তিনি 'টান ভালবাসার গল্প' বলেছেন। 'অচিন রাগিনী' মূলত মনস্তাত্ত্বিক গল্প হলেও তার মধ্যেও সম্পূর্ণ একটি কাহিনী বা প্লট পাওয়া যায়, কিন্তু 'সংকট' উপন্যাসে কোনো দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনী পাওয়া যায় না। এতে সতীনাথ মানুষের জীবনের কয়েকটি চরম মুহূর্তের অনুপম বিশ্লেষণ করে কাহিনীর আকার দিতে চেয়েছেন।

বহু মুহূর্তের যোগফলেই মানুষের জীবন এবং এই জীবনের পরিপূর্ণ রূপ দান করাই উপন্যাসের প্রধান একটি ধর্ম; কিন্তু 'সংকট' উপন্যাসটিতে কয়েকটি মানুষের জীবনের বিচ্ছিন্ন সংকটমুহূর্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সতীনাথের 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসটিতে আধুনিক উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। এতে একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ কাহিনী আছে তেমনি আধুনিক মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যক্তি-সত্তার চরমতম বিকাশ সাধিত হয়েছে। 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' ভাদুড়ী মশায়ের বিশেষ আস্বাদের ভ্রমণকাহিনী। কিন্তু এতেও লেখকের বহির্লোকের পরিচয়ের চেয়ে অন্তর্লোকের পরিচয়ই বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ফরমায়েসী কোন সাহিত্য রচনা করেননি। চলতি জনরুচির মুখাপেক্ষী হয়ে তিনি কোন সাহিত্যই সৃষ্টি করেননি। ফলে, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সামান্যই, তাঁর তীক্ষ্ণ মননশীলতা, ভাষা এবং শব্দচয়নের নিপুণতা এবং সূক্ষ্মানুকৃতির প্রতি মনোযোগ একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি প্রত্যেকটি গ্রন্থ রচনার জন্য কতদূর পরিশ্রম করতেন। এই কারণে রেণুর এক একটি গ্রন্থ স্বতন্ত্র ভাবনাপুষ্ট। ফণীশ্বর প্রেমচন্দ, ভগবতীচরণ বর্মা, অমৃতলাল নাগর, নাগার্জুন সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন; প্রেমচন্দ ও যশপাল-পরবর্তী হিন্দী উপন্যাসের অধিনায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ, ফণীশ্বর 'কন্টিনেণ্টাল' সাহিত্য পড়ে লেখার প্রেরণা পাননি, তিনি আউটসাইডার ছিলেন না। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার গ্রামীণ সমাজ থেকেই তাঁর অভ্যুদয়, সেই সমাজকে তিনি ঘনিষ্ঠতায় গভীরতায় পেয়েছিলেন। এক সামগ্রিক জীবনবোধে তিনি উদ্বুদ্ধ, গতিশীল সামাজিক পরিবর্তন ও নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন এবং ঐতিহ্যবাদী অধ্যাত্মবিশ্বাসী ভারত-চেতনায় প্রাণিত।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সতীনাথের সব উপন্যাসের প্রেক্ষাপটই বিহারের কোন শহর কিংবা গ্রাম। 'অচিন রাগিণী'ও বিহারের মফস্বল শহরের পটভূমিতে রচিত। পাত্র-পাত্রীরাও বিহারের দীর্ঘকালের স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দা নতুবা বিহার প্রদেশেরই লোক। ফণীশ্বরের উপন্যাসের প্রেক্ষাপটও গ্রামীণ বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চল। এই কারণে রেণুকে সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনদৃষ্টিতে প্রভাবিত এবং ভাদুড়ীজীর কথাসাহিত্যের স্রোতের দ্বারা বাহিত ফুল বলে মেনে নিতে হয়। জেলে সতীনাথের জীবনচর্যা ফণীশ্বরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়:

"জেলে আসার আগেই শুনেছিলাম—মানুষের আসল চেহারা জেলের ভিতরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। মুখোশ খোলা আসল মানুষ। বাইরে থাকতে গলা ফাটিয়ে যাদের 'জয়জয়কার' করতাম তাঁদের সঙ্গে জেলে মাত্র কয়দিন থেকেই মনের আসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের প্রতিমাগুলো নিজেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অনেক শ্রদ্ধেয় মূর্তিকে নিজের হাতে ভাঙ্গতেও হয়েছিল। ভাদুড়ীজীর সঙ্গে ওই তিন বছর থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বলে জীবন-সংগ্রামের আঘাতে আমি কোনদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাইনি।"[৭]

গান্ধীবাদ, আঞ্চলিকতা, মাটির কাছাকাছি মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ইত্যাদি কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে সতীনাথের সঙ্গে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথের মিল আছে মনে হলেও দ্বিতীয়জন যেমন কোনদিনই সতীনাথের মত মার্জিত বৈদগ্ধ্যের অধিকারী ছিলেন না, ঠিক তেমনি সতীনাথ তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে ফণীশ্বরের মতো জীবনবোধকে অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

প্রখর যুক্তিবাদী মন, তীব্র গাণিতিক বুদ্ধি, বস্তুনিষ্ঠ এবং অগাধ অভিজ্ঞতার সম্পদ নিয়ে ফণীশ্বর প্রেমচন্দ-যশপাল-নাগার্জুনের পর হিন্দী সাহিত্যের সিক্ত পরিবেশকে অগ্নিস্নাত করতে এসেছিলেন।[৮] হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি-সম্ভাবনা বীজ আকারে অনেক পূর্বেই তাঁর চিত্তে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই উপন্যাস রচনা করার আগেও তিনি অনেক গল্প ও কবিতা রচনা করেছিলেন যা সে সময় অনেক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তবে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ সতীনাথ ভাদুড়ী যে বস্তুনিষ্ঠার সততা প্রদর্শন করেছেন, অবলীলাক্রমে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির সহায়তায় একটি গোষ্ঠীজীবনকে তাদের প্রবাদ-প্রবচন, ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, নীতিবোধ, সংস্কার, প্রথা সব কিছুর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার সঙ্গে যে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরের প্রথম উপন্যাস 'মৈলা আঁচল'-এর সাযুজ্য আছে একথা অনস্বীকার্য।

প্রকৃতির দিক থেকে 'ঢোঁড়াই চরিত-মানসে' বিহার প্রদেশের জিরানিয়া অঞ্চলের সঙ্গে 'মৈলা আঁচল'-এ বর্ণিত পূর্ণিয়া জেলার মেরীগঞ্জ-এর সুস্পষ্ট মিল আছে। উভয় উপন্যাসে একই অঞ্চলের তথ্যভিত্তিক অভিজ্ঞতাই বাস্তবতার ভিত্তি রচনা করেছে, তাই জিরানিয়ার ঢোঁড়াই, মেরীগঞ্জের কালীচরণ উভয়েই তাদের লৌকিক জীবনচর্যায় বিশ্বস্ত, কিন্তু 'সমাজবাদের

(Socialism) বহির্মুখী সমষ্টি চেতনায়'^২ 'মৈলা আঁচলে'র কালীচরণ একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক—সে এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে 'ঢোঁড়াই চরিত মানসের' জিরানিয়া অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণীর এক বিশেষ মানুষ ঢোঁড়াই গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অধিকার রক্ষায় নতুন নতুন আন্দোলনের কথা চিন্তা করে। আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, লৌকিক জীবনে আচার, প্রবচন এবং সঙ্গীতের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সতীনাথ এবং ফণীশ্বর উভয়েই সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাই ঢোঁড়াইয়ের বিয়ের 'পানকাটি' 'গোঁসাই জাগানো' প্রভৃতি স্ত্রী আচার যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত, তেমনই রেণু 'মৈলা আঁচলে' 'বিত্থাপত নাচ'-এর বর্ণনা করেছেন। এছাড়া 'বিবাহ গীত', 'ফসল কাটার গান', বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচলিত সাংস্কারিক গান, মৃদঙ্গের ধ্বনি ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বাক্‌ভঙ্গিমাতেও সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ উভয়েই স্ব-স্ব অঞ্চলের সুচারু প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে সতীনাথের সঙ্গে রেণুর যা কিছু সাধর্ম্য তা এই বাস্তব চেতনাতেই নিহিত, অন্তরঙ্গ পরিচয়ে (জাতীয়তাবাদী সতীনাথ এবং সমাজবাদী ফণীশ্বরনাথের স্বধর্ম মানসিকতায়) যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে, তা সহজে অনুমান করা যায়।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'দীর্ঘতপা' 'কিতনে চৌরাহে' রাজনীতিমূলক উপন্যাস। উভয় উপন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক উপাদান থাকলেও উভয়ের গঠনকৌশল এবং বক্তব্যের এত পার্থক্য যে উভয় উপন্যাসকে একই শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। তবে একথা ঠিক যে 'রেণু' তাঁর রাজনৈতিক কর্মকালের সময়কার জনজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই 'কিতনে চৌরাহে', 'দীর্ঘতপা', 'মৈলা আঁচল', 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসগুলির উপাদান সংগ্রহ করলেও এই চারটি উপন্যাসকে একই পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। 'মৈলা আঁচল' ও 'পরতী পরিকথা' আঞ্চলিক উপন্যাস। অন্ত্যজ অস্পৃশ্য একটা বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ গোষ্ঠীরই চিত্তজাগরণের ইতিবৃত্ত নয়, সম্পূর্ণ ভারতের নিম্নশ্রেণীর চিত্তজাগরণের ইতিবৃত্ত। এই দুটি উপন্যাসের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (দু পর্ব)-এর বহিরঙ্গ সাযুজ্যের কথা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। 'কিতনে চৌরাহে', 'দীর্ঘতপা' রাজনীতিমূলক স্বতন্ত্র ভাবনাপুষ্ট উপন্যাস। এ দুটি উপন্যাসে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের রাজনৈতিক সত্যের অনুসন্ধান আছে। 'রেণু'র এ দুটি উপন্যাসের সঙ্গে সতীনাথের 'জাগরী' উপন্যাসের বহিরঙ্গের দিক দিয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়।

'পল্টুবাবু রোড' 'রেণু'র মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসটির সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসের কিছুটা বহিরঙ্গে মিল আছে। আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতার কাহিনী। বিষাদ ও নৈরাশ্য থেকে সঙ্গপ্রাপ্তি ও আশায় প্রত্যাবর্তনের কাহিনী 'রেণু'র 'পল্টুবাবু রোড'। পুর্ণিয়া জেলার 'বৈরগাছী' গ্রামের অমলেন্দু রায়ের (লাট্টুবাবুর) বাড়ির নাম 'ফুলবাগান'। 'বৈরগাছী'র রায় পরিবার—এই পরিবারের লাট্টুবাবু (অমলেন্দু রায়), তাঁর পিতা কমলবাবু ওভারসিয়র, লাট্টুবাবুর বড় দাদা বিমলেন্দু রায়ের কন্যা বিজলী, ছোটভাই নির্মলেন্দু রায়ের পুত্র ঘণ্টা, কন্যা ছবি, সেই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ উকিল ভোলা সহায়ের কন্যা কুন্তলা ও ছবির বর্তমান প্রেমিক গোধনের কাহিনী। এই উপন্যাসের কাহিনী বাইরের জীবনের নয়, অন্দরমহলের কাহিনী। কুন্তলা, তার পুর্ব প্রেমিক গোধন, পল্টুবাবু, ছবি, বিজলী কীভাবে তাঁরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, কীভাবে তাঁদের মাঝে দেওয়াল গড়ে উঠেছে—তার কাহিনী গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। সেই দেওয়াল দুরতিক্রম্য বলে মনে হয়েছে। উপন্যাসের নামটিও তাৎপর্যপুর্ণ। উপন্যাসকার পল্টুবাবুর চরিত্র যে রূপে চিত্রিত করেছেন তা একটা বিশেষ যুগের প্রতিনিধি। পল্টুবাবুর শক্তি ও সম্পন্নতা অন্য কথায় তাঁর সাফল্যের রহস্যই তাঁর জীবনদর্শন। পল্টুবাবুর কাছে প্রেম শুধু সেক্‌স মাত্র, নারী কেবলমাত্র ভোগের জন্য। তাঁর কাছে নারী ও পুরুষের প্রণয়ের কোনো রোমান্টিক মূল্য নেই। নারীর প্রণয় টাকা দিয়ে কেনা যায়। তাই তিনি অনেক ধন অর্জন করেছেন, দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে এই বৈরগাছীতে তিনি দাদাগিরি করেছেন। অনেক ভাল ভাল ঘরের প্রতিষ্ঠিত লোকের মেয়ে বৌদের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন। তাঁর কাছে রাজনীতির কোনো আদর্শ নেই, শুধুমাত্র কাজে লাগানোর একটা মাধ্যম।

"পল্টুবাবু কী নজর মেঁ সভী শতরঞ্জকে প্যাদে হৈঁ—ফীল হৈঁ, ঘোড়ে হৈঁ, কিস্তী হৈঁ। লাট্টুবাবু, বিজলী, গোধন, মেহতা, কুন্তলা, ফেলা, ছবি—সভী। সারী দুনিয়া শতরঞ্জ কে কালে-সাদে ঘর, চৌকোর স্কয়ারোঁ মে বিভক্ত। কঁহী বিজলী হৈ, কঁহী গোধন।"[১০]

স্বাধীনতার পর ভারতীয় সমাজে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যে আদর্শে চলেছে—তাই পল্টুবাবু রোড।[১১] স্বাধীনতার পর বর্তমান ভারতীয় সমাজ যে পথে চলেছে তার নিপুণ নির্মম নির্মোহ বিশ্লেষণ এই

উপন্যাস। ঘটনার পর ঘটনা গেঁথে যাওয়া নয়, ঘটনার আড়ালে যে মন কাজ করে চলেছে তারই ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ, আপাত তুচ্ছের মধ্যে বড় কিছুর ইশারা রেখে যাওয়া এভাবেই চলেছে 'পল্টু বাবু রোড'।

রেণুর 'জুলুস' উপন্যাসটিকে মনস্তত্ত্বমূলক রাজনৈতিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করা যায়। স্বাধীনতালাভের পর দেশের যে পরিবর্তন হয় তারই সজীব চিত্র 'জুলুস' উপন্যাস। সাম্প্রদায়িকতা, প্রান্তিকতা, জাতিবাদের সংকীর্ণতাতে যে সময় ভারতে একদিকে দাবানল জ্বলছে, অপরদিকে পুঁজিবাদের ষড়যন্ত্রে একশ্রেণীর মানুষ শোষিত হচ্ছে তারই পটভূমিকায় রেণু রচনা করেছেন 'জুলুস' উপন্যাস। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তুদের যে সমস্যা আমাদের দেশের মধ্যে, তাদের যে ভিড় সেই ভিড়েরই এক সদস্যরূপে 'রেণু' নিজেকে মনে করেছেন। সেই উদ্বাস্তুদের পাঁচমিশালি জনতায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে সেই ভিড়েতেই হারিয়ে যেতে চেয়েছেন। এই উপন্যাস রচনার ভূমিকাতে তিনি বলেছেন :

"য়হ জুলুস কহাঁ জা রহা হৈ, য়ে লোগ কোন হে, কঁহা জা রহেঁ হৈঁ, ক্যা চাহতে হৈঁ, মৈ নহী জানতা। ইস মহা কোলাহল মে আপনে মুহ সে নিকালা হুয়া নারা মুঝে সুনাই নহী পড়তা। চারোঁ ওর এক ববণ্ডর মণ্ডরা রহা হৈ, ধুলকা। ইস ভীড় সে নিকল, রাজপথ কে কিনারে সুসজ্জিত 'বালকোনী' মে খড়া হোকর জুলুস কো দেখনে কী চেষ্টা কী হৈ, কিন্তু ইস ভীড় সে অলগ হোনে কী সামর্থ্য মুঝমে নহী। ইস জুলুস মে চলনেবালে নর-নারিয়োঁ সে—অপনে আসপাস কে লোগোঁ সে পরিচয় নহী। লেকিন উনকী মায়া-মমতা সে মৈ ছিটককর অলগ নহী হো সকতা।"[১১]

'রেণু'র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি কোন ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর দেশভক্তি আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তিনি সুচিন্তিতভাবে কর্তব্যবোধের তাড়নায় দেশভক্তির সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি মননশীল ছিলেন এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম মমত্ববোধ ছিল। এই দুটি গুণই তাঁকে বাস্তবনিষ্ঠ করে তুলেছে।

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' দেশবিভাজনের পটভূমিতে উদ্বাস্তু বাঙালীদের করুণ মর্মান্তিক জীবনকাহিনী নিয়ে 'জুলুস' উপন্যাস রচনা করেছেন। পক্ষান্তরে প্রবাসী বাঙালী সতীনাথ ভাদুড়ীও উদ্বাস্তু বাঙালীদের সমস্যা দেখে বিচলিত

হয়েছেন, সতীনাথ লিখেছেন—

"এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশশুদ্ধ লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশাহারা করিয়া দিয়াছে। যেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফাটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কি করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না।"

এই অবস্থার সঙ্গে সতীনাথের ন্যায় ফণীশ্বরনাথ রেণুরও আত্মিক যোগাযোগ ছিল। এক কথায় বলা যায় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই উভয়কে এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে।

সতীনাথের 'অচিন রাগিণী' ও 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসের সঙ্গে 'রেণু'র 'জুলুস' উপন্যাসের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে কাহিনী ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অমিলটাই বেশী। সতীনাথ ভাদুড়ী মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক লেখক ছিলেন। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের যে ধারাটি সে সময়কার সাহিত্যে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল, তিনি তা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। একদিকে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা অপরদিকে মার্কসীয় সমাজবাদ ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। নরনারীর জৈব সম্পর্কের অকপট আলোচনায় 'রেণু' কিছুটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী এদিকে একেবারেই যাননি। তাঁর জীবনদর্শন অনেক ব্যাপকতর ছিল। 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'সংকট', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', 'দিগ্‌ভ্রান্ত', প্রভৃতি উপন্যাসগুলির বিষয়বৈচিত্র্য একথাই প্রমাণ করে। এদিক দিয়ে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র সঙ্গে তাঁর দুস্তর ব্যবধান। 'রেণু' তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসে বিশেষ করে 'পর্ন্টুবাবু রোড', 'দীর্ঘতপা' উপন্যাসে যৌন মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা গ্রহণ করেছেন, অপরদিকে মার্কসীয় সমাজবাদ ও গান্ধীবাদকে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও যুক্তিবাদের প্রাধান্য দিয়েছেন।

তবে একথা ঠিক যে, সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর জাগরী উপন্যাসে একদিকে মার্কসবাদ এবং অপরদিকে গান্ধীবাদ এই দুটি আধুনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট অন্য কোন উপন্যাসে এই মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' তিনি 'ঢোঁড়াই'-এর মানসিক পরিবর্তনে গান্ধীবাদের প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু এই চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন স্রোতোধারা সতীনাথ ভাদুড়ীর আর কোন উপন্যাসে

প্রবাহিত হয়নি, ফলে তাঁকে কোন একটি বিশেষ সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা যায় না। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের সঙ্গে রেণুর রচনার বিষয়গত সাদৃশ্য থাকলেও উপন্যাসের আন্তরধর্মে বিশেষ পার্থক্য আছে। সতীনাথের উপন্যাসের উপর পাশ্চাত্য যে প্রভাবটি সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকর হয়েছে—তা হল রূপের বৈচিত্র্য। প্রচলিত ধারায় তিনি কাহিনী অথবা চরিত্র বর্ণনা করেননি। একই সঙ্গে একাধিক পাত্র-পাত্রীর মনে চিন্তার আবর্ত সৃষ্টি করেছেন, কাহিনীর সময়সীমা মাত্র একদিন ('জাগরী' উপন্যাস)। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনাবিন্যাসে কালানুক্রম মেনে চলেননি। সতীনাথের উপন্যাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা এবং চরিত্রসৃষ্টিতে অন্তর্মুখিনতার ঝোঁক। পক্ষান্তরে ফণীশ্বরনাথ রেণু প্রচলিত ধারায় কাহিনী এবং চরিত্র বর্ণনা করেছেন। তবে একটা দিক দিয়ে উভয়ের উপন্যাসের একটা বড় মিল যে উভয়েই সংবেদনশীল লেখক ছিলেন। আর উভয়ের উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য যা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে তা হলো বক্তব্যের প্রাধান্য। উভয়েই কাহিনীতে বক্তব্যের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন হওয়ার জন্য উপন্যাসের অন্যান্য উপাদান বিশেষ স্থান করে নিতে পারেনি। তবে "একই কালে, একই দেশে জন্মালে বিষয়ে, অভিজ্ঞতায় ও সাহিত্য চেতনায় এক আধটু সহধর্মিতা থাকবার কথা, কতকটা অনুকরণীয়।"[১৪]

সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বরনাথ রেণুর এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বিচার করার জন্য উভয়ের উপন্যাসগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছি।

১। দ্রষ্টব্য রেণু স্মরণ আউর শ্রদ্ধাঞ্জলী, ২য় খণ্ড, ১৯৮৩, পৃ. ১৭।

২। সতীনাথের ডায়েরী

৩। অনুসন্ধানী, সতীনাথ গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫৪৭।

৪। অনুসন্ধানী, সতীনাথ গ্রন্থাবলী ৪, পৃ. ৫৪৮।

৫। ১৯৫৪'র ডায়েরী, সতীনাথ গ্রন্থাবলী ২, পৃ. ৯।

৬। আধুনিক সামাজিক আন্দোলন ও আধুনিক হিন্দী উপন্যাস—কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, পৃ. ৩৪৯।

৭। ফণীশ্বরনাথ রেণু—এক ঝলক, রেণু স্মরণ আউর শ্রদ্ধাঞ্জলী, ২য় খণ্ড।

৮। রেণু: কর্তৃত্ব আউর কৃতিয়াঁ, 'রেণু স্মৃতি গ্রন্থ' খণ্ড ২।

৯। ফণীশ্বরনাথ রেণু কী উপন্যাস কলা—কুসুম সোফট, পৃ. ৫৯

১০। Socialism—(মার্কসবাদ) Part I

১১। পল্টু বাবু রোড, ফণীশ্বরনাথ, পৃ. ৭৫।

১২। জুলুস, ভূমিকা, ফণীশ্বরনাথ রেণু।

১৩। সতীনাথ ভাদুড়ী স্মরণে পত্রিকা—পূর্ণিয়া, ১ম সংখ্যা, ১৯৫৩।

১৪। গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী সাহিত্য ও সাধনা, পৃ. ৪২—৪৩।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আঞ্চলিক উপন্যাস

আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে আমরা সেইসব উপন্যাসকে চিহ্নিত করতে পারি, যেসব উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলি একটা বিশেষ পরিবেশের সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে। সেসব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেই বিশেষ আঞ্চলিক ভিত্তির প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয়। তখনই সেসব উপন্যাস বিশেষ অঞ্চলের হয়ে ও দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে যায়।

বিশ্বসাহিত্যের বিস্তৃততর প্রাঙ্গণে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' একটি বহুল পরিচিত বিষয়। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বহু বরেণ্য কথাসাহিত্যিক কালজয়ী আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা করেছেন। উনবিংশ শতকের প্রথমেই ইংরেজী সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের সৃষ্টি। ১৮০০ সালে মেরিয়া এজবর্থ-রচিত 'কৈঁসিল রেকরেণ্ট'কেই (Regional Novel) সর্বপ্রথম আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে অভিহিত করা হয়। এই উপন্যাস মেরিয়া সুদূর আয়ারল্যাণ্ডের একটি গ্রামের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস রচনা করেন—যা এঁর পূর্বে ইংরেজী সাহিত্যে কেউ করেননি। যদিও 'কৈঁসিল রেকরেণ্ট'-এর মধ্য দিয়ে ইংরাজী সাহিত্যের একটা নূতন দিকের সূচনা হয়েছে, ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ হয়েছে কিন্তু এ উপন্যাসকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করা যায় না। তবু Walter Alan 'কৈঁসিল রেকরেণ্ট'-কে ইংরেজী সাহিত্যের মহত্ত্বপূর্ণ উপন্যাসরূপে অভিহিত করেছেন।

মেরিয়ার পর পাশ্চাত্য উপন্যাস সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের লেখক রূপে Walter Scott-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে স্কটল্যাণ্ডের জনজীবনের প্রচলিত রীতি-নীতি, প্রথা-পরম্পরা, আচার-সংস্কারের জীবন্ত চরিত্র অঙ্কন করেছেন। স্কট মূলতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসকার কিন্তু ঐতিহাসিক পরিবেশ অঙ্কনে তিনি আঞ্চলিকতাকে আশ্রয় করেছেন। অতএব ওয়ালটার স্কট-এর উপন্যাসে আঞ্চলিকতা একটি বিশেষ তত্ত্বমাত্র, তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলিকে সামগ্রিক বিচারে আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে অভিহিত করা যায় না।

পাশ্চাত্য উপন্যাস সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে হেমিংওয়ে এবং টমাস হার্ডি সার্থক ও যথার্থ আঞ্চলিক উপন্যাসকাররূপে স্বীকৃত। হেমিংওয়ে বিখ্যাত 'Old man and the sea' উপন্যাসে কিউবার সামুদ্রিক পরিবেশের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে আঞ্চলিক উপন্যাসের জগতে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। টমাস হার্ডির (১৮৪০—১৯২৮) প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাস 'The Return of the Native' (১৮৭৮), এর পর তিনি প্রায় শতাধিক আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা করেন।[১]

মানুষের বিচিত্রতর সমস্যা, জীবনের বহু জটিলতা, মানবমনের অপার রহস্য, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সংঘাত, সামাজিক নানা জটিলতার আবর্তে অস্কুশিত মানবজীবন, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, সমাজধর্ম, প্রকৃতির বিচিত্র লীলা, বন্যা, খরা, ঝড় প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু গড়ে ওঠে। বিচিত্র পরিবেশে মানুষের বৈচিত্রপূর্ণ পরিচয় দান করাই ঔপন্যাসিকের কাজ। এই মানুষের পরিচিতির সম্পূর্ণতা আনতে লেখকরা অনেক সময়ই তার পারিপার্শ্বিকতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। তাই মানুষের আন্তর্জাতিক পরিচয় থাকলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তার জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দেশেরই প্রকৃতি ভিন্ন। কোন বিশেষ দেশের পরিচয় ধরা পড়ে সেই দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উপর। মানুষও সম্পূর্ণ হয় তার অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে। তাই যে-কোন দেশের যে-কোন ভাষার উপন্যাসেই বাস্তবতার প্রয়োজনে কিছু পরিমাণে আঞ্চলিক গুণ পরিস্ফুট হয় অর্থাৎ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্রচিত্রণে প্রত্যেক বিশ্বস্ত ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে আঞ্চলিক দোষগুণগুলি প্রতিফলিত হয়।[২]

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেও কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। তার মধ্যে শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠির দেশ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (দুই খণ্ড) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে, বাংলা পল্লীজীবনের রূপকার হিসাবে শরৎচন্দ্রের রচনায় হুগলী জেলা, মনোজ বসুর রচনায় দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন ও বাদা অঞ্চল সহ খুলনা-যশোহর জেলার চিত্র পাওয়া যায়। বনফুলের রচনায় পাই বিহারের গ্রামজীবনের কিছু খণ্ডচিত্র। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সতীনাথ যে অর্থে আঞ্চলিক ছিলেন,

উল্লিখিত কোন লেখকই সেই অর্থে আঞ্চলিক নন। কারণ শুধুমাত্র আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবেই 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র সমকক্ষ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। অঞ্চলচেতনা এই উপন্যাসের মর্মস্থলে গ্রথিত। বাংলায় রচিত অন্যান্য স্বীকৃত আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির সঙ্গে এর একটা প্রভেদ আছে।...'ভাষায়, ভাবে, কথায়, ইডিয়ামে, আচরণে লোক সমাজের সকল দিকের পরিচয় ঢোঁড়াই চরিত মানসে সযত্নে বিধৃত। বাঙ্গালী আঞ্চলিক সাহিত্যের ধারায় নিশ্চয়ই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' তাই অগ্রগণ্য। আঞ্চলিক সত্যের উপর 'পদ্মানদীর মাঝি'ও এতটা নির্ভরশীল নয়—তাতে পদ্মানদীর আবহাওয়া এত গুরুতর, অপরিহার্যও নয়; 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'ও নয়—উত্তররাঢ়ের ভাষা-ভাব-কর্ম অনিবার্যভাবে করালী ও বনওয়ারী সৃষ্টি করে না; ও সুবোধ ঘোষের শতকিয়াও নয়।—ওসব উপন্যাসে আঞ্চলিকতা কতকটা আভাসিত করাই লেখকরা নিজেদের প্রয়োজন মনে করেছিলেন, তাতেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' আঞ্চলিকতা বাতাবরণ নয়, আবহাওয়া নয়, আঞ্চলিকতাই উপন্যাসের বিষয়বস্তু, কথা ও জিরানিয়ার জীবন-ধর্মের বিবরণ; বিশেষ অঞ্চলের স্বাদ-গন্ধ-ভাষা-ভাব মিশে সার্থকভাবে তা সৃষ্ট হয়েছে। জীবনচর্যার প্রতি এরূপ বিশ্বস্ততা ছাড়া এ স্বাদ-গন্ধ লাভ করা যেত না।'[৩]

সতীনাথ ভাদুড়ীর আঞ্চলিক উপন্যাসের সঙ্গে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তারাশঙ্কর, মানিক, শৈলজানন্দ, বিভূতিভূষণ ও হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাসের সঙ্গে 'রেণু'র রচনাগুলির তুলনা করলে সতীনাথের আঞ্চলিকতার বিশিষ্টতার স্বরূপটি নির্ধারণ করা যাবে।

আঞ্চলিক হিন্দী উপন্যাসের কিছুটা পরিচয় উপন্যাসকার প্রেমচন্দ,বৃন্দাবনলাল বর্মা এবং নিরালার রচনাতে পাওয়া যায়। এর পরবর্তী সামাজিক; ঐতিহাসিক এবং রোমান্টিক হিন্দী উপন্যাসগুলিতেও ঘটনা, চরিত্র ও ভাষার মধ্য দিয়ে আঞ্চলিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু প্রকৃত আঞ্চলিক হিন্দী উপন্যাস রচিত হয় ১৯৪৭-এর পরে; অর্থাৎ বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক পরে, স্বাধীনতার পর হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয়। হিন্দী সাহিত্যের প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাস নাগার্জুনের রচিত 'রতিনাথ কী চাচী' (১৯৪৮), এরপর নাগার্জুনের আরো তিনটি উপন্যাস 'বলচনমা' (১৯৫২), 'নঈপৌধা'

'(১৯৫৩) এবং 'দুখমোচন (১৯৫৬) আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে অভিহিত।'[৪] নাগার্জুনের রচিত 'রতিনাথ কী চাচী' উপন্যাসে মিথিলার প্রাচীন পরম্পরা এবং সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর বর্ণনা আছে। ঐ অঞ্চলের সামাজিক কদর্যতা, অন্ধ সংস্কারগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে জন-জীবনের দয়নীয় অবস্থার যে বর্ণনা নাগার্জুন দিয়েছেন তাতে মিথিলা অঞ্চলের একটা সজীব চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'নঙ্গেপৌধা' উপন্যাসে নাগার্জুন বিহারের নৌগছিয়া অঞ্চলের সীমিত পরিধির এক বিশেষ সামাজিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। 'দুখমোচন' উপন্যাসে বিহারের কৈমা-কেহিলী গ্রামের আঞ্চলিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নাগার্জুন 'বলচনমা' উপন্যাসে ভৌগোলিক সংহতি এবং কাহিনীর বিবর্তনে স্থানীয় পাত্র-পাত্রীর চরিত্র গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন এবং লোকভাষার প্রয়োগ করেছেন। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দারভাঙ্গা অঞ্চলের পল্লীজীবনের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সবদিক দিয়ে বিচার করে নাগার্জুনের 'বলচনমা' উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে অভিহিত করা যায়।[৫]

হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের জগতে ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র 'মৈলা আঁচল' প্রথম সর্বাধিক আঞ্চলিক লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস। মানুষ ও প্রকৃতির সুগভীর একাত্মতা এবং বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞাত জনজীবনের যে নিবিড় অন্তরঙ্গ চিত্র 'রেণু'র সৃষ্ট 'মৈলা আঁচল' ও 'পরতী পরিকথা' এই দুই উপন্যাসে, তার তুলনা সমগ্র হিন্দী কথাসাহিত্যে বিরল। ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'ই সর্বপ্রথম 'আঞ্চলিক' শব্দের ব্যবহার তাঁর 'মৈলা আঁচলে'র ভূমিকাতে করেছেন।[৬] বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার মেরীগঞ্জ গ্রামের ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। চিত্রিত করেছেন ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, আচার-আচরণ, প্রথা-পরম্পরা, শোষক-শোষিতের ইতিবৃত্ত। 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসের ভূমিকাতে রেণু লিখেছেন—

"ইসমে ফুল ভী হৈ, শূল ভী হৈ; ধুল ভী হৈ, গুলাল ভী; কীচড় ভী হৈ, চন্দন ভী—সুন্দরতা ভী হৈ, কুরূপতা ভী—মৈ কিসী সে ভী দামন বচাকর নিকল নহী পায়া।"

'মৈলা আঁচলে' শুধু মানুষ ও প্রকৃতিই নয় 'মেরীগঞ্জ' গ্রামের একেকটি ধূলিকণা পর্যন্ত চিত্রিত হয়েছে। 'রেণু'র 'পরতী পরিকথা'তেও পূর্ণিয়া অঞ্চলের 'পরানপুর' গ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। একদিকে পতিত

জমি অন্যদিকে রুগ্ন ক্লিষ্ট গ্রামবাসী। নূতন ভূবন্দোবস্ত আইনে এদের মধ্যে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই উপন্যাসের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন মূলতঃ ভূমিকেন্দ্রিক। সবকিছু এত যথার্থ, এত বাস্তববাদী যে প্রসিদ্ধ সমালোচক মন্তব্য করেছেন—

"জান পড়তা হৈ কি কোসী অঞ্চল কী কুছ বর্ষো কী সারী জীবন গতি উপন্যাস মে উঠাকর রখ দী গঈ হৈ।"[৭]

হিন্দী উপন্যাসের জগতে সার্থক ও যথার্থ আঞ্চলিক ঔপন্যাসিকরূপে ফণীশ্বরনাথ রেণুকেই অভিহিত করা হয়।

বাংলা ও হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা হওয়ার বহু পূর্বেই বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিন্দী বাংলার প্রতিবেশী ভাষা। অতএব বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রভাব হিন্দী উপন্যাসের উপর পড়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর প্রভাব ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'মৈলা আঁচলে'র উপর কতটা আছে এ সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। সতীনাথ-পূর্ববর্তী আঞ্চলিক ঔপন্যাসিকদেরও কিছুটা প্রভাব রেণুর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দেখা যায়। বাংলা কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম আঞ্চলিক উপন্যাসের বিকাশ ঘটান। কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থা ও দাম্পত্য জীবনের অশান্তির সজীব বাস্তব চিত্রণের মধ্য দিয়ে তিনি একটি বিশেষ ধরনের রচনার সূত্রপাত করেন। এ বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব পরবর্তীকালে অনেকেই স্বীকার করেছেন।[৮]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠি অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁর পৈতৃক বাসভূমি রূপসীপুরে ও মাতামহের বাস বর্ধমান জেলার অণ্ডালে। তাঁর বিদ্যালয় জীবন অতিবাহিত হয়েছে মাতুলালয়ে—অণ্ডালে। অণ্ডালের অদূরে রাণীগঞ্জ-উখড়া-দিশেরগড় শিল্পাঞ্চল।

শৈলজানন্দ ব্যক্তিগতভাবে এইসব অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে আশৈশব পরিচিত। এখানকার কুলি-কামিনদের জীবন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা ও এখানকার পরিবেশের প্রভাব তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিতে যে পড়েছে তা তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি নিজে তাঁর সাহিত্য-সাধনার সম্পর্কে বলেছেন—

"কয়লাকুঠির দেশ। রবিবার দিন ছুটি পেলেই দুজ'নে (অন্যজন নজরুল).

দুটি খাতা হাতে নিয়ে চলে যাই বহু দূরে। একদিন কয়লা খাদের পাশে সাঁওতালী কুলি ধাওড়ার কাছে আমরা বসে বসে গল্প করছি আমার বেশ মনে আছে.দূরে প্রকাণ্ড চিমনির মুখে ধোঁয়া উঠছে, মুখে হেড গিয়ারের চাকা ঘুরছে, তার উপর পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে, ঢং ঢং ঘণ্টা বাজছে, মাটির নীচে থেকে কয়লা বোঝাই টব গাড়ী উঠছে। দূরে একটি আম বাগানের পাশে হঠাৎ কোথায় যেন মাদল বেজে উঠলো। এই সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে একটি অপূর্ব ভাব জাগলো যে আমি আর কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। বাড়ী ফিরে এসেই গল্প লিখতে বসে গেলাম···আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লার খনি এবং চরিত্ররা সব সাঁওতাল কুলি মজুর।"[৯]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে লেখকের কাছে কয়লাখনি শুধু গল্পের পরিমণ্ডলমাত্র কিন্তু অন্তরাত্মা নয়। তাঁর চেতনায় অঞ্চলচেতনার দুটি রূপ—একটিতে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি ও তার আদিমতা, অপরদিকে রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম্যজীবন এবং পল্লীবাংলার চিরন্তন রূপ। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—

"স্থান-কাল-ভাষা পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'লোকাল কালার' তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণ ভাবে দেখা গেল।"[১০]

কিন্তু তথ্য ও বিষয়ের রূপায়ণে নিষ্ঠা শৈলজানন্দের ছিল না। তাই বাস্তব চেতনার কষ্টিপাথরে তাঁর অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্যটি ছেড়ে গেছে। তাই—

"শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আনেনি।"[১১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের দিগন্ত স্পর্শ করলেও কোনও বিশেষ আঞ্চলিক পরিবেশের মধ্যে তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যপ্রেরণা কোন স্থানিক চেতনাসম্ভূত নয়। তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনে বাস্তবতার অনুসন্ধান করেছেন। তাই বিভূতিভূষণের সাহিত্যে দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা ও যশোহর এবং তারাশঙ্করের সাহিত্যে রাঢ় অঞ্চল যেমন আদ্যন্ত পুনরাবৃত্ত হয়েছে মানিকের রচনায় কখনই তা হয়নি। তবে 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে আঞ্চলিক জীবন চিত্রণে, প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় একাত্মতার বিশ্লেষণে তিনি যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মানদী এবং তার তীরবর্তী মাঝিদের যে জীবনকথা অঙ্কিত

হয়েছে তাতে অঞ্চলচেতনা অনেক বেশী বাঙ্ময় এবং বিশস্ত। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্মরণ করা যায়:—

"His East Bengal river's were much more than a novel setting, they were another horizon of the mind, his villages, described in universal terms, were yet clear in every local feature, his poor people were not what the richer thought of them, his illiterates did not think the thought of the writer."[১২]

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে আঞ্চলিকতা আলোচনার সূত্রপাতে স্বাভাবিক-ভাবেই এ প্রশ্ন জাগে যে, সতীনাথকে কি তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষ বলে গণ্য করা যায়? না, তিনি নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ? এ প্রসঙ্গে আমাদের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের পটভূমিটি জেনে নিতে হয়।

"তারাশঙ্কর যে সময়ে বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিলেন, সে সময়ে—শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অন্তর্ধানের পরমুহূর্তে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল—সেদিন কল্লোল কালিকলম উপাসনা-বঙ্গশ্রী-বিচিত্রার লেখক গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রতিমার কাঠামো তৈরী করেছিলেন।

মজা এইখানে যে তাঁরা (একমাত্র ব্যতিক্রম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক প্রভাব কাটাতে পারলেন না। পথের পাঁচালী-অপরাজিত-রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরল সততা, কি পুতুলনাচের ইতিকথা -রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতা, কি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামজীবন, মাটি ও মানুষ সম্পর্কে সুগভীর মমতা ও অভিজ্ঞতা, —কোনোটাই তাঁদের ছিল না। তাঁদের (কল্লোল গোষ্ঠীর) উদ্দীপনাটা এসেছিল বিদেশী বইয়ের দুনিয়া থেকে, নীচুতলার মানুষদের উপর যে আলো তাঁরা ফেলেছিলেন তা রঙিন আলো, আপন দেশ ও সমাজের মাটি থেকে সত্যকারের মানুষকে ছেঁকে তোলেন নি। তাঁরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক ও আত্মস্থ অর্থাৎ সত্যিকারের লেখক হলেন তখন আর নীচুতলার মানুষকে উপরে ওঠানোর তাগিদ বেঁচে রইল না তাঁদের কলমে। মাঝারিতলায় ঠেলে দেওয়ারই ব্রত নিলেন। তার ফল হল সাংঘাতিক। চিন্তা বিপ্লব পিছু হটে

গেল। সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন স্মৃতির কুলুঙ্গীতে আত্মগোপন করল। আদর্শবাদ ও রোমান্টিকতার জয়জয়কার হল।

তবু এঁদের সকলকে ছাড়িয়ে উঠলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত লেখকরা বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর ও বনফুল, ধূর্জটিপ্রসাদ ও সরোজকুমার ব্যক্তিগত বিচারে তারাশঙ্কর অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী, নিপুণ, মননশক্তি সম্পন্ন লেখক রূপে দেখা দিয়েছিলেন। তথাপি তারাশঙ্কর তাঁদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্র-শরৎ-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের অধিনায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ তারাশঙ্কর 'কন্টিনেণ্টাল' সাহিত্য পড়ে লেখার প্রেরণা পান নি, তিনি আউটসাইডার ছিলেন না, রাঢ়ের গ্রামীণ সমাজ থেকে তাঁর অভ্যুদয়, সেই সমাজকে তিনি ঘনিষ্ঠতায় গভীরতায় পেয়েছিলেন। এক সামগ্রিক জীবনবোধে তিনি উদ্বুদ্ধ, গতিশীল সামাজিক পরিবর্তন ও নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন এবং ঐতিহ্যবাদী অধ্যাত্ম বিশ্বাসী ভারত চেতনায় প্রাণিত। ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, মন্বন্তর (১৯৩৯-৪৩) এই উপন্যাস-পঞ্চকে তারাশঙ্করের ভূমিকা ও অধিনায়কত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

তবু কালস্রোত বহে যায়, রুচি পরিবর্তিত হয়, উপন্যাসরীতি নব নব পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু (১৯৩৮) ও বিশ্বসমরের সূচনা (১৯৩৯) থেকে বঙ্গদেশ ও বাঙালি সমাজ এক ক্রান্তিকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হল। জাপানী আক্রমণ, আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যা (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দক্ষিণপূর্ব এশীয় রণাঙ্গণে সমরায়োজনের মঞ্চরূপে কলকাতা ও বাংলাকে ব্যবহার (১৯৪১—৪৫), দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশবিভাগ, স্বাধীনতা ও উদ্বাস্তু স্রোত (১৯৪৭—৫০) এক রুধির স্রোতের মধ্য দিয়ে বাঙালিকে দশটা বছর কাটাতে হয়েছে।…তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তি মুহূর্তে শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিকতার অবসান, কল্লোলীয় বোহেমিয়ান পালার অবসান, বিভূতিভূষণের প্রকৃতিমুগ্ধতার বিদায়, এ সবই আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে এলেন নতুন লেখকবৃন্দ।"[১৩]

স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই পরিবর্তিত ধারার কথাসাহিত্যিকরূপে জাগরী (অক্টোবর ১৯৪৫) উপন্যাসকে নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা সাহিত্যে এলেন, এবং এই একটিমাত্র উপন্যাসের (জাগরী) দাবীতে পাঠক ও সমালোচক মহলে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। এরপর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস:

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯) প্রকাশিত হয়। স্বীকার্য যে সতীনাথ তাঁর সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্যের স্রোতের দ্বারা বাহিত ফুল নন অর্থাৎ ভাদুড়ী মহাশয়কে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষরূপে চিহ্নিত করা যায় না, সতীনাথ ভাদুড়ী নির্লিপ্ত অন্তর্মুখী লেখক, পূর্ণিয়াতেই থাকতেন, পূর্ণিয়ার প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবাসতেন নিভৃত নিরালায় থেকে তাদের নিয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে নিঃসঙ্গ বিহঙ্গরূপে অভিহিত করা চলে।

পূর্বেই বলেছি যে, হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুও তাঁর সমসাময়িক হিন্দী ঔপন্যাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত নন অর্থাৎ তিনি প্রেমচন্দ, জৈনেন্দ্র, নিরালা ইত্যাদি ঔপন্যাসিকদের উত্তরপুরুষরূপে উপন্যাস রচনা করেননি।

বাংলা ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসগুলির সঙ্গে রেণুর সৃষ্ট হিন্দী উপন্যাসগুলির একটা বহিরঙ্গ সাদৃশ্য আছে। মিল থাকাও স্বাভাবিক, কারণ দুজনেই একই ভূখণ্ডকে ভিত্তি করে উপন্যাস রচনা করেছেন। উভয়েই একই অঞ্চলের অধিবাসী। একই কালের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস রচনা করেছেন। ভাদুড়ীজীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র সঙ্গে রেণুর 'মৈলা আঁচলে'র মিল লক্ষ্য করা যায়। সতীনাথের এই উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণিয়া জেলার সমগ্র গ্রামীণ সমাজকে তুলে ধরা। রেণুও সেই উদ্দেশ্যকেই 'মৈলা আঁচলে'র রচনার পিছনে তুলে ধরেছেন। মানুষ পরিবেশকে, আর পরিবেশ যে মানুষকে বদলে দিচ্ছে এর বিবরণ উভয়েই তাঁদের উপন্যাসের কাহিনীতে দিয়েছেন। কিন্তু ফণীশ্বরনাথ রেণু বাস্তবতার তাগিদে, কিছুটা আত্মীয়পরিজনসুলভ অন্তরঙ্গতার তাগিদে তাঁর অঞ্চলের জীবনযাত্রার পরিচয় তুলে ধরেছেন। এতে তাঁর সততা বা নিষ্ঠার অভাব নেই। কারণ এতে তাঁর ভাষা, প্রকৃতি, আচার, আচরণের অনেকখানিই নিজের জীবনযাত্রার সাঙ্গীকৃত। ফলে রেণুর ঐকতান বেসুরো হয়নি অর্থাৎ তাঁকে নিজের মানস পরিমণ্ডল ছেড়ে বিপরীত কূলে তরণী বাইতে হয়নি। এইখানেই সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর পার্থক্য। কারণ তিনি যাদের কথা লিখেছেন শুধু যে তিনি তাদের একজন ছিলেন তাই নয়, তাদের ভাষা, জীবন, আচার-আচরণ সব কিছুর মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সতীনাথ জন্মসূত্রে বাঙালী। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য

মার্জিত বৈদগ্ধের। তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর কেটেছে নিবিড় অধ্যবসায়ের সাধনায়, অর্থাৎ তাঁর বাল্য-কৈশোর এদের সঙ্গে (যাদের কথা উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন) পরিচয়ের পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে। আকস্মিকভাবে রাজনীতিতে যোগদান করার পরই তিনি বিহারের গ্রামাঞ্চল এবং তাদের মানুষজনকে দেখবার-জানবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু এই সকল অখ্যাতজনের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ কত গভীর ছিল তা বোঝা যায়, যখন দেখি তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে কত নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের জীবনচর্যাকে একান্ত আত্মপ্রত্যয়ে তুলে ধরেছেন। অভিজাত ও কৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালী সতীনাথ, কিন্তু রেণু এই সমাজেরই মানুষ। বিহারের এক অখ্যাত অঞ্চলের অখ্যাত গ্রামের অন্ত্যজজনের জীবনযাত্রার রূপায়ণে ফণীশ্বরনাথের চেয়ে তাই সতীনাথের কৃতিত্ব অধিক। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসগুলির সঙ্গে ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসগুলির আলোচনা করলে তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

"তাতমাটুলিতে ঢোঁড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল। সে এক বছর আগে স্বর্গে গিয়েছে। এখানকার (উত্তর বিহারের) গ্রামাঞ্চলেও নামটা খুব চলে। তবে তার হিন্দীতে বানান হলো 'ঢোড়াই' (ঢোড়াই) উচ্চারণ ঢোঁড়াহাই বাঙ্গালীর নিজেদের ধরনে করে নিয়েছে ঢোঁড়াই। আমি বাঙলা ভাষীদের ভুল বানানটা নিয়েছিলাম ওই নামের অনুষঙ্গে নির্বিষ সাপের ইঙ্গিতটুকু আনবার জন্য।

ঢোঁড়াই মানুষটা কেমন ছিল তার পরিচয় এইবার দিই।

তাতমাটুলির লোকদের কথার বহর এ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের চক্ষুশূল। এহেন বাকপটু লোকদের মধ্যেও, কথার বাঁধনিতে ঢোঁড়াই-ই ছিল সকলের সেরা। তার কথার চটকের একটু নমুনা দিচ্ছি। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আম-বাগানে তাতমাটুলির লোকেরা সকালে বিকালে নোংরা করত। একদিন তিনি জনকয়েক সেপাই নিয়ে অকুস্থলে হাজির। যারা ধরা পড়েছিল তাদের মধ্যে ঢোঁড়াইও ছিল। সকলকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ভদ্রলোক বেশ ঝাঁজালো ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ভবিষ্যতে এ নোংরাম আর বরদাস্ত করবেন না। সকলে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। লোটা মাটিতে রেখে, দুই হাতে নিজের কান মলে ঢোঁড়াই বলল—**'হুজুর যখন জিভ নাড়িয়েছেন তখন আর কি এ বাগানে ময়লা থাকে।'** 'জবান হিলানা' কথাটা দ্ব্যর্থক। এর মানে কথা বলাও হয়, আবার চাটাও হয়।

বহু মূর্তিতে আমি ঢোঁড়াইকে দেখেছি। তাকে ভিক্ষা করতে দেখেছি, ঘর ছাইতে দেখেছি, গোরুর গাড়ি চালাতে দেখেছি। ইদানীং সে হয়েছিল রাজমিস্ত্রি—ঠিকেদার।

এই ঢোঁড়াইকে এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল আমার সম্মুখে। শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। রামায়ণের দিকে আমার নজর পড়েছিল আরও কয়েকটি কারণে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে রামায়ণের কাঠামোতে ফেলা খুব বেমানান হবে না, এই ছিল আমার ধারণা। এ ছাড়া আরও একটা বড় প্রয়োজনের তাগিদ ছিল। ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমন ভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমন ভাবে তারা ভুল ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে। এর বিবরণ দিতে গেলে, মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিত কিছু কথা না দিয়ে উপায় নেই। অথচ নিটোল উপন্যাসে প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে অপর জিনিসগুলোর একটা সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকা দরকার। রামায়ণ, মহাভারতে কত উপাখ্যান যেমন মূল কাহিনীর সঙ্গে আলাদা ভাবে গাঁথা, সেইরকম ভাবে লিখলে দেখলাম, আমার কাজ চলতে পারে। ভেবেছিলাম আদি-কবির আড়ালে আশ্রয় নিলে, হয়তো পাঠকরা বইয়ের পরিবেশ প্রধানত ক্ষমতা করতে পারবেন, তার সর্বজন পরিচিত, দৃঢ় কালজয়ী কাঠামোটা গাঁথনির আলগাভাব খানিকটা সামলে নিতে পারবে। মোট কথা, এরকম রূপায়ণের সুবিধা অসুবিধা খতিয়ে সুবিধার দিকটাই বেশি মনে হয়েছিল আমার।

"এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। এখানেই হল ঢোঁড়াই রামের আবির্ভাব আমার মনে। এ যুগে মহাকাব্য অচল কিনা সে প্রশ্ন আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। কেন না আমার কাজ ছিল শুধু পুরনো মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোঁড়াই রামকে বাঁধানো।"[১৪]

"আমার বই-এর নায়ক-চরিত্রে আমার হিসাবে ঢোঁড়াইকে বাছবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। চোখের সম্মুখে একটা নক্‌শা থাকলে আঁকবার সুবিধা হয়। পরে সেটার উপর একমেটে, দোমেটে কর, প্রয়োজন আর রুচি অনুযায়ী রঙ আর অলঙ্কার দাও। নাইবা থাকল প্রলেপের ফলে

প্রাথমিক মূর্তির সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য, তবু এই যেন সহজ বলে মনে হয় আমার কাছে।

ধূর্ত অথচ অকপট, নিরক্ষর অথচ জটিল প্রশ্নের সরল সমাধানে সক্ষম; নিজে অন্যায় করে অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় রুখে দাঁড়াবার সাহস রাখে; স্বার্থপর অথচ একটা পশুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রঙ্গ রসে ভরা বিচিত্র এই ঢোঁড়াই-এর চরিত্র বহুদিন থেকে আমায় আকর্ষণ করত। তাই আমার কাজের পক্ষে অনুপযোগী হলেও রামের খোঁজে বেরিয়ে, তার কথাই আমার সবচেয়ে আগে মনে পড়েছিল।

আমার কাজ হল চেনা ঢোঁড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে সে সারাদেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের প্রতিবেশের পূর্ণতর সম্ভাবনাটুকু, তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে হবে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক চাষবাস করে খায়। তাই গোরুর গাড়ি চালক ঢোঁড়াইকে যৌবনে তাতমাটুলি থেকে সরাতে হল চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতবার জন্য। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় এই শ্রেণীর লোকের চরিত্র, যেখানে যা কিছু ভাল নজরে পড়েছিল, সেইসব সদগুণগুলো দিয়ে তাতমাটুলির ঢোঁড়াইকে সাজাতে আরম্ভ করলাম।"[১৫]

ঢোঁড়াই যে উত্তর বিহারের অনুন্নত দেহাতী গ্রামের তাতমা সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি এবং এই উপন্যাসের পটভূমি যে উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের গ্রামজীবনের গভীরে প্রোথিত সে সম্পর্কে দুটি সাক্ষ্য এখানে উপস্থিত করছি—

"ঢোঁড়াই চরিতে'র স্থান, পাত্র সবই পূর্ণিয়ার ইতিহাসের অংশ। ঢোঁড়াই, বদরা মুচি, বৌকা বাওয়া, থান, রেবণগুনী, পাক্কী—সবই সুপরিচিত। মরগামা (মরংগা), জিরানিয়া (পূর্ণিয়া), মাটিহার (কাটিহার), রাজ পারভাঙ্গা (রাজ দ্বারভাঙ্গা), ছত্তিসবাবু (সতীশ কবিরাজ), ভাট্টাবাজারের কালালী, মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ী (ভাট্টার উপকণ্ঠে তাঁতমাটোলার ঠাকুরবাড়ী) ডিসট্রিক্‌ট বোর্ডের ঘড়ির ঘণ্টা (যার শব্দে ছোটবেলায় আমাদেরও ঘুম ভেঙে যেত; আজ স্তব্ধ)। ১৯১৩ সালে পূর্ণিয়ার জেলাশাসক কেলাডি সাহেবের গাড়ীতে আগুন লাগা (ঢোঁড়াই চরিত মানস, প্রথম চরণ) ১৯৩৪ সালের এপ্রিলে গান্ধীজীর পূর্ণিয়ায় পদার্পণ ও নওরতন মাঠে ভাষণ, ঢোঁড়াইয়ের প্রতিক্রিয়া (ঢোঁড়াই চরিত মানস, দ্বিতীয় চরণ), বাবুলাল

চাপরাশী, সামুয়র—সবই পরিচিত মানুষ ও ঘটনার শোভাযাত্রা।"[১৬]

"উনকে উপন্যাসকে হর পাত্রোঁ কো মৈনে দেখা হর সময় মৈ উস পাত্রোঁ কা সাথ রহেঁ হৈঁ—এক সাথ মে বহুত সুখ দুখ পায়া। উনকে সাথ বহুত ঘুমা। সমুচে জিলে কে গাঁও গাঁও মে কোন কোন পাত্র কহাঁ হৈ হম জানতে হৈঁ।"[১৭]

লেখকের বক্তব্য থেকেও জানা যায় যে, পূর্ণিয়া অঞ্চলের দেহাতী গ্রামের নিচুতলার তাতমা সম্প্রদায় যে সামাজিক ব্যবধান ও বিধিনিষেধের প্রাচীরের আড়ালে বন্দী ছিল, তার থেকে বেরিয়ে আসছে ঢোঁড়াই। একে লেখক যেমন পেয়েছেন ঠিক সেভাবে উপস্থিত করেননি, অনেক বদলেছেন—সারা-দেশের সাধারণ গরীব নিচুতলার মানুষের প্রতিনিধি করে তুলেছেন। ধাঙড়টুলি, তাতমাটুলি থেকে তাকে বার করে এনেছেন—ভিখারী ঢোঁড়াই, সন্ন্যাসীর চেলা ঢোঁড়াই, গরুর গাড়ির চালক ঢোঁড়াই, কৃষিকাজে সহায়ক ঢোঁড়াইকে করে তুলেছেন নায়ক চরিত্র। সে গড় চরিত্র নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। ঢোঁড়াই চরিত্র-ই উপন্যাসের কেন্দ্র; এরই চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের লৌকিক জীবন, ভদ্রেতর শ্রেণীর লোকায়ত সংস্কার এবং তাদের আচার-আচরণ বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিফলিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'। ঢোঁড়াই যে তাতমা সম্প্রদায়ভুক্ত তাদের চিরাচরিত মূল্যবোধ বিশেষ কিছু বদলায়নি, কিন্তু বদলেছে ঢোঁড়াই।

বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সতীনাথের ডায়েরীতে প্রাপ্ত ঢোঁড়াই সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলির আলোচনা আমাদের কাছে খুবই জরুরী। লেখকের বক্তব্য থেকে ঢোঁড়াই সম্পর্কে যেসব জরুরী সংবাদ পাই তা হল—

(ক) "তাতমাটুলি ধাঙড়টুলি ছোটবেলা থেকে আমার মনে অজানা স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলেছে—ও নিয়ে না লিখে আমার উপায় ছিল না।"

(খ) "বইখানির central appeal হবে focal point of characters of ঢোঁড়াই।

(গ) "Dhorai is the type not average ঢোঁড়াই দোষে গুণে মানুষ। সব দোষ দারিদ্র্যজনিত নয়। ধূর্ত অথচ অকপট, নিরক্ষর অথচ জটিল প্রশ্নের সরল সমাধানে সক্ষম, নিজে অন্যায় করে অথচ

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস রাখে, স্বার্থপর অথচ একটা অসহায় পশুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, রঙ্গ রসে ভরা।

(ঘ) "চেষ্টা করেছিলাম যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে of essential social factors which determined the world of Dhorai".

(ঙ) "Society is acceptcd as something immediately close powerful and final, as now changing and swiftly changing". (স্মরণীয় যে লেখক এ মন্তব্য করেছেন ১৯৬০-এর জানুয়ারীতে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যখন ভারতের গ্রামজীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে)

(চ) "Role of the society information and maintenance of the individual and the circumstances whcich determined the place and behaviour of the individual"[১৮]

(ছ) "ঢোঁড়াইদের Traditional values বিশেষ বদলায়নি—যতটা প্রত্যাশিত বা বইয়ে বলে ততটা বদলায়নি। জাত, সমাজ আর রামায়ণ।"

(জ) "লেখকের কাজ হল চেনা ঢোঁড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে সে সারাদেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।"

(ঝ) "এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন মানুষের মধ্যে। এখানেই ঢোঁড়াই-রামের আবির্ভাব হয়েছে লেখকের মনে। তাঁর কাজ ছিল শুধু পুরোনো মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোঁড়াই-রামকে বাঁধানো।"

সতীনাথের ডায়েরী (১৯৬০, জানুয়ারী ১—৪) থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত মন্তব্য থেকে 'ঢোঁড়াই' সম্পর্কে লেখকের প্রকৃত মানসিকতাকে আমরা বুঝতে পারি। দেহাতী মাটির গন্ধে, গাছ-লতাপাতার প্রাণে, গ্রাম্য মানুষের চরিত্রে, সরল বিশ্বাস, ধর্মবোধ, সংস্কার, আচার-আচরণে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' যে পরিবেশ রচনা করেছে তা শুধুমাত্র পূর্ণিয়া অঞ্চলের বিশেষ রূপ নয়—তা গ্রামীণ ভারতের দেহাতী জীবনের অকৃত্রিম রূপ। উত্তর-বিহারের অনুন্নত গ্রামাঞ্চলের তিরিশ বছরের (১৯১৫—৪৫) জীবনালেখ্যের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাস।

লেখকের ডায়েরীর মন্তব্য থেকে আরো জানা যায় যে, বিহারের গ্রামের নিচুতলার মানুষদের কাছে সমাজ ও চিরাচরিত মূল্যবোধ বিশেষ বদলায়নি, অন্তত এই উপন্যাসে আলোচ্য তিরিশ বছরে বিশেষ বদল হয়নি। গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষদের মধ্যে কংগ্রেসের কর্মীরূপে কাজ করার সময় লেখক খুব কাছের থেকেই ঢোঁড়াইদের দেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছিলেন।

'ঢোঁড়াই' তাতমাটুলির যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সে সমাজের নিয়ম প্রকৃতির নিয়মের মতোই অমোঘ হৃদয়হীন। সেই অমোঘ নির্মম নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে কীভাবে ঢোঁড়াই বেরিয়ে আসে তারই হৃদয়গ্রাহী কাহিনী 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে ঢোঁড়াই চরিত্রের শিকড় শুধু পূর্ণিয়া অঞ্চলেরই নয়, তা ভারতের গ্রামজীবনের গভীরে প্রোথিত। এদিক দিয়ে হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসের সৃষ্ট-চরিত্র যেমন পূর্ণিয়া অঞ্চলের গ্রামজীবনের ও সমাজের গভীরে প্রোথিত, সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র চরিত্রগুলি তেমনি প্রোথিত।

ঢোঁড়াইয়ের মূল যে চরিত্র ছিল লেখক তাকে অনেকটা বদলেছেন, কিন্তু ঢোঁড়াই কৃত্রিম হয়নি, হয়ে উঠেছে গ্রামীণ ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। "এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। এখানেই হল ঢোঁড়াই-রামের আবির্ভাব আমার মনে। এ যুগে মহাকাব্য অচল কিনা সে প্রশ্ন আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। কেননা আমার কাজ ছিল শুধু পুরনো মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোঁড়াই-রামকে বাঁধানো।"[১৯]

আদিকাব্যের বিষয় ছিল পরাবতার শ্রীরামচন্দ্র। অনেককাল পরে সেই পুণ্যচরিত হল ভক্তকবি তুলসীদাসের ধ্যানের ও রচনার প্রেরণা। কালের অগ্রগতি স্তব্ধ হয় না। মহামানব আজ সাধারণ মানুষের সাধারণ ধ্যান, জ্ঞান ও জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। একালের জীবনরসিক তাই এক ধরনের মানবরসিক, তিনি সাধারণ মানুষের রূপকার। অবিচ্ছিন্ন বিমূর্ত মানুষ নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আলো-ছায়ার স্রোতে দোলায়িত এক সহজ বিশিষ্ট সত্তা। তাই ঢোঁড়াই, লেখকের ভাষায়, "পাড়ারই লোক।" সতীনাথ তাঁর ডায়েরিতে ঢোঁড়াই-রামের কথাই বলেছেন, জানিয়েছেন, "আমার কাজ হল চেনা ঢোঁড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে সে সারাদেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।"[২০]

জিরানিয়া (পূর্ণিয়া) শহর থেকে চার মাইল দূরে পাকী বা কোশী-শিলিগুড়ি রোডের ধারে অবস্থিত তাতমাটুলি। এই তাতমাটুলি বস্তি ও সমাজটা কী রকম, তা সতীনাথ খুব ভালভাবে জানতেন। এই সমাজ অচল, অনড়, স্রোতহীন, বদ্ধ জলা। তাতে বাইরের স্রোত প্রবেশের কোনো পথ নেই। রোজা (গুণীনের প্রতি ভরসা), রোজগার (ঘরামীর কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ) আর রামায়ণ (তুলসীদাসী রামায়ণে অনড় বিশ্বাস ও জীবনের পদে পদে তার ব্যবহার) নিয়েই তাদের জীবন। ১৯১৫—৪৫-এর মধ্যে এই অনড় অচল সমাজ বদলায়নি। এখনও বিশেষ বদলায়নি। "ফরশা কাপড় পরা লোক দেখলে ··কোমরে ঘুনসি-বাঁধা ল্যাংটা ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়।"[২১] খুব প্রয়োজন না পড়লে তাতমারা তাদের বস্তির বাইরে যায় না। এই অনড় অচল কুসংস্কারাচ্ছন্ন গণ্ডীবদ্ধ তাতমাটুলির ছেলে ঢোঁড়াই। সে এই সমাজের নড়বড়ে কাঠামোতে আঘাত হেনেছে একের পর এক।

তাতমাটুলির সমাজ যেন অনড়, অচল। কারণ এই গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তন এত মন্থর, এত সূক্ষ্ম যে তা স্পষ্টভাবে দেখানো যায় না। আর সে কারণেই লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন সূক্ষ্মভাবে, আবছাভাবে। এই সমাজে দারোগা সাহেবের সঙ্গে বা হাকিমের সঙ্গে কথা বলাটা এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এই সমাজের লোকেরা একটা 'পোস্কাট' লিখতে বাইরের জগতের সাহায্য নেয়, দল বেঁধে 'পোস্কাট' ফেলতে পোস্টাপিসে যায়। এই সমাজে হাকিমের চাপরাশী বাবুলাল ও সামুয়র উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি, সম্ভ্রম ও ভীতির পাত্র। এই সমাজে 'গ্রামীণ পরিবর্তন' এত সূক্ষ্ম যে স্পষ্টভাবে মোটাদাগে ধরিয়ে দেওয়া কঠিন। চড়া রঙে মোটা তুলির আঁচড়ে নয়, আবছা রঙে, সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে লেখক তা দেখিয়েছেন। এই পরিবর্তনের জীবন্ত উদাহরণ—ঢোঁড়াই। বিদেশী কালেক্টর সাহেব ওরফে 'কলস্টর' বা দেশী দারোগা তো দূরের কথা, কনস্টেবলকেও তাতমারা সমীহ করে। দারোগার ধমকিতেও যে ছেলে ঘাবড়ায় না, তাকে তাতমা-মহতোরা ঘাঁটায় না। তাতমাদের বুদ্ধি আর সাহস কতটা তা নিজেরাই বলে,

"ঘর বৈঠে বুদ্ধ পঁয়তিস, রাই চলতে বুদ্ধ পাঁচ, কচহরী গয়ে তো একো ন সুঝে, যো হাকিম কহে সো সচ। (বাড়িতে থাকলে বুদ্ধি থাকে পঁয়ত্রিশ, পথে বেরুলে বুদ্ধি হয়ে যায় পাঁচ; কাছারী পৌঁছে একও দেখতে পায় না, যা হাকিম বলে তাই সত্যি মনে হয়)।"[২২]

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' কোশীনদী বিধৌত জিরানিয়া জেলার প্রকৃতি আর মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চাষবাস, হাটবাজার, জমিদার-মহাজন-পুলিশের অত্যাচারের নানা ঘটনা, আগস্ট বিপ্লবের নানা টুকরো টুকরো ছবি, ভীরু নিরীহ নির্বোধ অসহায় লোভী মানুষগুলির ভুলভ্রান্তি দুর্বলতার নানা ছবি—সব মিলিয়ে একটি জগৎ আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

দেহাতী মাটির গন্ধে, গাছ-লতাপাতার ঘ্রাণে, গ্রাম্য নরনারীর চরিত্রে, সরল বিশ্বাস, ধর্মবোধ, সংস্কার, আচার-আচরণে যে পরিমণ্ডল লেখক 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' চিত্রিত করেছেন, তা শুধু পূর্ণিয়া অঞ্চলেরই গ্রামজীবনের রূপ নয়, সমগ্র ভারতীয় গ্রামজীবনের অকৃত্রিম রূপ। উত্তর বিহারের লোকজীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তির সঙ্গে সতীনাথ বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। তাতমা, ধাঙ্গড়, কোয়েরী, সাঁওতাল প্রভৃতি নিচুতলার সম্প্রদায়ের গরীব মানুষদের জীবন-যাত্রা প্রণালী, তাদের আচার-প্রথা-অভ্যাস, তাদের সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের মধ্যে প্রচলিত তুক-তাক, ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস, তাদের শব্দব্যবহার বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রবাদ ও প্রবচন—সবকিছুই লেখক খুব কাছের থেকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এর পিছনে আছে রাজনৈতিক কর্মী সতীনাথের উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা। সবচেয়ে বড় কথা সতীনাথের প্রবল অনুভূতি ও সহমর্মিতা ছিল। তাই তিনি তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চলের অকৃত্রিম রূপকে তুলে ধরেছেন।

এই পরিবেশ প্রাধান্যই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর আসল বৈশিষ্ট্য। আর তা থেকেই আমরা এই উপন্যাসকে 'আঞ্চলিক' উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করি। আঞ্চলিক উপন্যাসের সব উপাদানই এই উপন্যাসে বর্তমান। অর্থাৎ সতীনাথ যে অঞ্চলের পটভূমিতে এই উপন্যাস রচনা করেছেন সে অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা ছিল। তাছাড়া এই অঞ্চলের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতিও ছিল। তাই 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' সতীনাথ আমাদের কাছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতাবোধকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

"উত্তর বিহারের শিক্ষাবর্জিত, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের ভীরু চাষী, ক্ষেত-মজুর, দিনমজুর, মহাজন-জোতদার সম্প্রদায়ের কাছে গানহীবাবা (মহাত্মাজী) নামটি কীভাবে পরিচিত হয়ে উঠল, যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন কীভাবে ভীরু মানুষগুলিকে বদলে দিল, তার জীবন চিত্র এ উপন্যাসে আছে।"[২৩]

'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর প্রতি ছত্রে উত্তর বিহারের পুর্ণিয়া অঞ্চলের, গ্রামাঞ্চলে কোশীনদীর ধুলোমাটির স্পর্শ ও লতাপাতা গাছের গন্ধ পাওয়া যায়। ঢোঁড়াই চরিত বেড়ে উঠেছে এই পরিবেশে, তার গায়ে লেগে আছে গ্রামের ধুলোমাটির গন্ধ।

জিরানিয়া বিহারের এক মফস্বল শহর। সেখান থেকে চার মাইল দূরে তাতমাটুলি:

"বোধ হয় তাৎমারা জাতে তাঁতি। তারা যখন প্রথম আসে, তখন খালি একজনের কাছে ছিল একটা ভাঙাচোরা গোছের গামছা বোনার তাঁত। দ্বারভাঙ্গা জেলার রোশরা গ্রামের কাছ থেকে অনেকদিন আগে এখানে এসেছিল দল বেঁধে—পেটের ধান্ধায়।" এইভাবেই কাহিনী শুরু করেছেন একটা সম্প্রদায়ের নতুন স্থানে বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে, নাম হয় তাতমাটুলি। তাতমাটুলির লোকেরা তাঁতি হলেও তাদের তাঁত বুনতে কেউ কোনদিন দেখেনি, তারা চাষের কাজও করে না। এখানকার তাতমাদের বৃত্তি কুয়োর বালি ছাঁকা আর ঘরামীর কাজ করা। তাতমাটুলির পাশেই ধাঙ্গড়টুলি। মাঝখান দিয়ে কাশী-শিলিগুড়ি পাকা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার দুধারে দুই সম্প্রদায়ের বাস। পাকা রাস্তাটি যেন দুটি সম্প্রদায়ের হৃদয়েরও বিচ্ছেদ-রেখা। ঘরামীর কাজ করা তাতমা আর মালীর কাজ করা ধাঙ্গড়, দুই সম্প্রদায়ের টুলি বা বস্তির জীবনের সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের নিবিড় সম্পর্ক থেকেই আমরা উত্তর বিহারের দেহাতের নিচুতলার মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাই। এই দুই পাড়ায় বাস তাতমা আর ধাঙ্গড়দের, তাতমারা হিন্দু, কথায় কথায় রামচরিত-মানসের দোহাই দেয়। ধাঙ্গড়রা অনেকেই খ্রীস্টান, তাদের বৃত্তি—সাহেব বাড়িতে মালীর কাজ বা মজুরের কাজ। ধাঙ্গড়রা তাতমাদের বলে 'নোংরা জানোয়ার' কারণ স্নানের বালাই তাদের নেই। তাতমারা ধাঙ্গড়দের বলে 'বুড়বক কিরিস্তান' (বোকা খ্রীস্টান)।

এই তাতমাটুলির বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই। তার বয়স যখন বছর দেড়েক তখন তার বাপ মারা যায়। সে হল ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের কথা। বুধনী বেশিদিন বিধবা রইল না, তাদের সম্প্রদায়ে সে রীতি নেই। সে বিয়ে করল বাবুলালকে। পিতৃহারা জননী-পরিত্যক্ত ঢোঁড়াই মানুষ হতে থাকে গ্রামের দেবস্থানের পূজারী বৌকা বাওয়ার কাছে। এই ঢোঁড়াই কীভাবে বড় হল, সংকীর্ণ গ্রাম-সীমানার বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীকে চিনল, বিবাহ করল বিদেশিয়া (পশ্চিমা)

মেয়ে রামিয়াকে, বিবাহ বিচ্ছেদ হল, কীভাবে গানহী বাওয়ার বার্তা (গান্ধী মহারাজের সংবাদ) পেয়ে তাদের সংকীর্ণ সমাজ উথাল-পাথাল হয়ে উঠল, কীভাবে সত্যি সত্যি গান্ধীজীর প্রভাবে বিহারের অনুন্নত নিপীড়িত গ্রামবাসীরা এক নবজীবনের আস্বাদ পেল সবই লেখক অন্তরঙ্গভাবে উপস্থিত করেছেন।[২৪]

এই নিপীড়িত অনুন্নত ভীরু সম্প্রদায়ের কাছে 'কলস্টর' (কালেক্টর) সাহেবই 'সরকার'। 'মহাত্মাজী'র চেলারা মরণাধারের পুলের কাছে নাবাল জমি নিমক তৈরীর মহলা দেবার জন্য বেছেছিল। এ সেই বিখ্যাত লবণ আন্দোলন। পরদিন সকালেই পুলিশ আর 'রংরেজী' টুপিপরা 'হাকিম' হাজির। সবাই ভীত কম্পিত। 'সরকার মা বাপ'। এই ভয় আত্মাবমাননা থেকে উঠে দাঁড়াল ঢোঁড়াই। 'কংগ্রেসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে কীভাবে সে মহাত্মাজীর চেলা বনে গেল, তারই কাহিনী' 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।

ঢোঁড়াই-এর জীবন আখ্যানের মাধ্যমে সতীনাথ ভাদুড়ী এক অনুন্নত সম্প্রদায়ের জাগরণের কথা বলেছেন। রামিয়ার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে ঢোঁড়াই তার গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, পিছনে ফেলে রাখে তার পুরনো জীবন। উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে ঢোঁড়াই-এর নবজীবনের কাহিনী। নতুন পরিবেশে নতুন মানুষদের মধ্যে ঢোঁড়াই-এর যে নবজীবন শুরু হয়, সেখানে তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে ছাপিয়ে উঠেছে দেশচেতনা। কংগ্রেসের কর্মী ঢোঁড়াই এগিয়ে চলেছে নতুন পথে। তবু ফিরে ফিরে মনে পড়ে তার মায়ের কথা, গাঁয়ের কথা, আশ্রয়দাতা 'বৌকা বাওয়া'র কথা, বিশ্বাসঘাতিনী রামিয়ার কথা। ঢোঁড়াই-এর আন্তর জীবনের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ 'ঢোঁড়াই চরিত মানস।'[২৫]

সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' কাহিনীর অধ্যায়গুলি হিন্দী সন্ত-কবি তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে'র অনুকরণে আদিকাণ্ড, বাল্যকাণ্ড নামকরণ করেছেন। ঠিক একইভাবে পঞ্চায়েত কাণ্ড, রামিয়া কাণ্ড (প্রথম চরণ), সাগিয়া কাণ্ড, লঙ্কা কাণ্ড ও হতাশা কাণ্ড (দ্বিতীয় চরণ) এই সপ্তকাণ্ডের বর্ণনা করেছেন। তুলসীদাসের রামচরিত মানসের দোঁহা এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো। বিহারের লোকজীবনকে পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে গিয়ে তুলসীদাসী রামায়ণের ব্যবহার সঙ্গতভাবেই লেখকের কাছে অনিবার্য বলে মনে হয়েছিল। কারণ শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। এদেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়ণতার কাঠামোটি তিনি ব্যবহার করেছেন। তাই এ যুগের উপেক্ষিত অনাদৃত গরীব সাধারণ

মানুষের জীবন-উপকরণ দিয়ে লেখক নব রামায়ণ রচনা করতে চেয়েছিলেন আর সেই নব রামায়ণের নায়ক হল নির্যাতিত গরীব শ্রেণীর প্রতিনিধি তাতমা কুলোদ্ভূত ঢোঁড়াই।

"রামায়ণের ট্রাডিশন ভারতের লোকের মজ্জায় মজ্জায়।"[২৬]

"Ramayana, Mahabharata, and Puranas, present the psychology and character, of our nation, as also its aspirations, blemishes and follies."[২৭]

"যেখানে সঙ্কট আসে, বাছাবাছির সময় আসে, তখন আমাদের লোক রামায়ণ মহাভারতে পুরাণে মনের মতো একটা কাহিনীর উপদেশ পেলে বর্তে যায়—খোঁজে। ওসব বইয়ে যা খোঁজ, তাই পাওয়া যায়।"[২৮]

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের জগৎ জিরানিয়ার শহুরে লোকজন আর দুই টুলি তাতমা আর ধাঙ্গড়দের লোকজনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। তাতমা আর ধাঙ্গড় এই দুই সম্প্রদায়ের বাসস্থানের মধ্য দিয়ে চলেছে 'পাক্কী' কোশী-শিলিগুড়ি রোড—দুটি সম্প্রদায়ের হৃদয়েরও বিচ্ছেদরেখা। তবু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে—তা হল বিবাদের। সমগ্র উপন্যাসটি নানা চরিত্র আর অজস্র ঘটনার মিছিল—বৌকা বাওয়া, রেবণগুণী, ধনুয়া মহতো রতিয়া ছড়িদার, বাবুলাল চাপরাশী, জোয়ান ছোকরার দল (ঢোঁড়াই, শনিচরা, বিরসা, শুক্রা, এতোয়ারী), রামিয়া, ফুলঝরিয়া, ঢোঁড়াই দুখিয়ার মা বুধনী, মহতো-গিন্নী গুদরাই (প্রথম চরণ), গিরিধারী (গিধর) মণ্ডল, কানোয়া মুসহর, বুড়াহাদাদা, লছুয়া চৌকিদার, বাবুসাহেব বচ্চন সিং, তার দুই ছেলে অনোখীবাবু আর লাডলীবাবু, বচ্চন সিং, গোমস্তাজী, মুন্সিজী, কোয়েরীটোলার ছোকরার দল (পরসাচ্চি, রামরূপ, গনৌরী), বুড়ী মোসম্মত, তার মেয়ে সাগিয়া, সাঁওতালটুলির লোকেরা, লোন্টিয়ারের দল, (মহাত্মাজীর ছোট চেলাদের দল), আধিয়াদারেরা, কোশীনদীর সন্তান সাঁওতাল জোয়ানের দল, সত্যিয়াগিরা (সত্যাগ্রহ)-কারী বলন্টিয়র, হাকিম, দারোগা সাহেব, আজাদ দস্তা ও ক্রান্তি-দলের কর্মীরা (ভোপতলাল ওরফে গান্ধী, বিসুন শুকলা ওরফে জওয়াহর, বলন্টিয়রজী ওরফে প্যাটেল, বাচিতর সিং ওরফে আজাদ, মিলিটারি-ফেরৎ কনৌজী ব্রাহ্মণ সর্দার), জিরানিয়ার আশ্রমের মাস্টার সাহেব, এণ্টনি, কান্তলাল।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় এ উপন্যাসে বিহারের অনগ্রসর গ্রামীণ সমাজের

একটি যথাযথ রূপ সতীনাথ তুলে ধরতে পেরেছেন। মানুষ ও তার পরিবেশ কিভাবে পরস্পর পরস্পরকে বদলায়—তা তিনি দেখিয়েছেন এ উপন্যাসে। ঢোঁড়াইকে কেন্দ্র করে লেখক সমগ্র অঞ্চলের গোষ্ঠীমানুষ এবং ব্যক্তিমানুষের জীবন্ত পরিচয় দিয়েছেন। রামায়ণের পৌরাণিক চিন্তা-ভাবনা যে অঞ্চলের জীবন-পরিবেশের উপর সর্বদা সঞ্চরণশীল তাদের জীবনকথাকে সাহিত্যে রূপদান করতে গিয়ে রামায়ণের আদর্শে কাহিনী সাজিয়ে লেখক ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকেই চিহ্নিত করেছেন। উপন্যাসের form সম্পর্কে এক প্রসিদ্ধ সমালোচক মন্তব্য করেছেন—"The best form is that which makes the most of its subject, there is not other defination of the meaning of form in fiction."[২৯]

'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' সতীনাথ যে এই form ব্যবহার করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এই form তাঁর কথনীয় বিষয়ের বাহন হয়ে উঠেছে অর্থাৎ পরিবেশের প্রভাবে গোষ্ঠীমানুষের পরিবর্তনশীলতাকে যেমন তিনি দেখিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তিমানুষের পরিবর্তনকেও এঁকেছেন নিখুঁতভাবে। আবার ব্যক্তিমানুষ তথা গোষ্ঠীমানুষের হাতে কিভাবে পরিবেশ পাল্টায়, এ উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় তাও লক্ষ্য করা যায়।[৩০] কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এসব তত্ত্ব নিছক 'থিয়োরী' হিসাবে উপন্যাসের মধ্যে আরোপিত হয়েছে বলে মনে হয় না। উপন্যাসের পটভূমি, প্রকৃতি-চিত্র, কাহিনী, চরিত্র—সবকিছুর সঙ্গে তা একাত্মতা অর্জন করেছে। শৈশব, বাল্য এবং যৌবনের পরিবেশ থেকে পরিবেশান্তরে নিক্ষিপ্ত হতে হতে ঢোঁড়াই-এর যন্ত্রণাময় আত্মানুসন্ধানের মধ্যে যে আর্তি প্রকাশিত হয়েছে, তা শুধু ব্যক্তি ঢোঁড়াই বা কোনো গোষ্ঠীমানুষের একক প্রতিনিধির মর্মকথা নয়, শাশ্বত মানুষের জীবন-সত্যই তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বিহারের গ্রাম্যজীবনের সর্বাঙ্গীণ আঞ্চলিকতার পটভূমিতে সতীনাথ মানবজীবনের চিরন্তন উপলব্ধিকেই ভাষা দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুও তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মৈলা আঁচল'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"য়হ হৈ 'মৈলা আঁচল', এক আঞ্চলিক উপন্যাস। কঁথানক হৈ পূর্ণিয়া। পূর্ণিয়া বিহার রাজ্য কা এক জিলা হৈ, ইসকে এক ঔর হৈ নেপাল দুসরী ঔর পাকিস্থান ঔর পশ্চিমী বঙ্গাল। বিভিন্ন সীমারেখায়োঁ সে ইসকী বনাবট

মুকম্মল হো জাতী হৈ, যব হম দক্ষিণ মে সাঁওতাল পরগণা ঔর পশ্চিম মে মিথিলা কী সীমারেখায়েঁ খীঁচ দেতে হৈঁ। মৈনে ইসকে এক হিস্‌সে কে এক হী গাঁও কো পিছড়ে গাঁও কা প্রতীক মানকর ইস উপন্যাস কা কথাক্ষেত্র বনায়া হৈ। ইসমে ফুল ভী হৈ, শূল ভী হৈ, ধূল ভী হৈ, গুলাল ভী, কীচড় ভী হৈ, চন্দন ভী, সুন্দরতা ভী হৈ, কুরূপতা ভী—মৈ কিসী সে ভী দামন বচাকর নিকল নহী পায়া।"৩১

'মৈলা আঁচল' হিন্দী সাহিত্যের সর্বাধিক আঞ্চলিক লক্ষণাকান্ত উপন্যাস। মানুষ ও প্রকৃতির সুগভীর একাত্মতা এবং বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞাত জনজীবনের যে নিবিড় অন্তরঙ্গ চিত্র এই উপন্যাসে পাই তার তুলনা হিন্দী কথাসাহিত্যে বিরল। 'রেণু' 'এ উপন্যাসে কোন ব্যক্তিজীবনকে প্রাধান্য দেননি, এক বিশিষ্ট সমাজজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে পূর্ণিয়া জেলার মেরীগঞ্জ অঞ্চলের গোষ্ঠীমানুষ তার আদিম প্রবৃত্তি, যুগসঞ্চিত সংস্কার এবং বংশানুক্রমিক জীবিকা অবলম্বন করেই চিরকালের মানুষ। তাই বলা যায় যে রেণু বিশেষভাবে পূর্ণিয়া অঞ্চলের কথাকোবিদ্ হয়েও সমগ্র ভারতের গ্রামজীবনের জীবনশিল্পী।

প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"In spite of the loving exactitude with which he details the characteristic features of Wessex life, he never lets us forget that this Wessex life is part of the life of the whole human race and is inextricably connected with it.৩২

টমাস হার্ডির সম্পর্কে সমালোচকের এই মন্তব্য হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর ক্ষেত্রেও সুপ্রযোজ্য। এছাড়া আরও এক বিষয়ে টমাস হার্ডির সঙ্গে রেণুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই তাঁদের সাহিত্যে চিত্রিত জীবনাচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। শিশুকাল থেকেই হার্ডির মত রেণুও গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে অন্তরঙ্গ ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির পাশাপাশি অতিবাহিত করেছেন।

এই দরদী মানবশিল্পী তাঁর সংবেদনশীল নিরভিমানী মন নিয়ে উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের চিত্র অঙ্কন করেছেন। রেণু এই পূর্ণিয়া অঞ্চলেরই

ঔরাহী হিঙ্গনা গ্রামের নিবাসী ছিলেন। এই পূর্ণিয়া অঞ্চলের বিচিত্র ভৌগোলিক ও মানবিক সংস্কৃতির জগতে শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিবাহিত করেছেন। এই আঞ্চলিক পরিবেশ তাঁর সমগ্র চেতনায় অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চারপাশের ভূ-প্রকৃতি, বিচিত্র জনজীবন এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে। তাই এর স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে পূর্ণিয়া অঞ্চলের কৃষি-কেন্দ্রিক পল্লীসমাজের গার্হস্থ্য জীবনের ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সংস্কার-বিশ্বাস এবং সংসার-বন্ধনহীন সংস্কার মুক্তজীবনের রূপটি ধরা পড়েছে। আঞ্চলিক পটভূমিতে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখে প্রকৃতিও যেন অংশগ্রহণ করেছে। রেণু এই উপন্যাসের পটভূমি অত্যন্ত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে করেছেন। এই উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমি মেরীগঞ্জ গ্রাম। এই ছোট পটভূমির উপর ভিত্তি করে তিনি উত্তর বিহারের পল্লীজীবনের যে চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন তাতে গ্রামীণজীবনের মধ্য দিয়ে যুগ এবং জীবনবৈচিত্রের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

'মৈলা আঁচল' কোন এক বিশেষ ব্যক্তির বা বিশেষ পরিবারের কাহিনী নয়, উপন্যাসটি সম্পূর্ণ গ্রামের—সম্পূর্ণ যুগের—সম্পূর্ণ অঞ্চলের কাহিনী। উপন্যাসটিতে গ্রামের সমস্ত পথঘাট, গাছপালা, ক্ষেত-প্রান্তর, কোশী নদী, সব পরিবার, সব বস্তিকে (টোলী) একই সূত্রে বেঁধেছে। গ্রামে তিনটি প্রধান দল কায়স্থ, রাজপুত এবং যাদব (গোয়ালা)। বালদেব কংগ্রেসের নেতা এবং কালীচরণ সোশালিস্ট পার্টির। মঠের মহারাজ (মহন্ত) সেবাদাস, তাঁর শিষ্য (চেলা) রামদাস এবং দেবদাসী (কোঠারিন) লক্ষ্মী। জোতখী প্রাচীনপন্থী এবং বিভিন্ন জড়িবুটি ঔষধে বিশ্বাসী, আধুনিক ডাক্তারী ঔষধ-পত্রের বিরোধী। এঁদের অতিরিক্ত সাঁওতালরা আছেন যাঁরা এঁদের বস্তি থেকে দূরে থাকেন। এইরূপে 'মৈলা আঁচলের' কাহিনী অনেক উপকাহিনীতে বিস্তৃত তবে ডাঃ প্রশান্ত এবং কমলার কাহিনীই এই উপন্যাসের প্রধান কাহিনী বলা চলে। এঁদের কাহিনী ছাড়া বালদেব ও দেবদাসী লক্ষ্মী, কালীচরণ এবং মঙ্গলদেবীর কাহিনীও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে ডাঃ প্রশান্ত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। সে বিদেশী স্কলারশিপের মোহ ত্যাগ করে পূর্ণিয়া ও সাহরসা জেলায় বিশেষ করে

পূর্ব অঞ্চলে থেকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের সম্বন্ধে অনুসন্ধান (Research) করে মানুষকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের হাত থেকে মুক্তি দিতে চায়। এই অনাবিল আশাকে বুকে নিয়ে ডাঃ প্রশান্ত উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের এই মেরীগঞ্জ গ্রামে এসেছে। মাত্র সাতদিন থেকেই এই মেরীগঞ্জ গ্রামের সম্পর্কে তার একটা বিশেষ ধারণা হয়েছে—

"গাঁও কে লোগ বড়ে সীধে দিখতে হৈঁ। সীধে কা অর্থ যদি অপঢ়, অজ্ঞানী ঔর অন্ধবিশ্বাসী হো তো বাস্তব মে সীধে হৈঁ য়ে। জহাঁ তক সাংসারিক বুদ্ধি কা সওয়াল হৈ, য়ে হমারে ঔর তুম্হারে জৈসে লোগোঁ কো দিন মে পাঁচ বার ঠগ লেঙ্গে ঔর তারিফ য়হ হৈ কি তুম ঠগী জাকর ভী উনকী সরলতা পর মুগ্ধ হোনে কে লিয়ে মজবুর হো জাওগী। য়হ মেরা সির্ফ সাত দিন কা অনুভব হৈ। সম্ভব হৈ, পীছে চলকর মেরী ধারণা গলত সাবিত হো। মিথিলা ঔর বঙ্গালকে বীচ কা য়হ হিস্সা বাস্তব মে মনোহর হৈ। ঔরতেঁ সাধারণতঃ সুন্দর হোতী হৈ, উনকে স্বাস্থ্য ভী বুরে নহী।"[৩৩]

ডাঃ প্রশান্তের এই সাতদিনের অনুভব শুধু কয়েকটি দিনেরই নয়, ইহা এই অঞ্চলের চিরদিনের।

ডব্লু. জী. মার্টিনের স্ত্রী মেরীর নামকে কেন্দ্র করে পূর্ণিয়া জেলার এই গ্রামের নাম মেরীগঞ্জ। এই গ্রামের একদিকে নেপাল, অন্যদিকে পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম বাংলা, দক্ষিণে সাঁওতাল পরগণা ও পশ্চিমে মিথিলা। এই গ্রামের একমাত্র মালিক, একচ্ছত্র জমিদার তহসীলদারবাবু বিশ্বনাথ মল্লিক। কায়স্থ, রাজপুত, যাদব (গোয়ালা), ব্রাহ্মণ এবং বিভিন্ন টোলি বা বস্তি —পোলিয়াটোলি, তাঁতমা ছত্রী টোলি, ধনুকধারী ছত্রী টোলি, কুশবাহা ছত্রী টোলি, যদুবংশী ছত্রী টোলি, পহলোত ছত্রী টোলি, কুর্ম ছত্রী টোলি, অমাত্য, ব্রাহ্মণ টোলি এবং রবিদাস (চামার) টোলিতে বিভক্ত এই গ্রাম ভারতীয় যে-কোন অনুন্নত সমস্যাগ্রস্ত গ্রামের প্রতিনিধি। অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, অন্ধবিশ্বাস, আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত শোষণ, মঠ এবং সেবাদাসী, যৌন ব্যভিচার, ভূ-প্রকৃতি, জনজীবন, ধর্ম, উৎসব, অনুষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন লোকায়ত বৈশিষ্ট্য রূপায়িত করেছেন তাঁর এই 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে। পূর্ণিয়া অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা হলেও রেণু একথা স্বীকার করেছেন যে এই উপন্যাসের পরিবেশ ভারতের যে-কোন অনুন্নত গ্রামের প্রতীক।[৩৪]

ইউরোপীয় কথাসাহিত্যে, বিশেষ করে ইংরেজী উপন্যাসে আঞ্চলিক

জীবনের চিত্রণ অনেক লেখকের রচনাতেই লক্ষ্য করা যায়। জর্জ এলিয়ট, এমিল ব্রান্টি, জর্জ ব্যারো, জেন অস্টেন থেকে আরম্ভ করে টমাস হার্ডি প্রমুখ লেখকের রচনায় আঞ্চলিক জীবন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এঁদের মধ্যে আঞ্চলিক জীবনের রূপকার হিসাবে যিনি সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান তিনি টমাস হার্ডি। তার একটা বড় কারণ এই যে, তিনিই একমাত্র লেখক যিনি একটি বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিকে তাঁর প্রায় সমগ্র সাহিত্য-কর্মের জন্য বেছে নিয়েছেন। ওয়েসেক্স-এর পল্লী অঞ্চলই তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল উৎস। ঐ অঞ্চলেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, ওখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এখানকার গ্রামীণ পরিবেশ এবং অধিবাসীদের জীবনযাত্রার রূপটিকে তিনি দেখেছেন অত্যন্ত গভীরভাবে, দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থেকে—পরম মমতার সঙ্গে।[৩৫]

হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যে প্রেমচন্দ, বৃন্দাবনলাল বর্মা, উদয়শঙ্কর ভট্ট, অমৃতলাল নাগর, রাঙ্গেয় রাঘব, দেবেন্দ্র সত্যার্থী প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকেরা অনেক সময় আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রেমচন্দের বিষয়ে আচার্য হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মন্তব্য করেছেন :

"অগর আপ উত্তর ভারত কী সমস্ত জনতা কে আচার-বিচার, ভাষাভাও, রহন-সহন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ঔর সুঝ-বুঝ জাননা চাহতে হৈঁ, তো প্রেমচন্দ সে অচ্ছা পরিচায়ক আপকো নহী মিল্ সকতা।"[৩৬]

কিন্তু রেণু তাঁর সৃষ্ট 'মৈলা আঁচল'-এ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তাঁর পূর্ব-ঔপন্যাসিকেরা এমনকি প্রেমচন্দও উত্তর বিহারের যে পরিচয় দিয়েছেন তার চেয়ে কত গভীর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। উদয়শঙ্কর ভট্ট, অমৃতলাল নাগর, বৃন্দাবনলাল বর্মা এবং প্রেমচন্দ আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন একথা ঠিকই। কিন্তু এঁরা কেউই ফণীশ্বরনাথ রেণুর মতো নিজস্ব আঞ্চলিক সীমানায় আদ্যন্ত নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। তাঁর নিজস্ব পূর্ণিয়া অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত।

অনুরূপ বাংলা সাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতিমানেরা আঞ্চলিক সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তারাশঙ্কর আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন ; কিন্তু এঁরা কেউই সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো আঞ্চলিক

ফণী : ৭

উপন্যাস রচনা করেননি। কারণ বাংলা সাহিত্যে সতীনাথই একমাত্র লেখক, যিনি উত্তর বিহারের একটি বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিকে তাঁর প্রায় সমগ্র সাহিত্য-কর্মের জন্য বেছে নিয়েছেন। উত্তর বিহারের পল্লী অঞ্চলই তাঁর সাহিত্য-কর্মের মূল উৎস।

প্রকৃতির জীবন্ত রূপ ও তার সঙ্গে লেখকের নিবিড় পরিচয়ের সূত্রে ঐ বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে প্রায় সমগ্র সাহিত্যকর্ম গড়ে তোলার এই শিল্প-ধর্মটি লক্ষ্য করা যায় ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসেও। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখনীয় যে সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসে অঞ্চল-প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির যেমন নিবিড় একাত্মতা ঘটেছে, তেমনি অঞ্চল-প্রকৃতির একটি বিশেষ পটভূমিকায় উপন্যাসের চরিত্রের ব্যক্তিস্বরূপ এবং সামাজিক সত্তা—উভয়েরই প্রকাশ ঘটেছে। তবে একথা ঠিক যে উভয়ের উপন্যাসের মধ্যে আঞ্চলিক দিক দিয়ে সমতা থাকলেও মানব প্রকৃতির চরিত্র-চিত্রণে রেণু অপেক্ষা সতীনাথ ভাদুড়ী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সাম্প্রতিক-কালে বাংলা ও হিন্দী সামাজিক উপন্যাসে চরিত্রের ব্যক্তিস্বরূপের উপরই প্রায়শ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সমাজ সেখানে উপেক্ষিত থাকে। ফলে-সেই চরিত্রগুলি কোনো বিশেষ সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে না। পৃথিবীর যে-কোনো স্থানের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। কিন্তু সতীনাথ ও রেণুর উপন্যাসে যে নর-নারীর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, উত্তর বিহারের পূর্ণিয়ার বিশেষ আঞ্চলিক জীবনের পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের অন্য কোনো স্থানে স্থাপন করা সম্ভব নয়। মানুষের নিজস্ব পরিবেশই তার চরিত্রকে বিশিষ্ট করে তোলে, পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ বিকশিত হতে পারে না। সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসে উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চল এবং তার বিচিত্র অধিবাসীদের সম্পর্কের এই মূল রহস্যটি অতীব নিপুণতায় অঙ্কিত।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'মৈলা আঁচলে' ডাঃ প্রশান্ত এক মহৎ প্রেরণায় বিদেশী ফেলোশিপ ত্যাগ করে গ্রামে এসেছেন অথচ তিনি লোকের কাছে বিবেকহীন। গ্রামে হাসপাতাল তৈরির জন্য গ্রামের লোকেদের বিরোধিতা, জোতখীজীর (জ্যোতিষী) অন্ধবিশ্বাস এবং গ্রামের লোকদের অন্ধবিশ্বাসের প্রশ্রয় দেওয়া, মহন্ত রামদাস এবং লক্ষ্মী, সেবাদাস এবং লক্ষ্মী, বালদেব এবং লক্ষ্মী, কালীচরণ

ও রমলা খালাসী এবং ফুলিয়া ও ডাঃ প্রশান্তের সঙ্গে কমলীর প্রণয় এবং যৌন সম্পর্কের উপর উপন্যাসের কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। অপরদিকে আছে বিভিন্ন টোলি বা বস্তির রাজনীতি, কংগ্রেস এবং সোশালিষ্ট দলের রাজনীতি, সাঁওতাল এবং অন্য জাতের (যাঁরা সাঁওতাল নয়) সংঘর্ষ, জমিদার এবং ভূমিহীনের সংঘর্ষ, হিন্দু এবং মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তৃত বর্ণনা, এ ছাড়া কালীচরণ ও ডাঃ প্রশান্তর অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়া, স্বাধীনতালাভের পর নূতন দমননীতি, চুরি, ডাকাতি, খুন, নারী নির্যাতন, বাওনদাসের মত দেশভক্তের চক্রান্তে হত্যা বাওন দাসের আর্তস্বর 'ভারত মাতা রোয়ল রহী'[৩৭] ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনার পটভূমিতে 'মৈলা আঁচল' উপন্যাস রচিত।

আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে 'মৈলা অাঁচল'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম কাহিনীর আলোচনা করা যাক। 'মৈলা অাঁচল'-এ যত সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সবকিছুই উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমিত। ঘটনাধারার যেরূপ বর্ণনা রেণু করেছেন তার অনেক কিছুই স্থানীয় জলবায়ুর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। উপন্যাসটির আরম্ভ হয়েছে ম্যালেরিয়া কেন্দ্র হাসপাতালকে কেন্দ্র করে; যা, পূর্ণিয়ার মত স্থানের জন্য একান্ত আবশ্যক। কারণ যেখানে 'কৌয়ে (কাক) কো ভী বুখার (ম্যালেরিয়া জ্বর) হোতা হৈ।'[৩৮] দুঃখ ও দারিদ্র্যে নিরন্তর পীড়িত মানুষের মধ্যেও ক্ষণিকের আনন্দলাভের জন্য যে মনোরঞ্জনের দৃশ্য, উৎসব ইত্যাদির বর্ণনা এই উপন্যাসে রেণু করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জমির জন্য ঝগড়া, মারামারি করা, এমনকি জীবন নিয়ে দেওয়া; পরে কোন সভ্য শিক্ষিত লোকের হাতে পড়ে সবকিছু হারিয়ে ফেলা, বিচিত্র আইনের খেসারতে সবকিছু বিক্রি করে ফতুর হয়ে যাওয়া, এখানকার সাঁওতালদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এই উপন্যাসের প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই ভূমিহীন কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ, মজুর, মুটে ও কুলি—অশিক্ষিত, অন্ধ কুসংস্কারগ্রস্ত, সরল-শান্ত; জমিদারের চক্রান্তে বিপর্যস্ত বা জমিদারের হাতের পুতুল। মেরীগঞ্জ গ্রামের অধিবাসীরা নানা জাতিতে বিভক্ত। বিশিষ্ট এক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিজের নিজের জীবন অতিবাহিত করেন।

বিহারের গ্রামাঞ্চলের এই প্রায় আদিম জনপদ-জীবনকে ফণীশ্বরনাথ রেণু দেখেছেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে। তাঁর সমগ্র সাহিত্যেই পূর্ণিয়া জেলার

মানুষ ও প্রকৃতি কোনো না কোনো ভাবে উপস্থিত হয়েছে। বাঙালী-বিহারীর মিশ্র সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা এই সীমান্ত জেলার 'ঔরাহী হিঙ্গনা' গ্রামে ফণীশ্বরনাথের জন্ম, এখানেই তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবন গড়ে উঠেছে। সুতরাং জন্মসূত্রেই তিনি পূর্ণিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। তাই 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে এই জেলার অধিবাসীদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, অভাব-অনটন, অশিক্ষা-অজ্ঞতা, সংস্কার-কুসংস্কার, শোষক-শোষিত, পীড়ন-উৎপীড়ন, সব কিছুকে যথাযথ তুলে ধরেছেন।

সদ্য স্বাধীনতালাভের পরমুহূর্তে পূর্ণিয়া জেলার বিকৃত রাজনীতি ও সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় রেণু 'মৈলা আঁচল' উপন্যাস রচনা করেছেন। মেরীগঞ্জের রাজনৈতিক গতিবিধির উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, একমাত্র বাওনদাস ও কালীচরণের কাজকর্ম ছাড়া অন্য কারো রাজনৈতিক কাজকর্ম ঠিক দেশসেবার জন্য রাজনীতি নয়, নিজের স্বার্থের জন্য রাজনীতি। কংগ্রেসের মত এত বড় সংস্থায় (পার্টিতে) বাওনদাস, কালীচরণের মত এক দুজন লোক কি করতে পারে? তাই শুধু মেরীগঞ্জেই নয়, সমগ্র ভারতেই অর্থবান পুঁজিপতিরা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কংগ্রেস দলকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে। মেরীগঞ্জের কংগ্রেস দল বিশ্বনাথপ্রসাদের হাতে। তিনি পূর্ণিয়া জেলার কংগ্রেস শাখার সভাপতি, অপরদিকে পুরাতন দেশদ্রোহী সাগরমল স্বাধীনতার পর নরপতনগরের সভাপতি। দুলারচন্দ কাপড়া একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী যিনি বাওনদাসের মত দেশভক্তকে হত্যা করতে দ্বিধা করেন না। কারণ বাওনদাস কাপড়াকে স্মাগলিং করতে বাধা দিয়েছিলেন, এ ছাড়া অন্যান্য কংগ্রেসী কর্মকর্তারাও কংগ্রেস (সত্তা) অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ পদ পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া মারামারি করতে আরম্ভ করেন। এই বিশেষ পদ ও অধিকার পাওয়ার রোগ এতটা সংক্রমিত হয় যে সে সময় অন্যান্য পার্টিও প্রভাবিত হয়। তাই বাওনদাস ঠিকই বলেন:

"সব পার্টি সমান। সব মেলে—মন্তরী (মন্ত্রী) হোনা চাহতে হৈঁ। বালদেব। দেশ কা কাম···জো ভী করতে হৈঁ এক হী লোভ সে।"[৩৯]

রাজনীতির এই বিকৃত রূপকে দেখে সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকে সফল স্বাধীনতা—প্রকৃত স্বাধীনতা বলে মানতে পারেননি। তাই মেরীগঞ্জের স্বাধীনতা উৎসবের মিছিলে ঔরাহী হিঙ্গনার এক সমাজবাদী শ্লোগান দিয়ে ওঠে: "য়হ আজাদী ঝুঁটি হৈ।"[৪০]

এই সমাজবাদী ব্যক্তি অন্য কেউ নয়, স্বয়ং লেখক। যিনি নিজের জন্মগ্রাম ঔরাহী হিঙ্গনা থেকে মেরীগঞ্জে এসে পৌছেছেন। মেরীগঞ্জের মত ঔরাহী হিঙ্গনাও পুর্ণিয়া জেলার পূর্ব অঞ্চলের গ্রাম। এই প্রসঙ্গে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসের' একটা অংশের কথা উল্লেখ করা যায়—'যখন শ্রীরামচন্দ্র যমুনার ওপারে পৌছান, তখন তার কাছাকাছি রাজাপুর নিবাসী তুলসীদাস তাঁকে প্রণাম করতে এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ ভক্তের রূপে যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।'[৪১]

স্বাধীনতার পর ভারতীয় গ্রামে বিশেষ করে মেরীগঞ্জের আশেপাশে রাজনৈতিক দলের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হয়েছে, তার সুন্দর বর্ণনা রেণু 'মৈলা আঁচলে' করেছেন, বালদেব স্বরাজী (কংগ্রেসী)—জয়হিন্দ বোলতা হে। প্রথমে বালদেবকে দড়িতে বেঁধে গ্রামের লোকেরা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিসে অফিসারের কাছে নিয়ে গেছে ম্যালেরিয়া সেণ্টারের জমির জন্য। যাদব টোলির লোকদের দৃষ্টিতে বালদেব একজন অপরাধী কিন্তু পরে যখন সে কাপড়ের কোটা, পারমিট ও রেশন দোকানের অধিকার পায়, গ্রামের লোকেরা তার আগে পিছে ঘুরতে থাকে। সে এই সুযোগে কাছাকাছি গ্রামের কিছু লোককে কংগ্রেসের মেম্বার করে নেয়। কালীচরণ সোশালিস্ট। সে গ্রামের মধ্যে নিজের দলের প্রচার করে। সোশালিস্ট পার্টির সভা হয়। শহর থেকে সৈনিকজী এবং 'লালপতাকা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক চিনগারীজী সেই সভায় ভাষণ দেন। তাঁরা বলেন সোশালিস্ট দলের একমাত্র উদ্দেশ্য পুঁজিবাদের বিনাশ, তাঁরা শ্লোগান দেন:

জো রোয়েগা সো কাটেগা।
(যারাই কৃষিকাজ করবে ফসল তাদের)
জো কাটেগা সো বাঁটেগা।
(যারা ফসল নেবে তারা ভাগ দেবে)।[৪২]

মেরীগঞ্জের জনতার দৃষ্টিতে কালীচরণের স্থান অনেক উঁচুতে। বাসুদেবও তার সঙ্গী হয়ে পড়ে। ডাক্তার প্রশান্তও কালীচরণকে সমর্থন করেন। ফলে ডাক্তার প্রশান্তও কালীচরণের সঙ্গে বন্দী হয়ে যান:

"ডাক্তার সাহেব গিরস্ত। জুলুম বাত। সাঁওতালোঁ কোঁ ডাক্তার সাহেব নে হী ভড়কায়া হৈ গাঁও মে হৈজা ভী উহোনে হী ফৈলায়া হে। গাঁও কে লোগো কো কমজোর কর দিয়া হৈ। কোমোনিস্ট পার্টি কা হৈ ইসলিয়ে গিরস্ত হো গয়া।"[৪৩]

ফণীশ্বরনাথ রেণু মেরীগঞ্জের আর্থিক পরিস্থিতিরও এক সজীব চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে। এই গ্রামের একদিকে মালিকটোলি অন্যদিকে শ্রমিকটোলি। একদিকে শোষক, অপরদিকে শোষিত। এই মালিকটোলির বিশ্বনাথপ্রসাদ, রামকিরপাল সিং এবং খেলাবন যাদবের হাতেই গ্রামের প্রায় সব জমি। স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেছে কিন্তু এরা তবু জমিদার। কেমন করে গরীবকে শোষণ করতে হয় এরা জানে। আইনকে কলা দেখিয়ে গরীবের জমি ছিনিয়ে নেওয়ার চতুরতা এদের করায়ত্ত। অর্থ ও ক্ষমতার মদমত্ততায় অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীদের এরা জোর করে উপভোগ করে। এরা বড় কৃষক। এদের নিজস্ব মজদুরটোলি আছে। এই মজদুরদের অবস্থা অনেকটা কলুর বলদের মত। এরা এত কম মজুরী পায় যাতে দুবেলা পেট ভরে খাওয়া অসম্ভব। তাঁতমা, গহলোত এবং পোলিয়াটোলির লোকেরা কোনদিন পুরি জিলাপি চাখেনি, তাই মহন্ত সেবাদাস যখন 'পুরি জিলেবী'র কথা ঘোষণা করেছেন তখন স্বাভাবিক কারণেই ধর্মভ্রষ্ট, জাতিভ্রষ্ট. ব্যভিচারী মহন্তের প্রতি সমর্থন বেড়ে যায়। এইরূপে মহন্ত রামদাস যখন জাতিকে ভাত দিতে চেয়েছেন অসতী নীচুজাতের রামপিয়রিয়াকে সেবাদাসীরূপে সকলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সে সময় গ্রামের লোকেরা ভেবেছে :

"রামপিয়রিয়া দাসিন বন সকতী হে। জাতি কী বন্দিশ মে জরা ঢিল দেনে সে সব গড়বড়া জাতা হে। ইসী তরহ বরাবর পঞ্চায়েত হোতী রহে তব তো ? অভী য়হ ভোজ তো ফোকট মেঁ চলা যাতা হাথ সে।"[৪৪]

গ্রামের লোকদের এই বিচিত্র কাণ্ডকারখানা দেখে ডাক্তার প্রশান্ত আশ্চর্য হননি, তিনি অনুভব করেছেন এক গভীর সত্যকে :

"পেট। য়হী ইনকী বড়ী কমজোরী হে। মৌজুদা সামাজিক ন্যায় বিধান নে, ইম্বে অপনে সৈকড়োঁ বাজুয়োঁ মেঁ জকড় কর ঐসা লাচার কর রখা হৈ কি যে চুঁ তক নহী কর সকতে।"[৪৫]

দারিদ্র্যের ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে গ্রামের বড়লোক বাবুরা তাদের বৌ-ঝিদের মান-ইজ্জৎ লুটে নেয়। ফুলিয়া এবং সহদেব মিসর (মিশ্র)-এর এক প্রসঙ্গ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে প্রতিবেশী রমজুদাসের স্ত্রী ফুলিয়ার মাকে বলেছেন :

"আরে ফুলিয়া কী মায়ে, তুম লোগোঁ কো ন তো লাজ হৈ ঔর ন ধরম। কবতক জওয়ান বেটী কী কমাই পর লাল কিনারী বালী শাড়ী চমকায়োগী ?...

মানতী হুঁ কি জওয়ান বেবা (বিবাহযোগ্যা) বেটী ভুখার গায় কে বরাবর হৈ। মগর ইতনা মত ভুহো কি দেহ কা খুন ভী সুখ যায়।"[৪৬]

এরপর সহদেব মিসরকে অসংলগ্ন অবস্থায় ফুলিয়ার বাড়ীতে তত্রিমাটোলির যুবকেরা ধরে ফেলে এবং খুব মারধোর করে। কিন্তু ফুলিয়ার বাবা সহদেব মিসরকে কিছু বলতে পারে না কারণ সে সহদেব মিসরের (কর্জদার) কাছে ঋণী।

শুধু ফুলিয়ার বাবাই নয় মেরীগঞ্জ গ্রামের সব গরীব-মজুর-ছোট কৃষকই কোন না কোন বাবুর কর্জদার। আর তারা জানে যে বাবুরা তাদেরই বাড়ীর বৌ-ঝিদের নিয়ে ফূর্তি করে কিন্তু তারা নিরুপায়। বাধা দিলে ঋণের দায়ে নালিশ করে তাদের হাজতে পুরে দেবে। গরীবদের সাদা কাগজে বুড়ো আঙুলের টিপসই নিয়ে বাবুরা যে ঋণ (কর্জ) দেয় সে ঋণ কোনদিনই আর শোধ হয় না। তবুও তাদের আবার ঋণ নিতে হয়। সোশালিস্ট পার্টির নেতা কালীচরণ গরীবদের যখন আঙুলের টিপছাপ দিয়ে ঋণ নিতে মানা করে, বাবুরাও তখন একজোট হয়ে হোলির সময় ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সে সময় বিশ্বনাথপ্রসাদ ঋণ দেয়। সে ভাবে: "সাল মে তুগুনা হ্যা তিগনা ন সহী সওয়া হী সহী।'

তাছাড়া ওর কাছে পুরাতন কাগজ অনেক আছে যাতে এসব গরীবদের আঙুলের ছাপ আছে, তাহলে লোকসান কোথায়? ঠিক এইরকম সময়েই শহরের মধ্যেও যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার বর্ণনা করে মমতা ডাক্তার প্রশান্তকে লিখেছেন: "কালেঁ বাজারকে অন্ধেরে মে এক নঙ্গ ঢুনিয়া কী সৃষ্টি হো গই।"[৪৭]

দেশের এইরূপ বিকৃত পরিস্থিতিতে সমাজবাদীদের প্রচারের ফলে গ্রামের লোকদের মধ্যেও এক নূতন চেতনার উদ্ভব হয়েছে। কালীচরণ মেরীগঞ্জের জনগণকে জমিদারের এবং ব্যবসায়ীদের শোষণের সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে: "য়ে পুঁজিপতি ঔর জমিন্দার খটমলো ঔর মচ্ছরোঁ কী তরহ শোষক হৈ। ইসী লিয়ে বহুত সে মারয়াড়ীয়োঁকে নাম কে সাথ 'মল' লগা হুয়া হে ঔর জমিন্দারোঁ কে বচ্চে মিস্টার কহলাতে হেঁ। মিস্টর···মচ্ছর।"[৪৮]

স্বরাজের কথা বলতে বলতে দেশসেবার নামে যারা দিনে ডাকাতি করছে তাদেরকেও কালীচরণ বেশ ভালোভাবেই চিনতে পেরেছে এবং গ্রামের লোকেদের কাছে তাদের আসল রূপ তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

ডাক্তার প্রশান্ত মানুষকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর রোগ থেকে মুক্তি দিতে মেরীগঞ্জ এসেছে। কিন্তু এখানে এসে সে অনুভব করেছে এখানে মানুষ কোথায়? সবাই তো জানোয়ারের মতো জীবন অতিবাহিত করছে। তাই সে ভেবেছে:

"পহ্‌লে ইন জানবরোঁ কো ইন্সান বনানা হোগা। ইনকে রোগোঁ কী আসলী জড় তো গরীবী ঔর জহালত।"[৪৯] তাই ডাক্তার প্রশান্ত একদিন সহজভাবে কথাপ্রসঙ্গে কংগ্রেসসেবী তহসীলদার বিশ্বনাথপ্রসাদকে বলেছিল:

"জিস দিন ধনী, জমিন্দার, সেঠ ঔর মিলওয়ালোকো লোগ রহে চলতে কোড়ী (কুষ্ঠ) ঔর পাগল সমঝনে লগেঙ্গে উসী দিন অসল সুরাজ হো জায়েগা।"[৫০]

সেদিন ডাক্তার প্রশান্তের কথা বিশ্বনাথবাবু হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জামাতারূপে ডাক্তার প্রশান্তকে পেয়ে সেই সুদখোর বিশ্বনাথপ্রসাদই নূতন মালিক তাঁর নাতি নীলোৎপলের নামে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

"লোগোঁ সে কহ দো··হরেক পরিবার কো পাঁচ বিঘাকে দর সে জমিন লৌটা দুঙ্গাঁ।"[৫১]

নিজের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেইদিনই শত বিঘা জমি গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের দান করেছেন। তাঁর এই পরিবর্তন যে গ্রামীণ সমস্যা সমাধানের জন্য একটা বিরাট পরিবর্তন তাতে সন্দেহ নেই।

'মৈলা আঁচলে' যে সামাজিক পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণ অসামাজিক। মেরীগঞ্জ গ্রামে বারো জাতির বাস। সেখানে মুসলমান একটাও নেই। দেশ বিভাজনের সময় সেখানকার লোকেরা ভেবেছে:

"বড়ে ভাগ সে মেরীগঞ্জ বচ গয়া। দশ মুসলমান ভী হোতে তো পাকিস্তান-লে কর হী ছোড়তা।"[৫২]

কোন ছোটখাটো কাজের উপলক্ষে দু-একজন মুসলমান মাঝে মাঝে এই গ্রামে কখনও কখনও আসে। স্বাধীনতালাভের সময় যখন এই গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধে সে সময় এক গরীব মুসলমান জুমরাতির কাছে সুমরিত-দাস পাঁচ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। বালদেব এই হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গায় বিশেষ বিচলিত হয়েছে: "অন্ধের হো গয়া। একদম সব পগলা গয়ে হৈঁ।"[৫৩]

সে সময় সে গান গেয়ে উঠেছিল :

"অরে, চমকে মন্দিরয়া মেঁ চাঁদ।
মসজিদয়া মে বংশী বাজে ॥"[৫৪]

মেরীগঞ্জ গ্রামে হিন্দুরা অনেক টোলি বা বস্তিতে বিভক্ত। গহলোত, দুসাধ, তন্ত্রিমা ইত্যাদি। এদের মধ্যে যাদবদের সংখ্যাই অধিক। যাদবরা অধিক হওয়ার জন্য গ্রামের মধ্যে তাদের শক্তিও অধিক। তাছাড়া গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের দলে। কিন্তু যাদবদের এই অহঙ্কার রাজপুতটোলি ও ব্রাহ্মণটোলির কাছে অসহ্য। তাই রাজপুতটোলির হরগৌরী সিং 'গোয়ালা হোকর লীডরী' করছে বালদেবের উপর সন্তুষ্ট নয়। সে তার রাজপুত দলের লোকদের বুঝিয়েছে যদি এইরূপ পরিস্থিতি থাকে তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে যাদবেরা রাজপুতের মেয়েদের বিয়ে করতে চাইবে। তাই মহন্ত সেবাদাস যখন মন্দিরে ভোজ দিতে চেয়েছেন সে সময় রাজপুতেরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে তারা গোঁয়ার গোয়ালাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবে না। আর বলদেব যদি ভাণ্ডারা ব্যবস্থা নেয় তাহলে সমস্ত ভাণ্ডারাই ভণ্ডুল করে দেওয়া হবে। সেই সময় ব্রাহ্মণরাও উচ্চকণ্ঠে একসঙ্গে ঘোষণা করে যে তাদের জন্যও যদি আলাদা ব্যবস্থা না করা হয় তারাও সংঘর্ষ করবে। ব্রাহ্মণরাও দীর্ঘদিন ধরে যাদবদের উপর অসন্তুষ্ট, তারাও রাজপুতদের রাগিয়ে যাদবদের সঙ্গে লড়াই করানোর চেষ্টা করছিল। ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি হয়ে জোতখীজী (জ্যোতিষী) বলেন :

"যাদব লোক বার বার লাঠি ভালা দিখাতে হৈঁ, য়হ রাজপুতোঁকে লিয়ে ডুব মরনে কা বাত হৈ।"[৫৫]

ব্রাহ্মণরা রাজপুত ও অন্যান্য জাতিদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করেন। মেরীগঞ্জ গ্রামে মাত্র দশ ঘর ব্রাহ্মণ কিন্তু নিজেদের চতুরতাতে তারা এই গ্রামের তৃতীয় শক্তি। তারা রাজপুতদের নিজের হাতের মুঠোয় করার জন্য ভয় দেখায় যে যদি রাজপুতরা তাদের কথা না শোনে তাহলে তারা যাদবদের দলে যোগ দেবে এবং যাদবদেরই রাজপুত বলে মেনে নেবে। কারণ স্বাধীনতালাভের পুর্বে অনেক যাদব উপবীত ধারণ করে নিজেদের রাজপুত বলে ঘোষণা করেছে। রাজপুতরা এই 'ভূমিজ ক্ষত্রিয়দের' (ভূমকোড় ক্ষত্রিয়) সহ্য করতে পারে না। তারা এই নূতন সৃষ্ট রাজপুতদের ঘৃণা করে। কারণ তাদের পূর্বপুরুষেরা এই যাদবদের ছোট জাত বলে কথায় কথায় লাথি জুতা মারত। কয়েক বছর আগেও

রামকিরপাল সিং টহল পাসবানকে গুরুর ঘোড়ায় চড়ার অপরাধে চুলের মুঠি ধরে নীচে ফেলে জুতো পেটা করতে করতে বলেছিল : "শালা দুসাধ, ঘোড়ী পর চড়ে গা।"৫৬

এই জাতিশ্রেষ্ঠ রাজপুত ও ব্রাহ্মণরা নীচু জাতের লোকদের স্পর্শ করলে জাত চলে যায়। এদের মধ্যে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতা বোধ প্রবল। কিন্তু এই নীচু জাতের নারীদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাই হোলি উৎসবের সুযোগে এক ব্রাহ্মণ যখন এক যুবতী নারীকে চুম্বন করতে চেয়েছে তখন বাধা দিয়ে এই নীচু জাতেরই সেই রমণীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে : "ভুকুয়া বভণা, চুম্মা লেবে মেঁ জাত নহীয়ে যায়।"৫৭

যাদব, ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতদের মতই এই গ্রামে কায়স্থদেরও একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। রাজপুত ও কায়স্থদের মধ্যে বংশগত দীর্ঘদিনের ঝগড়া। রাজপুতরা কায়স্থটোলিকে 'কৈথ টোলি' বলে আর কায়স্থরা রাজপুতটোলিকে 'সিপাহিয়াটোলি' বলে উপহাস করে। রাজপুতরা বলে : "মরা হুয়া কায়স্ত ভী বিসাতা হৈ..."৫৮

যাদবদের মুখিয়া খেলাবন যাদবও রাজপুতদের মত কায়স্থদের বিশ্বাস করতে রাজী নয়। রাজপুতটোলির মুখিয়া রামকিরপাল সিং যাদবটোলির মুখিয়া খেলাবন যাদব এবং কায়স্থটোলির মুখিয়া বিশ্বনাথপ্রসাদ। এদের মধ্যে বিশ্বনাথপ্রসাদই গ্রামের মধ্যে অন্যান্য জাতিদের মধ্যে লড়াই বাধাতে ওস্তাদ।

উপরোক্ত জাতিব্যবস্থা ছাড়া মেরীগঞ্জ গ্রামে সাঁওতালদের কথাও আছে। সাঁওতালরা আদিবাসী। এরা বহুদিন আগে সাঁওতাল পরগণা থেকে এখানে এসে বাস করছে। রীতি-নীতির দিক দিয়ে এরা মেরীগঞ্জের স্থানীয় লোকদের চেয়ে পৃথক। এরা স্থানীয় কুমর এবং মাঝিদের সঙ্গে মিলতে পারেনি। মিথিলা অঞ্চলে থেকেও এরা এখন পর্যন্ত যে মদ পান করে তা ইংরেজী নয়, তাদেরই সৃষ্ট 'পঞ্চায়' অর্থাৎ (হাঁড়িয়া)। এই পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে কায়স্থটোলির মুখিয়া বিশ্বনাথপ্রসাদ নিজেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্য গ্রামের লোকদের সঙ্গে সাঁওতালদের লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে। আবার সাঁওতালদের বুঝিয়ে নিজের চতুরতায় তাদের নিজের করে নিয়েছে।

রেণুর 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে এই উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ ও সাঁওতালরা ছাড়া আরেকজনের কথা উল্লেখ করা যায়, তিনি ডাক্তার প্রশান্ত। যাঁর প্রকৃত জাত ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তার নামের জাতিতে গ্রামের লোকেরা সন্তুষ্ট নয়। কারণ

এই গ্রামে নাম জিজ্ঞেস করার পরই জাত কি জিজ্ঞেস করা হয়। কিন্তু ডাক্তার নিজেও জানতেন না তিনি কি জাতের। তাঁর জন্মটাই রহস্যে ভরা। তবুও তাঁকে জাত গ্রহণ করতে হয়েছে; কারণ এ-গ্রামে জাত ছাড়া জলও পাওয়া যায় না। তাই তিনি তাঁর পালিতা মা স্নেহময়ী ব্যানার্জীর নামের উপর ভিত্তি করে হিন্দু ব্রাহ্মণের জাতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি জাত-টাত বিচার করেন না। প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সমান ব্যবহার করেন।

মেরীগঞ্জের ধর্মীয় পরিস্থিতিও সম্পূর্ণ বিকৃত। যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন। তাই মেরীগঞ্জে হাসপাতাল হওয়ার সময় গ্রামের লোকেরা বাধা দিয়েছে। অনেকে একথা সোচ্চারভাবে ঘোষণা-করেছে—ডাক্তার লোকেরাই রোগ ছড়ায়, ইংরেজী ঔষধে গরুর রক্ত মেশানো থাকে। কলেরা ছড়ানোর জন্য গ্রামের কুয়ো এবং জলাশয়ে ডাক্তাররা ঔষধ ঢেলে দেন। তাই গ্রামে যখন কলেরা হয়েছে তখন গ্রামের সকলে ডাক্তার প্রশান্তকে কুয়োতে ঔষধ দিতে বাধা দিয়েছে। ইঞ্জেকশন কেউ নিতে চায়নি। ডাক্তার প্রশান্ত কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার রিসার্চে বানরের উপর ঔষধের প্রয়োগ করেন। তাতে কয়েকটা বানর মারা পড়ে। তখন খালাসীজী গ্রামের লোকদের বুঝিয়ে দেয় বানর হনুমানজীর রূপ—তারই অভিশাপ লেগেছে, তাই গ্রামে কলেরা হয়েছে।

গ্রামের ধার্মিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান কেন্দ্র মঠ। মঠের মহন্ত সেবাদাস। আর সেবাদাসী লক্ষ্মী মহন্তের অধিকারে। এর পূর্বে বসুমতিয়ার মহন্ত লক্ষ্মীর উপর অধিকার পাওয়ার জন্য মামলা করেছিল। সে মামলায় জেতার জন্য সেবাদাস উকিল সাহেবকে আশ্বাস দিয়েছিল: "উকিল সাহব, লক্ষ্মী হমারী বেটী কী তরহ হোগী।"[৫৯]

ফলস্বরূপ সেবাদাস সে মামলায় জয়লাভ করে এবং লক্ষ্মীকে কাছে পাওয়ার অধিকার পায়। কিন্তু পরে সেবাদাস লক্ষ্মীর সঙ্গে ঠিক কন্যার সম্পর্ক রাখে না। ভিতরে ভিতরে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাই মঠের পুরাতন ভৃত্য কিসহু বলে: "উপর বাবাজী ভিতর দগাবাজী।"[৬০]

এই সেবাদাসের মৃত্যুর পর শয়তান নরসিংহদাস মঠের মহন্ত হতে চেয়েছে। কিন্তু কালীচরণের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি। গ্রামের লোকদের সহায়তায় সেবাদাসের শিষ্য রামদাসই মহন্তরূপে নিযুক্ত হন। রামদাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সে খুব ভাল খঞ্জনী বাজাতে পারতো।* রামদাস মহন্ত হওয়ার

পর গুরুমা লক্ষ্মীকেও নিজের করে পেতে চায় কিন্তু একদিকে লক্ষ্মীর প্রবল আপত্তি, অন্যদিকে কালীচরণের ভয়ে রামদাসের সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তারপর সে রামপিয়রিয়াকে সেবাদাসী করে নেয়; বিনিময়ে গ্রামের লোকদের ভাত খাওয়ায়। মঠের মহন্তর ভাত দিতে কোন অসুবিধা নেই, কারণ মঠের পাঁচশো বিঘা জমি।

উত্তর বিহারের এই অনুন্নত, দারিদ্র্যপীড়িত, শিক্ষাহীন, নানা সংস্কারের যূপকাষ্ঠে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা সঙ্কীর্ণ গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু রচনা করেন 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসের কাহিনী। এই উপন্যাসের নায়ক মেরীগঞ্জ গ্রাম। উপন্যাসকার এই গ্রামের সকল লোকের চরিত্রই সমান দৃষ্টিতে রচনা করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক প্রবাদ, আঞ্চলিক শব্দ সবকিছু মিলিয়ে 'মৈলা আঁচল' হিন্দী সাহিত্যের একটি অনবদ্য আঞ্চলিক উপন্যাস।

উভয় উপন্যাসেই এইসব আঞ্চলিক উপাদান উপন্যাসগুলির কাহিনী, চরিত্র এবং সামগ্রিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে যে, বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি অংশ চয়ন করে এর পরিপূর্ণতা বোঝানো সম্ভব নয়। উপন্যাসগুলির পরিবেশের সঙ্গে আঞ্চলিক জীবনের এই একাত্মতাই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'কে এবং হিন্দী উপন্যাস 'মৈলা আঁচল'কে বিশিষ্ট করে তুলেছে। 'মৈলা আঁচলে' পূর্ণিয়া জেলার মেরীগঞ্জ ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর তাৎমাটুলি, ধাঙড়টুলি, বিসকান্ধার একটি সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক পটভূমিতে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, প্রেম-ভালবাসা, নানা লৌকিক-অলৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস, রামায়ণনির্ভরতা অঞ্চলপ্রকৃতির সঙ্গে নাড়ির যোগ—ইত্যাদির মাধ্যমে চেতনার আদিম স্তরের এক মানবগোষ্ঠীর এই নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক পঙ্গুতা এবং সংস্কারাচ্ছন্ন দৈব-মাহাত্ম্যের প্রতি আনুগত্য—দুটির সমন্বিত রূপের মধ্যে এই জগতের অচলায়তনিক অবয়বটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এই অচলায়তনিক অবয়বের দিক দিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর সঙ্গে ফণীশ্বরনাথ রেণুর শুধু 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসই নয় তাঁর সৃষ্ট 'পরতী-পরিকথা' উপন্যাসের মধ্যেও মিল দেখা যায়।

রেণুর 'পরতী পরিকথা'তেও পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ঐ বিশাল ভূখণ্ডের কথা আছে যা উত্তরে নেপাল থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে গঙ্গাতট পর্যন্ত বিস্তৃত। রেণু উপন্যাসের প্রথমেই বলেছেন:

"ধূসর, বীরান, অন্তহীনা প্রান্তর। পতিতা ভূমি, পরতী জমিন' বন্ধ্যা ধরতী...[৬১]

এই পতিত পৃথিবীর পরিচয় তিনি পরানপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে তুলে ধরেছেন :

"পুরাতন গ্রাম পরানপুর। ইস ইলাকে কে লোগ পরানপুর কো সারে অঞ্চল কা প্রাণ কহতে হৈঁ।"[৬২]

এই বিস্তৃত পরতী অঞ্চলের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার জন্য রেণু এই উপন্যাসে অনেক খণ্ড খণ্ড উপকথার বর্ণনা করেছেন। এই উপকথা ও কিংবদন্তিগুলির মধ্যে 'স্থনুরিনৈকা' কথাটি সর্বশ্রেষ্ঠ। স্থূলরূপে এই উপকথাটি অনেক ছোট ছোট ঘটনায় পরিপূর্ণ কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে এটি একটি সম্পূর্ণ উপকথা। এই উপকথাগুলির মধ্য দিয়ে পূর্ণিয়ার 'পরানপুর' অঞ্চলের মাটি ও মানুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

এই পরানপুর গ্রামটি পূর্ণিয়া জেলার হবেলী পরগনার অন্তর্ভুক্ত রানীগঞ্জ থানায়। এই গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় আট হাজার। এই গ্রামের পরিচয় দিতে গিয়ে রেণু বলেছেন :

"পরানপুর কী প্রতিষ্ঠা সারে জিলে মে হৈ। সবসে উন্নত গাঁও সমঝা জাতা হৈ। ইস ইলাকে মেঁ সবসে উন্নত গাঁও হৈ পরানপুর। কিন্তু জিস তরহ বাঁশ বড়তে বড়তে অন্ত মেঁ ঝুক জাতা হৈ, উসী তরহ য়হ গাঁও ভী ঝুকা হৈ।[৬৩]

এই গ্রামটির এই অঞ্চলে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। লোকে এখানকার দশ বছরের ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময় আগে নিজের পকেট দেখে নেয়। ফারবিসগঞ্জের কোন দোকানদার এই অঞ্চলের লোককে দেখলে প্রথমে নিজের জিনিসগুলি তুলতে শুরু করে দেয়। ট্রেনের চেকারও জানে পরানপুরের লোকেরা টিকিট কেটে গাড়িতে চড়ে না। যদি কোন নূতন চেকার এদের উপর চার্জ করে তাহলে পাথর ও লাঠি চালিয়ে এরা ভাড়া চুকায়। এই গ্রামে বিভিন্ন জাতের তেরটি টোলি বা বস্তি আছে। গ্রামটি প্রথম থেকেই সমৃদ্ধ। তাই এর সম্বন্ধে এই অঞ্চলে একটি বিশেষ কথা প্রচলিত আছে :

"আভরণ দেবে পাট, পেট ভরন দেবে ধান। পরানপুরকে বেফিকরা সোবে চাদরতান।"[৬৪]

কিন্তু ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতাবাদের বিষাক্ত রাজনীতি 'চাদরতানকে সোনে বালে'

পরানপুরের অধিবাসীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এই লভৈয়া ভূতের জন্ত এই গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি অশান্ত। জমির সমস্যাই এই উপন্যাসের প্রাণ। বিস্তৃত পতিত জমি, বন্ধ্যা ধরতীর মাঝখানে পরানপুর গ্রাম ভারতীয় গ্রামেরই প্রতিনিধি। শাশ্বত জমির প্রতি লালসা, নীতি-দুর্নীতি সবকিছুরই বর্ণনা ফণীশ্বরনাথ রেণু এই উপন্যাসে করেছেন। 'ল্যাণ্ড সেটল্‌মেণ্ট' তাদের জীবনে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। রেণু এই গ্রামের বিকশিত রূপের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এই গ্রামে সামন্তবাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এক উচ্চ সামন্ত শ্রেণীও উপস্থিত। সাংস্কৃতিক, আর্থিক এবং সামাজিক দৃষ্টিতে সামন্তবাদের সমপর্যায়ের উচ্চবর্গ ও সাংস্কৃতিক, আর্থিক, সামাজিক কোন দৃষ্টিতেই এদের সমতুল্য নয় এরকম নিম্নবর্ণের লোকও এই গ্রামে আছে। গ্রামের কয়েকটি বিশেষ সমস্যার উল্লেখ এই উপন্যাসে রয়েছে। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেছে কিন্তু গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। গ্রামের সমস্ত জমির মালিক এখনও শিবেন্দ্র মিশ্রর পুত্র জিতেন্দ্র মিশ্র। আর তার সহযোগী মুন্সী জলধারীলাল দাস তহসীলদার এবং সিপাহী রামরগ্ননেন সিং। সমগ্র গ্রামটিই বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নাইনটোলি, রাজপুতটোলি, ভূমিহারটোলি, মুসলমানটোলি আর অভিজাত শ্রেণীর প্রতীক জিতেন্দ্র মিশ্রের সুউচ্চ অট্টালিকা মালিকটোলি ইত্যাদি রূপে বিভক্ত। এই জাতি-সম্প্রদায় সম্বন্ধে রেণু উল্লেখ করেছেন :

"পিছলে আট দশ বর্ষোঁ সে জাতিবাদ নে কাফী জোর পকড়া হে। রাজনীতিক পার্টিয়াঁ ভী জাতিবাদ কী সহায়তা সে সংগঠন করনা সমঝতী হৈ।"[৬৫]

সদ্য স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে ভারতীয় গ্রামজীবনের পটভূমিতে ফণীশ্বরনাথ রেণু 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসটি রচনা করেন। সমগ্র ভারতীয় গ্রামের সামাজিক এবং নৈতিক সমস্যারকেন্দ্র —জমি। সে সময়কার জমিদারদের জমির প্রতি লিপ্সা ও ভয়ানক অত্যাচারের শিকার ভূমিহীন কৃষকদের বিপন্নতার কথা রেণু অনায়াসে লিখেছেন। লুত্তো, বীরভদ্র, জিতেন্দ্র এবং সমসুদ্দীন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সে সময়কার সামাজিক ও নৈতিক স্থিতিকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। বিভিন্ন উপকথাকে কেন্দ্র করে এই স্বেদঝরানো রুদ্ধশ্বাস কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে আছে মানুষের অত্যাচারের, অবিচারের, বিবেকহীনতার গল্প। স্মৃতি আর দীর্ঘশ্বাস। নারী তার ভালবাসাকে ছিন্ন হতে দেখেছে।

আর কৃষক দেখেছে তারই চোখের সামনে মিথ্যা ঋণের দায়ে তার প্রাণের জমিকে খোয়াতে। তাই পূর্ণিয়া জেলার সব বড় বড় জমিদারেরা রাতারাতি বড় বড় কৃষকে পরিণত হয়ে গেল। রেণু উল্লেখ করেছেন :

"হিন্দুস্থান কে সবসে বড়ে কিসান য়হী নিবাস করতে হৈ।…গুরুবংশী বাবু জমিদার নহী, কিসান হৈ। দশ হাজার বিঘে জমিন হৈ, দো-দো হাবাই জাহাজ রখতে হৈঁ।"[৬৬]

এমনিভাবে পরানপুর গ্রামে ভূমিহীন কৃষকদের পথ দেখানোর জন্য গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে।

রেণুর 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসটি ভাদুড়ীজীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর মত লোকসংস্কৃতির উপাদানে পরিপূর্ণ। যেমন 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ পরিবর্তন এসেছে, রেণুর 'মৈলা আঁচল' ও 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসের আঞ্চলিক জীবনেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে। তবে 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' যেরকম বহিরাগত কোনো শক্তির সংঘাতে পরিবর্তন আসেনি, এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে সংস্পর্শের প্রতিক্রিয়ায়,—কিন্তু রেণুর সৃষ্ট উপন্যাসগুলিতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে বহিরাগত শক্তির প্রতিক্রিয়ায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' এই পরিবর্তন এসেছে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে। অন্ত্যজ পল্লীর অচলায়তনের মধ্যে পুরানো বিশ্বাস-সংস্কারের বদলে নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে। সংস্কারাচ্ছন্ন দৈববাণী মানসিকতার আবহাওয়ায় মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও অবতারত্ব এবং নানা দৈব-মাহাত্ম্য আরোপিত হয়। বিলাতী কুমড়োর গায়ে 'গান্‌হী বাওয়ার মূর্তি', বটগাছের পাতায় 'গান্‌হী বাওয়ার' নাম ইত্যাদি নানা অলৌকিক দৃশ্য সরল-বিশ্বাসী গ্রামীণ মানুষের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু রেণুর সৃষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিতে পুরানো বিশ্বাস ও সংস্কারের বদলে যে নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে তার মূলে মহাত্মা গান্ধী নয়, সোসালিস্ট পার্টি। তারা তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য সোচ্চার কণ্ঠে স্লোগান দিয়েছে।

"যো রোয়েগা সো কাটেগা। যো কাটেগা সো রোয়েগা।"[৬৭]

এছাড়া বহির্জগতের নানা ঘটনার সংক্রমণ ঘটেছে এই সীমাসংহত অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবনযাত্রায়। ভাদুড়ীজীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ পাক্কী বা 'কোশী'—শিলিগুড়ির বড় রাস্তা ওদের নিজস্ব জগতের আশ্রয়, নিরাপত্তা, নির্ভরতার ধ্যানধারণার যেন একটি প্রতীকী রূপ। বহির্জগতের

দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস, ভোট ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে এদের সঙ্কীর্ণ মন্থর গ্রাম্যজীবনে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, তার সামগ্রিক রূপটিকে লেখক দেখিয়েছেন ঢোঁড়াই-এর মধ্য দিয়ে। এখানেই ভাদুড়ীজীর সঙ্গে রেণুর পার্থক্য। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' চরিত্র-প্রধান কিন্তু রেণুর উপন্যাসের জীবনসমস্যা ঘটনা-চরিত্রের দুই পায়ে সমান তাল রেখে চলেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় আছে, যা প্রায়ই দ্বন্দ্বমূলক ; কিন্তু 'রেণু'র সৃষ্ট 'মৈলা আঁচল' ও 'পরতী পরিকথা'তে তা নেই। এই উপন্যাসগুলির সংঘাত ব্যক্তিতে ব্যক্তিচিত্তের ভিতরে নিজের সঙ্গে মানুষে ও ভাগ্যে এবং সংঘাত ও ঘটনায়-ঘটনায়। ঘটনা এবং চরিত্রে অচ্ছেদ্য ও দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ। চরিত্র সব সময়েই ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছে তার ফলে চরিত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ মানবপ্রকৃতি অনেকাংশ হলেও এটাই এর মূল শক্তি নয়। অজ্ঞাত নিয়তি, অজানা কারণ এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনও এর পরিণামের জন্য কখনো কখনো দায়ী হয়ে উঠেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী ও হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর আঞ্চলিক উপন্যাসের সবচেয়ে বড় মিল এই যে উভয়েই উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের প্রাকৃতিক পটভূমি এবং এই প্রকৃতির পটভূমির কোলে লালিত মানবগোষ্ঠীর জীবনচর্যার সার্থক রূপায়ণ করেছেন।

ভাদুড়ীজী ও রেণু উভয়েরই উপন্যাসে উত্তর বিহারের ঐ বিশেষ অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ধর্ম, সংস্কার, বাচনভঙ্গী, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনা, অনুভূতি, জীবনাচরণের পার্থক্য ইত্যাদি একান্তভাবে ঐ অঞ্চলের নিজস্বতা দ্বারা চিহ্নিত হয়ে তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ মহিমা। এটাই আঞ্চলিক উপন্যাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিক সাহিত্যে কোনো বিশেষ অঞ্চলের রূপায়ণ হয় একথা ঠিকই, —কিন্তু মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিতেই তার যথার্থ সার্থকতা—"It will be an image of life, not a mere record of experience."[৬৮]

আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করাই আঞ্চলিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এইজন্য ভিন্ন মহাদেশের অপরিচিত পরিবেশের রূপকার হয়েও ফকনার, আর্নেস্ট

হেমিংওয়ে, শলোকভ, টমাস হার্ডি যেমন আমাদের একান্ত পরিচিত, তাঁদের সাহিত্যের বিচিত্র প্রকাশলীলার মধ্যে আমাদের শতযোজন দূরবর্তী জীবনের একাত্মতাব অনুরণন খুঁজে পাই। ঠিক সেইরূপ সতীনাথ ভাদুড়ী ও হিন্দী ঔপন্যাসিক রেণুর উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে স্থান ও কালের সীমানা পেরিয়ে বিস্তৃত মানবগোষ্ঠীর জীবনের প্রতিরূপ ধরা পড়েছে। এদিক দিয়ে উভয়েই বিশিষ্ট আঞ্চলিক উপন্যাসকার।

ভাদুড়ী ও বেণু উভয়েই আঞ্চলিক উপন্যাসে পশ্চাৎদৃষ্টি বা ফ্ল্যাশব্যাক রীতি গ্রহণ করেছেন, তবে ভাদুড়ীজী ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গেবও ছায়াপাত ঘটিয়েছেন।

ভাদুড়ীজী ও বেণু উভযেব আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি তীব্র ঘটনাবহুল প্রবল ও বর্ণময। দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ বিষযেও উভযের রুচি। তবে বেণুব 'মৈলা আচল' ও 'পরতী পবিকথা' উপন্যাসদুটির অনেক স্থলে নাট্য-দৃশ্যের মতো স্থানিক নির্দিষ্টতা পবিচ্ছেদগুলিতে বযেছে, কিন্তু ভাদুড়ীজীব 'ঢোঁডাই চরিত মানস'-এ রযেছে কালগত ঘনিষ্ঠ নৈকট্য। তবে উভযের উপন্যাসেই বিশালতা সত্ত্বেও কালের সংহতি বযেছে।

ভাদুড়ীজীব উপন্যাসেব কাহিনী সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক, লৌকিকতা আশ্রয়ী এবং দৈববাদনির্ভব। কিন্তু বেণুব আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিব কাহিনী কিছুটা অতি লৌকিকতা আশ্রয়ী, কখনও আধা মনস্তাত্ত্বিক, কখনও অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

পরিশেষে সতীনাথ ভাদুড়ী ও হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর আঞ্চলিক উপন্যাসের তুলনা করে বলা যায যে, রেণু ভাদুড়ীর 'ঢোঁডাই চরিত মানস' দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু তিনি ভাদুড়ীজীর অনুকরণ করেননি। ভাদুড়ীজীর 'ঢোঁডাই চরিত মানস' চরিত্রপ্রধান—দরিদ্র, উপেক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন পিছিযে থাকা একটি মানব-সমাজের জাগরণের ইতিবৃত্ত রচিত হযেছে ঢোঁডাই-এর আত্মউপলব্ধির মধ্যে। কিন্তু রেণুব আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি অঞ্চলপ্রধান। ভাদুড়ীজীর ও রেণুব উপন্যাসগুলি পাশাপাশি রেখে বিচার কবলে বোঝা যায যে একে অপরের পরিপূবক। উভযের উপন্যাসগুলি পড়লে বোঝা যায যে ভাদুড়ীজী ও রেণু শহুরে মানুষের অচেনা ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনসমাজকে ফুটিযে তুলেছেন অনবদ্য ভঙ্গীতে। এই উপন্যাসগুলিতে গ্রামীণ ভারত উঠে এসেছে পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে। তা জীবন্ত, প্রত্যক্ষ,

প্রাণস্পন্দিত। ভাদুড়ীজী ও হিন্দী ঔপন্যাসিক রেণুর উপন্যাসগুলিতে গ্রামীণ ভারতের হৃৎস্পন্দনকে ধরা যায়।

১। Hardy the Novelist : David Cecil : 1967, p. 32.

২। সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সাহিত্য : ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ২৮৫।

৩। সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ও সাধনা : গোপাল হালদার : ১৯৭৮, পৃ ৬৪।

৪। হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস : রামচন্দ্র শুক্ল।

৫। আঞ্চলিকতা ও হিন্দী উপন্যাস : ড. পূর্ণ দেব, পৃ. ৪০।

৬। তদেব : পৃ. ৫৭।

৭। নয়ে উপন্যাস আলোচনা (হিন্দী) : অক্টোবর, ১৯৫৭।

৮। লেখকের কথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৫৪।

৯। গল্প লেখার গল্প : জ্যোতিপ্রসাদ বসু সম্পাদিত, পৃ. ৫৪।

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. সুকুমার সেন : ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯০।

১১। লেখকের কথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃ. ৫৪।

১২। An Acre of Green Grass : Buddhadev Basu : 1948, p. 85.

১৩। কালের প্রতিমা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ১৪৫-৪৭।

১৪। সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবন ও সাহিত্য : অরূপকুমার ভট্টাচার্য।

১৫। ঢোঁড়াই—'সতীনাথ বিচিত্রা' : সতীনাথ ভাদুড়ী : ১৩৭২।

১৬। 'ইতিকথা' সতীনাথ স্মরণে : শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায় : ১৯৭২, পৃ. ১১।

১৭। 'ভাদুড়ীজী' : ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ৬৮।

১৮। সতীনাথ ভাদুড়ীর ডায়েরি : জানুয়ারী ১৯৬০ (সম্ভবত ঢোঁড়াই সম্পর্কিত ইংরেজীতে মন্তব্যগুলি ১—৪ জানুয়ারীর মধ্যে লিখিত)।

১৯। 'ঢোঁড়াই—'সতীনাথ বিচিত্রা' : সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড।

২০। তদেব।

২১। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' : সতীনাথ ভাদুড়ী : প্রথম খণ্ড।

২২। তদেব।

২৩। ঔপন্যাসিক সতীনাথ : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১০২—১০৩।

২৪। ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রথম খণ্ড।

২৫। ঔপন্যাসিক সতীনাথ : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১০২—১০৩।

২৬। সতীনাথের ডায়েরী : ১—৪ জানুয়ারী ১৯৬০।

২৭। তদেব।

২৮। তদেব।

২৯। The Craft of Fiction : Percy Lublock, p. 40.

৩০। বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গ : আঞ্চলিকতা : ড. মহীতোষ বিশ্বাস, পৃ. ১৪৪।

৩১। মৈলা আঁচল : ফণীশ্বরনাথ রেণু, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

৩২। David Cecil : Hardy the Novelist : 1967, pp. 32-33.

৩৩। মৈলা আঁচল : ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ৬৭।

৩৪। মৈলা আঁচল : ফণীশ্বরনাথ রেণু, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

৩৫। Development of the English Novel : Cross, p. 279.

৩৬। হিন্দী সাহিত্য—উসকা উদ্‌ভব ঔর বিকাশ : পৃ. ৪৩৫ (১ম সং)।

৩৭। মৈলা আঁচল : ফণীশ্বরনাথ রেণু : প্রথম সংস্করণ।

৩৮। তদেব, ভূমিকা।

৩৯। তদেব, পৃ. ৩৫৬।

৪০। তদেব, পৃ. ২৭৮।

৪১।	রামচরিত মানস	তুলসীদাস—অধ্যায় ২,	পৃ. ১১০
৪২।	মৈলা আঁচল	ফণীশ্বরনাথ রেণু	পৃ. ৩৩১
৪৩।	ঐ	ঐ	পৃ. ২৯০
৪৪।	ঐ	ঐ	পৃ. ২৬০
৪৫।	ঐ	ঐ	পৃ. ৭২
৪৬।	ঐ	ঐ	পৃ. ১৮৯
৪৭।	ঐ	ঐ	পৃ. ২১৮
৪৮।	ঐ	ঐ	পৃ. ২১৮
৪৯।	ঐ	ঐ	পৃ. ৩৩৮
৫০।	ঐ	ঐ	পৃ. ২৭৫
৫১।	ঐ	ঐ	পৃ. ২৭৫

৫২।	মৈলা আঁচল	ফণীশ্বরনাথ রেণু	পৃ. ২৭৬
৫৩।	ঐ	ঐ	পৃ. ২৯
৫৪।	ঐ	ঐ	পৃ. ১৮৩
৫৫।	ঐ	ঐ	পৃ. ১৫৬
৫৬।	ঐ	ঐ	পৃ. ২৩
৫৭।	ঐ	ঐ	পৃ. ৩০
৫৮।	ঐ	ঐ	পৃ. ২১৭
৫৯।	ঐ	ঐ	পৃ. ৩১
৬০।	ঐ	ঐ	পৃ. ২৯৬
৬১।	পরতী পরিকথা	ঐ	পৃ. ১
৬২।	ঐ	ঐ	পৃ. ১৪
৬৩।	ঐ	ঐ	পৃ. ১৭
৬৪।	ঐ	ঐ	পৃ. ৩৩১
৬৫।	ঐ	ঐ	পৃ. ২৫
৬৬।	ঐ	ঐ	পৃ. ২৬
৬৭।	মৈলা আঁচল	ফণীশ্বরনাথ রেণু	পৃ. ২৬

৬৮। The Structure of the Novel : Edwin Mare, p. 150.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক উপন্যাস

আধুনিককালে রাজনীতি মানুষের নিঃশ্বাসের মতো—জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বুদ্ধিজীবী মানুষমাত্রেই দেশের রাজনীতির খবরাখবর রাখতে আগ্রহী। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক যেমন মানবিক সূক্ষ্ম ও জটিল অনুভূতির পাপড়িগুলিকে একটি একটি করে উন্মোচিত করেন, তেমনি শাসকের প্রতি শোষিতের তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ ইত্যাদিও প্রকাশ করে থাকেন। এই কারণে অনেক গ্রন্থকেই স্বাধীনতার পূর্বে শাসক শ্রেণীর রাজরোষে পড়তে হয়েছিল। সমাজবিপ্লবী ও রাজনৈতিক দার্শনিকদের অনেক কাজ সাহিত্যিকেরাও করে থাকেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর রাজনৈতিক উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপন্যাসে রাজনীতির প্রভাব কতটুকু বা রাজনৈতিক উপন্যাস কি? রাজনীতির প্রভাব থাকলেই কি তা রাজনৈতিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করা যায়? না রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্য কিছু সংজ্ঞা আছে? বাংলাতে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে সমরেশ বসু পর্যন্ত—অনেকেই রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছেন। অনুরূপ হিন্দীতেও পণ্ডিত কিশোরীলাল গোস্বামী, গুরু দত্ত প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু বাংলা ও হিন্দী সব লেখকের উপন্যাস রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে কতটা সার্থক হয়েছে?

বাংলা ও হিন্দী রাজনৈতিক উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনায় আমরা এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হই।

রাজতন্ত্রের যুগ থেকে স্বৈরতন্ত্র-স্বেচ্ছাতন্ত্র-নৈরাজ্যবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একনায়কতন্ত্র, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, পরিশেষে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের যুগে এসেছি। বর্তমান রাজনীতি রাজার নীতি নয়—রাষ্ট্রের অর্থাৎ রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় নীতি। যাদের নিয়ে রাষ্ট্র তাঁদের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক, বিরোধ, সংঘর্ষ, সংগ্রামের নীতি; প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন-ইচ্ছায় শাসনক্ষমতা দখলের

নীতি; সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে শাসক ও শোষিতের সম্পর্কের নীতি। এই রাজনৈতিক ঘটনা ও কাহিনীকে অবলম্বন করে একটি দেশ ও জাতির সুশাসিত হওয়ার বা শাসনক্ষমতা লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় যে উপন্যাসে, দেশ ও জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের বা শাসকের সম্পর্ক বা সংঘর্ষ ইত্যাদি যে উপন্যাসে পরিস্ফুট হয় তাকে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় স্তাঁদালের মন্তব্য:

"Politics in a work of literature are like a pistol-shot in the middle of a concert, something loud and vulgar yet a thing to which it is not possible to refuse one's attention."[১]

রাজনীতির সঙ্গে সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা। উপন্যাসের কায়া নির্মিত হয় ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থা এবং সম্পর্কের পটভূমিতেই। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে 'সামাজিক উপন্যাস'কে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' রূপে অভিহিত করা যায় কিনা? এছাড়া এমনও প্রশ্ন উঠতে পারে যে—ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান ও উপকরণ তো রাজা বাদশাহের কাহিনী। তাঁদের শাসনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি দেশ ও জাতির অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার কাহিনী। তার সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কৃতির পরিচয়ের কাহিনী—রাজনৈতিক উপন্যাসের উপাদান উপকরণও প্রায় তাই। সুতরাং আমাদের বিচার করতে হবে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে রাজনৈতিক উপন্যাসরূপে অভিহিত করা যায় কিনা? অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে রাজনৈতিক উপন্যাসের এবং সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে রাজনৈতিক উপন্যাসের পার্থক্য কোথায়,—বিশেষ লক্ষণ কি? কি এমন বিশেষ লক্ষণ আছে যার দ্বারা 'রাজনৈতিক উপন্যাস'কে পৃথক নামে চিহ্নিত করা হয়েছে?

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই যে-কোন সাহিত্যই বিশেষত উপন্যাস সমাজকে অস্বীকার করতে পারে না। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি সমাজের ভিত্তিভূমিতেই উপন্যাসের কায়া নির্মিত। যে ব্যক্তি বা চরিত্রের গল্প নিয়ে উপন্যাস রচিত, সেই ব্যক্তি বা চরিত্র তো সামাজিক জীব। সমাজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উপন্যাসকারকে তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে সমাজ-পটভূমির উপর দাঁড় করাতে হয়। ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে যেমন অবিচ্ছেদ্য

সম্পর্ক, পরিবার ও সমাজের সম্বন্ধও ঠিক সেইরকম। যে উপন্যাসে ব্যক্তি-পরিবার এবং সমাজ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা পড়ে, ব্যক্তি ও পরিবার যেখানে সমাজের শাসন ও বিধি-বিধান, প্রথা-সংস্কারকে মেনে আপন-আপন আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতার, এবং বিশেষ করে ব্যক্তি-সত্তার পরিস্ফুটন ঘটায় তাকে 'সামাজিক উপন্যাস'রূপে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যে উপন্যাসে সমাজের অমোঘ শাসন ও নিয়মকানুন, প্রথা-সংস্কারের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তি ও পরিবারের স্বার্থকে বলি দিতে হয়, মেনে নিতে হয় সমাজ-বিধানেরই শাস্তি, তাকেই 'সামাজিক উপন্যাস' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এমন অনেক 'সামাজিক উপন্যাস' আছে যার পটভূমি মূলত রাজনৈতিক, কিন্তু সামাজিক বিধি-বিধান, অনুশাসন, প্রথা-সংস্কার, আদর্শ এবং চরিত্রগুলির সমাজ-আনুগত্যই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে ওঠায় তাকে 'সামাজিক উপন্যাস' রূপেই চিহ্নিত করা হয়। ইংরেজী সামাজিক উপন্যাসে এর দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে যেমন—ডিফো, ফিল্ডিং, ডিকেন্স, থ্যাকারে, গলসওয়ার্দি, ওয়েলস প্রমুখ।[২]

প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। রমেশ, বেণী ঘোষালদের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত সমাজের অনুশাসন, বিধি-বিধানই বড় হয়েছে। রমা-রমেশের হৃদয়ধর্মও এই সামাজিক অনুশাসনের কাছে মাথা নত করেছে। রমেশের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষকে ও সমাজকল্যাণ-আদর্শকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে হয়তো চিহ্নিত করা যায়; সেদিক থেকে বৃহত্তর অর্থে 'পল্লীসমাজ'-এ হয়তো রাজনৈতিক একটি পটভূমি গড়ে উঠেছে। কিন্তু সমাজই সমগ্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই 'পল্লীসমাজ'কে সামাজিক উপন্যাসেরই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। বৃহত্তর রাজনৈতিক পটভূমির ওপর বহুসমাদৃত 'হিন্দী সামাজিক উপন্যাসে' এরূপ দৃষ্টান্ত অনেকই আছে। প্রেমচন্দের 'গোদান', 'প্রেমাশ্রম', সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালার 'কুল্লীভাট', 'চামেলী' এবং 'কালে কারনামে', রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'জীনে কে লিয়ে', 'ভাগো নহী দুনিয়া কো বদলো' এবং যশপালের 'দিব্যা' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে একটা বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমি গড়ে উঠেছে। প্রেমচন্দ্র ও যশপাল তাঁদের সৃষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষ ও সমাজকল্যাণের আদর্শকে তুলে ধরেছেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূল চরিত্র ও কাহিনীকে সমাজের অমোঘ শাসন ও নিয়মকানুন, প্রথা ও সংস্কারই নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাই এগুলিও 'সামাজিক উপন্যাসে'র শ্রেণীভুক্ত।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সামাজিক উপন্যাস রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু উল্টোটা সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্র ও হিন্দী ঔপন্যাসিক প্রেমচন্দের উপন্যাসে রাজনৈতিক উপাদান অবশ্যই পাওয়া যায় কিন্তু 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা', 'প্রেমাশ্রম', 'সেবাসদন' বা 'গোদান' বিষয়বস্তুর বিচারে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত নয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে প্রায় একই কথা। রাজনৈতিক উপন্যাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কিন্তু রাজনৈতিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস উভয়ের শ্রেণীগত চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। একথা ঠিক যে ইতিহাস একদিক থেকে রাজনৈতিক ঘটনা। কিন্তু ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে নিজেই শিল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। সেখানে একটি দেশ ও জাতির অতীত কোন যুগের শাসনব্যবস্থা, সংগ্রাম, দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কৃতির ধারাবাহিক একটি বিবরণের সাহায্যে যুগের ভাব পরিমণ্ডলটি এমনভাবে তৈরি হয় যাতে অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান একসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। ইতিহাসের নায়ক মহাকাল। ইতিহাস সেখানে সমাজের দর্পণ। যেমন গিবনের ইতিহাস। কিংবা অতীত ঘটনাবলীর সাহায্যে লেখক সমসাময়িককালের জীবনেতিহাসের রীতি-নীতি, শাসনপ্রণালীকে মূর্ত করে তুলতে পারেন, যেমন মেকলে। জনৈক সমালোচক বলেছেন, ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে নিজের ইচ্ছা, বা আদর্শ অনুসারে বিবর্তিত করতে পারেন না। পারেন না ইচ্ছামত পাল্টাতে ঘটনার গতি। ঐতিহাসিক উপন্যাসকার তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের ঘটনা বা চরিত্রগুলির ব্যাখ্যা করতে পারেন, নূতন করে মূল্যায়ন করতে পারেন কিন্তু স্বেচ্ছায় তার ঘটনা বা আদর্শকে পাল্টাতে পারেন না।[৩] তাই যুগের (চিন্তা, আদর্শ, দলাদলি ও জীবনচর্যার) পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে বারে বারে নূতন ইতিহাস লেখার দরকার হয়। কারণ প্রত্যেক মানুষ একই ঘটনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে। তাই রাজনৈতিক দলগুলির এবং নেতাদের কাছে ইতিহাস হল অমোঘ প্রেরণার বিষয়। এঁরা প্রত্যেকেই অতীত থেকে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত উপাদান সংগ্রহ করেন; নির্বাচন করেন, মূল্যায়ন করেন, ব্যাখ্যা করেন—যাঁর যেমন অভিপ্রায়। প্রকৃত ঐতিহাসিক কখনও সজ্ঞানে সত্যকে বিকৃত করতে পারেন না। একমাত্র প্রচারক ঐতিহাসিকই মনে করেন, তিনি যা বলছেন তাই সত্য, আর রাজনৈতিক প্রচারণা সব ক্ষেত্রেই ইতিহাসকে আড়াল করে এবং সাহিত্যকে নন্দনলোক থেকে নির্বাসিত করে।

ইতিহাসের ঘটনা-কাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের অনেকগুলি উপাদান খুঁজে পাওয়া গেলেও উভয়রীতির শিল্প পৃথক। ইতিহাস অতীত-কালের ঘটনা-কাহিনী; সমসাময়িক বা বর্তমান কালের ঘটনা-কাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে ঔপন্যাসিক পরিবর্তন করতে পারেন না। সুতরাং অতীতের ঘটনার উদ্‌ভ্রান্তি, উগ্র উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলা, সংগ্রাম ও সংঘর্ষ কিংবা নতুন সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রস্থাপনের আদর্শ, আকুতি প্রভৃতি প্রকাশ পেলেও বর্তমান যুগের কাছে সেটি হয়ত মূল্যবান তথ্যরূপে উত্তেজনা ছড়ায় না, যা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাজা, বাদশাহ্ বা শাসক—এঁরাই নায়ক, এঁদেরই ভূমিকা মুখ্য। দেশের সাধারণ মানুষ অনেকটা গৌণ হয়ে গিয়ে চালচিত্র রচনার মতো অবস্থান করে। কিন্তু রাজনৈতিক উপন্যাসে দেশের শাসকের ভূমিকা গৌণ, সাধারণ মানুষের গুরুত্বই বেশী। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য জীবনের শাশ্বত মূল্যবোধ যা ইতিহাস রসরূপে পাঠক ও লেখকের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। কিন্তু রাজনৈতিক উপন্যাসে শাশ্বত মূল্যবোধ আচ্ছন্ন। এখানে আবেগপ্রবণতা ও ভাবোচ্ছ্বাস সঞ্চারের মধ্য দিয়ে পাঠক ও লেখকের মধ্যে সংযোগ রক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক উপন্যাসে সমাজের অমোঘ নিয়ম অনুশাসনের কথা থাকতে পারে কিন্তু সেই অনুশাসন, প্রথা ও নিয়মের কাছে মাথা নত করে নয়, তাকে পরিবর্তন করার জন্য আন্দোলনই বড় কথা। অর্থাৎ রাজনৈতিক উপন্যাসে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামই বড় হয়ে উঠে। মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ, সুন্দর ও সুখকর করার জন্যই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। কারণ মানুষের সুখ-শান্তি নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার ও দেশের শাসনব্যবস্থার নীতি-নিয়ম আদর্শের ওপর। সেই নীতি-নিয়ম-আদর্শ যদি জনমুখী না হয় যদি কল্যাণকামী না হয়, ব্যক্তির স্বার্থ যদি সমষ্টির স্বার্থকে বিনষ্ট করে, তখন সেই নিয়ম-আদর্শ পাল্টাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সংগ্রামের চেষ্টাকে রাজনীতি নামে অভিহিত করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে 'সামাজিক উপন্যাসে' সমাজ-অনুশাসন, সমাজজীবনপ্রবাহ অপেক্ষা সুষ্ঠুতর সমাজে পরিবর্তন, বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা, তার জন্য আন্দোলন, সংগ্রাম প্রভৃতি বড় হয়ে উঠে, সমাজচিত্র থাকলেও তাকে 'রাজনৈতিক উপন্যাস'রূপে চিহ্নিত করাই যুক্তিসঙ্গত।

রাজনৈতিক উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া খুবই মুশকিল। কোন শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত মন্ত্রী-পরিষদের বা লোকসভার অথবা রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের কার্যাবলীর আলোচনাকে যদি উপন্যাসের বিষয়বস্তু করা যায়, তাহলে রাজনৈতিক কাঠামোর উপরতলাটা হয়তো জানা যাবে, কিন্তু আসল যে ভিত্তি সেটাই অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত থেকে যায়। কোন ঔপন্যাসিক সর্বহারা শ্রেণীর চিত্র অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র অঙ্কন করলেন, তাদের উপর অত্যাচার-অবিচার ও নিপীড়নের চিত্র অঙ্কন করলেন, তাহলেই কি তাকে রাজনৈতিক উপন্যাসরূপে অভিহিত করা যাবে? বোধ হয় না।[৪]

প্রেমচন্দের হিন্দী 'গোদান' উপন্যাসে দরিদ্র কৃষকদের উপর, কারখানার দিনমজুরদের উপর শাসক ও মিলমালিকদের অত্যাচার-নিপীড়ন মর্মন্তুদ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিকারের জন্য তার বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন বা সংগ্রাম-সংঘর্ষ কি ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন? উত্তরে বলতে হয়, না। কাজেই 'গোদান' উপন্যাসে রাজনৈতিক পটভূমি থাকলেও তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঠিক তেমনি 'নীলদর্পণ' নাটকে দরিদ্র কৃষক এবং রায়তদের ওপর বিদেশী বণিকের অত্যাচার-নিপীড়ন নাট্যকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই শাসক ও বিদেশী বণিকের বিরুদ্ধে নিপীড়িত-নির্যাতিত কৃষক ও রায়তদের কোন রাজনৈতিক আন্দোলনকে নাট্যকার তুলে ধরেননি, কাজেই 'নীলদর্পণ' নাটকে রাজনৈতিক পটভূমি থাকলেও একে রাজনৈতিক নাটকরূপে অভিহিত করা যায় না। রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে Blotner বলেছেন: 'The primary criterion for admission of a Novel to this group (political) was the portrayal of political acts, so many of them that they formed the Novel's main theme or, in some cases a major theme. These acts are not always obvious ones like legislating.'[৫]

রাজনৈতিক উপন্যাসের বিষয়, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন:

"সমসাময়িক জগতের উদ্‌ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা যেমন কাব্যে তেমনি রাজনৈতিক সংগ্রামের উগ্র উত্তেজনা, বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষ, নূতন

রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা স্থাপনের স্বপ্নবিহ্বল আকুতি ও সুকুমার আদর্শবাদ উপন্যাসে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। সেজন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর, ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতা কংগ্রেস ও কমিউনিজম মতবাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, স্বাধীনতা লাভের পর বৈষম্যবর্জিত নূতন সমাজ গড়ার একাগ্র প্রচেষ্টা, দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা নিয়ে আধুনিক যুগে বহু উপন্যাসই রচিত হয়েছে। এই দেশব্যাপী উত্তেজনার মোহ যেন সাহিত্যিককে পেয়ে বসেছে ও তার শাশ্বত মূল্যবোধকে অনেকটা আচ্ছন্ন করেছে। এ বিষয়ে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এমন একটি অনায়াসলভ্য যোগসূত্র বর্তমান, এমন একটি সুলভ আবেগপ্রবণতা ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশোন্মুখ,—লিখতে বসলেই এমন একটি নিবিড় আবেগ ঘনিয়ে আসে যে, এই প্রলোভন সংবরণ অমানুষিক আত্মসংযমের ব্যাপার। দেখতে দেখতে নদীতে জোয়ার আসার ন্যায়, ভাবের ও ভাষার দুর্দম উচ্ছ্বাসে উপন্যাসের কলেবর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাঠকের সঙ্গে রুচিসাম্য, ভাবোচ্ছ্বাসস্ফীত নিজ অন্তরের সমর্থন, প্রতিবেশের বৈদ্যুতিক শক্তির প্রাণময়তা —জনপ্রিয়তার নিশ্চিত আশ্বাস—কোন লেখক এই সমস্তের সম্মোহন প্রভাব অতিক্রম করে ভবিষ্যতের প্রমাদহীন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি নিজ লক্ষ্যকে নিবদ্ধ করতে পারেন। রাজনৈতিক উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন দেহেমনে এমন আরাম ও তৃপ্তি আনে যে এতে গা ভাসালেই স্রোতোবেগে চরম সিদ্ধির উপকূলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে।'[৬]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশক সূত্র পাই যা থেকে সামাজিক, ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে রাজনৈতিক উপন্যাসকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারি। রাজনৈতিক উপন্যাস সম্পর্কে তার পথনির্দেশ :

ক) সমসাময়িক কালের ঘটনা।

খ) উদ্‌ভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা, উগ্র উত্তেজনা বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষ, নূতন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা স্থাপনের স্বপ্নবিহ্বল আকুতি ও সুকুমার আদর্শবাদ।

গ) উগ্র উত্তেজনার মোহে জীবনের শাশ্বত মূল্যবোধ অনেকটা আচ্ছন্ন।

ঘ) সুলভ আবেগপ্রবণতা ও ভাবোচ্ছ্বাসের সাহায্যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা।

ঙ) প্রতিবেশের বৈদ্যুতিকশক্তির প্রাণময়তা।

চ) জনপ্রিয়তার আশ্বাস।

অর্থাৎ রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন খুবই কঠিন। এক-দিকে, সমগ্র মানুষ তার স্বভাব-প্রকৃতি, সমাজ পরিবেশে তার আবির্ভাব থেকে বিকাশের স্তরে স্তরে পরিণতি পর্যন্ত এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুসারে সামাজিক বিবর্তন—উভয়কে মিলিয়ে ঔপন্যাসিককে তাঁর content বা বিষয় গড়ে তুলতে হয় যেমন, তেমনি, তাকে কি রূপ দেবেন, কেমনভাবে প্রকাশ করবেন—অর্থাৎ, তার form-এর দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সমালোচক রাজনৈতিক উপন্যাস সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

'ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি।'[৭] রাষ্ট্রনীতি অর্থাৎ রাজনীতি জনজীবনের অত্যবশ্যকীয় অঙ্গস্বরূপ। তাই রাজনৈতিক আবর্তের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে কোনো সচেতন শিল্পীই নিস্পৃহতার নির্মোকে এড়িয়ে যেতে পারেন না।

তাই রাজনৈতিক উপন্যাস আর উপন্যাসে রাজনীতি—এক নয়, যদিও শুনতে কাছাকাছি। প্রথম শ্রেণীর মুখ্য লক্ষ্য প্রকাশ, দ্বিতীয়টির উপাদান। যে হাওয়ায় বাস করি শ্বাস নিই, সেই হাওয়া যে লেখায় মিশবে এ আর বেশি কি? অনেক রাজনৈতিক কথাসাহিত্যের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক প্রচার কিংবা ভাবের উদ্বোধন। অনেকগুলির ক্ষেত্রে পরোক্ষ উপায়েও প্রত্যক্ষ ফল মেলে। দৃষ্টান্ত: 'আনন্দমঠ'। শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে এটা বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়, কিন্তু এর ঐতিহাসিক ভূমিকা অপরিমেয়, অসীম। রবীন্দ্রনাথ বরং তাঁর 'ঘরে-বাইরে' বা 'চার অধ্যায়'-এ যা বলতে চেয়েছেন তা বলেছেন সোজাসুজি। সমসাময়িক রুচির পরোয়া না করে লেখক প্রচার করেছেন সেই মন্ত্র, যার মর্মবাণী—একলা চলোরে।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'-র উদ্দীপনাকে অস্বীকার করা যায় না, যদিও আমার মতে তাঁর প্রধান চরিত্রটির মধ্যে রাজনৈতিকতা যত সক্রিয় হয়েছে তার চেয়ে বেশি তার কথার আতসবাজির চমক। বিদেশে সার্ত্র-এর 'এজ অব রিজন'-এ বুদ্ধির বিভার সঙ্গে মিলেছে হৃদয়ের প্রভা। স্টাইনবেকের 'গ্রেপস অফ রথ'-এতেও কতকটা তাই পাই—যদিও তিনি কদাচ 'টু গড আননোন' (কস্মৈ দেবায়)-এর সন্ধানী। বাংলার রাজনীতির সঙ্গে মানবিক অনুভূতির শ্রেষ্ঠ

সমন্বয় সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'। যেসব গ্রন্থের প্রসঙ্গ রাজনীতি, পূর্বসূরীরা বোধ হয় এত সফল নন—না বঙ্কিম, বা রবীন্দ্রনাথ, না তারাশঙ্কর না মানিক। বরং মহাশ্বেতা সেই কাহিনীটিতে উত্তীর্ণ যেখানে একটি মহিলা এক মা, আপন স্বজন-পরিজনের মধ্যেই 'প্রবাসী' (হাজার চুরাশির মা) অর্থাৎ শেষ কথা সেই মানবিকতা, সেই হৃদয়বৃত্তি। পলিটিক্যাল কথাটা শুধু লেবেল, যা খসে পড়ে। কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক উপন্যাসে অবশেষে থাকে কিছু সূচিমুখ স্মৃতি। আসলে জল ছুঁতে পারি, পান করতে পারি, স্নানেও দোষও নেই, কিন্তু যেন না ডুবি। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত সম্পর্কেও সেই কথা। ঘটনা মিলায়, মানুষ থাকে। থাকে সার আর বস্তু। সেই 'রিয়েলিটি' সুপিরিয়র টু সুপারফিসিয়াল পলিটিক্স' আর অন্তিম অনুভবে বোঝা যায় 'ফ্যাক্ট ইজ স্ট্রেনজার থ্যান ফিকশ্যান'।[৮]

"লেখকের কাছে রাজনীতি বলতে কী বোঝায়? আমি ঠিক স্পষ্টভাবে জানি না, আমার লেখা গল্প, উপন্যাস রাজনৈতিক কি না। সংজ্ঞার ব্যাপারে আমি সাবধানী। আমার 'শব্দের খাঁচায়' উপন্যাসে আমি আবার পাঠকদের বলেছি একই সঙ্গে গান্ধীজী ও মার্কসবাদী আপ্তবাক্য কীভাবে আমাদের বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। লেখকের পক্ষে আমি সংগঠিত রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি মনে করি গভীর অর্থে রাজনীতি আমার লেখার অন্যতম প্রেরণা।"[৯]

রাজনৈতিক উপন্যাস সম্পর্কে অন্য আরেকজন লেখক মন্তব্য করেছেন: "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করেছেন। এই উপন্যাসে বঙ্কিমের সৃষ্টি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি পরবর্তীকালে জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে। বঙ্কিমের পর রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক উপন্যাসে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা নিয়ে এলেন। 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়'-এর মতো রাজনৈতিক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মানবিকতার দিকটি বড় করে তুলে ধরেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী ও গোপাল হালদার রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শের উত্তরসূরী। যুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে সাহিত্য ও রাজনীতিকে পার্টির নীতির দ্বারা পরিচালনা করতে গিয়ে শিল্পী, সাহিত্যিকদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। পার্টির নীতি বদলের সময় এই ঘটনা ঘটে। আমিও সেই জেলে গিয়েছিলাম, জেল থেকে ফিরে এসে আমার

মনে হয়, পার্টির মধ্যে থেকে, পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।

"আমি মনে করছি আজকে রাজনীতি আমাদের জীবনে এমন গভীরভাবে গেঁথে গেছে যে রান্নাঘর থেকে যাগযজ্ঞ, রাজনীতির হাতের ছোঁয়া সর্বত্র। অতএব কোনক্রমেই রাজনীতিকে বাদ দিয়ে কিছু লিখতে পারি না। আমার প্রথম গল্প 'আঁধারের কথা' কিম্বা 'মানুষ'-এ আমি এই রাজনীতির কথাই বলেছি। বেশির ভাগ উপন্যাসেও তাই।"[১০]

সাহিত্যিকদের এই বক্তব্য সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বরনাথ রেণুর রাজনৈতিক উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও ভূমিকা নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করে।

রাজনীতিচর্চা এবং সাহিত্যচর্চা বিপরীতমুখী বিষয়। রাজনীতির উদ্দেশ্য সমাজে এবং রাষ্ট্রে মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সামাজিক মানুষের অবস্থা এবং প্রকৃতিকে তুলে ধরা। প্রচলিত সমাজধারায় এবং সনাতন সমাজবিধির প্রয়োগে মানুষের দুর্দমনীয় অজেয় আত্মার জাগরণ, সেইসঙ্গে মানুষের চিরন্তন বৃত্তির উন্মেষ। মানুষের প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ও মানুষ ইত্যাদি সূক্ষ্ম দিকগুলিই সাহিত্যিকদের কাম্য বিষয়।

অবশ্য উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সাহিত্যকার ও রাজনীতিকের-এর মধ্যে মিল আছে। উভয়েরই কাম্য অশুভশক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটাই অধিক, কারণ রাজনীতির বহু পথ এবং মত থেকে অন্য মত এবং পথগুলি খণ্ডন করে স্ব-অনুসৃত পথনির্দেশ করা এবং নিজ দলের আদর্শ তুলে ধরা রাজনীতিকারদের কাজ। অপরদিকে বহু মানুষের ভিড়ে থেকেও সাহিত্যিকরা নৈর্ব্যক্তিক থাকেন। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় যে নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধি সাহিত্যে থাকলেও রাজনীতিতে থাকতে পারে না।

সতীনাথ ভাদুড়ী ও হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে একথা উল্লেখনীয় যে উভয়েই রাজনীতিবিদ্ সাহিত্যিক ছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শের রক্তস্রোত উভয়ের ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল। তাই উভয়ের চিন্তা, কর্ম এবং আদর্শের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল-না। তাই রাজনীতির এই অকৃত্রিম চেতনা উভয়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু উভয়ের শিল্পদৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য আছে। ভাদুড়ীজী তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসে শিল্পদৃষ্টির তাগিদে কোথাও আপোস করেননি। কিন্তু রেণুজী শিল্পের সত্যকে স্বীকার করলেও দেখা যায় যে এঁদের মত নির্ভেজাল মানুষ সে যুগে দুর্লভ ছিল। উভয়েই বাস্তব সচেতন

লেখক ছিলেন। পুরোপুরি রাজনীতিতে আসার আগে সতীনাথ ভাদুড়ী পূর্ণিয়া শহরে ছাত্রাবস্থায় যৎসামান্য রাজনীতি করেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এসেছিল পূর্ণিয়ায়। গান্ধী-শিষ্য গোকুলকৃষ্ণ রায়ের নেতৃত্বে পূর্ণিয়ার কংগ্রেস সংগঠন গড়ে ওঠে। সতীনাথ চোখের সামনে তা দেখে-ছিলেন। তারপর আইন পাশ করে পূর্ণিয়া জজ কোর্টে ওকালতি করলেন সাত বছর (১৯৩২-৩৯)। তারপরই জেলাশুদ্ধ অধিবাসীকে সচকিত ও বিস্মিত করে ঝাঁপিয়ে পড়েন সক্রিয় রাজনীতিতে ২৪শে সেপ্টেম্বর '১৯৩৯—যোগ দেন সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ চৌধুরীর টিকাপট্টি আশ্রমে।

সতীনাথের মতো অন্তর্মুখী মানুষ গৃহত্যাগ করে সক্রিয় রাজনীতিতে কেন গিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন: 'মানুষকে সে ভালবাসত। তার কাজে প্রেরণা যোগাত তার আশাবাদী মন। তার ভাবপ্রবণ মনে একটা আদর্শবাদিতার মোহ জন্মেছিল ছোট-বেলাতেই। এর প্রাবল্যে সংসার ধর্ম করবার কথা তার মনের কোণায় উঁকি-ঝুঁকি মারবার পর্যন্ত সুযোগ পায়নি।'[১১]

সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তি নয় বছর (১৯৩৯—৪৮)। সতীনাথ তিনবার কারাবরণ করেন। প্রথমবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক বছরের বন্দীজীবন হাজারিবাগ জেলে (১৯৪০), দ্বিতীয়বার ছ-মাসের জন্য (১৯৪১), তৃতীয়বার বিয়াল্লিশের আন্দোলনে (১৯৪২—৪৪) প্রথমে পূর্ণিয়া সেণ্ট্রাল জেলে, পরে ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সতীনাথ পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী হয়েছিলেন (১৯৪১)। ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকার সময় (১৯৪৩-৪৪) 'জাগরী' উপন্যাস রচিত হয়। ১৯৪৭-এর জানুয়ারীতে কিষণগঞ্জের বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন সতীনাথ। তখনো তিনি জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে জেনে তিনি কংগ্রেস ছাড়েন ১৯৪৮ সালে। এরপর কিছুদিন সোসালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন।[১২]

সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবনের কিছু কিছু মিল আছে। যদিও অমিলটাই বেশী। ফণীশ্বরনাথ রেণু মাত্র একুশ বছর বয়সে নিজের পড়াশোনা বন্ধ করে ১৯৪২-এর আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তিন বছর বন্দী জীবন কাটান। এরপর ১৯৫০-এ নেপালের মুক্তি আন্দোলনে বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কোইরালার সঙ্গে অংশ

গ্রহণ করেন। 'সোশালিস্ট' পার্টির কর্মকর্তারূপে একাধিক কৃষক-মজদুর আন্দোলনে যোগ দেন এবং আবার এক বছরের জন্য জেল যান। এরপর জরুরী অবস্থার সময় তিনি সোশালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের পরিপূর্ণ বিপ্লব আন্দোলন-এ যোগ দিয়েছিলেন। সে সময়েও সরকার ছ-মাসের জন্য তাঁকে জেলে বন্দী করেছিল। রেণু সমাজবাদেরই সমর্থক ছিলেন। সমাজবাদ ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন একথা তিনি আজীবন সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা কখনই মনে করেননি। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য তিনি আজীবন বিদ্রোহ করেছেন। কিন্তু বাংলা ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর কাছে ভাবাবেগ অপেক্ষা ভাবাদর্শটাই বড় ছিল। তাই তিনি ছাত্রজীবন সমাপ্তির পর এবং কর্মজীবনে প্রবেশের পর বেশ পরিণত বয়সেই রাজনীতিতে যোগদান করেন। অ্যগষ্ট আন্দোলনের বিপ্লবের দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি পুরোপুরি সমাজবাদী সমর্থক ছিলেন।

অপরপক্ষে ভাদুড়ীজী ১৯৪৮-এর গোড়াতেই কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। কারণ তিনি যে আদর্শ ও বিশ্বাস নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে সে আদর্শ তিনি খুঁজে পাননি। তিনি যে স্বাধীনতার জন্য একদিন সংসার ত্যাগ করেছিলেন তার অসারতা উপলব্ধি করতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। সতীনাথ ভাদুড়ী সত্যানুসন্ধানী আত্মমগ্ন পুরুষ ছিলেন। কি সাহিত্যকর্মে, কি ব্যক্তি জীবনে কোথাও তিনি আপোস করেন নি।

ফণীশ্বরনাথ রেণু মানুষকে বিচার করেছেন কখনও মার্কসীয় যুক্তিবাদী মন নিয়ে, কখনও বা আবেগের দ্বারা। সমাজজীবনের সামগ্রিক উন্নতি তিনি চেয়েছেন কিন্তু সে সমাজ ব্যক্তির উর্ধ্বে নয়। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী মানুষের বিচারে যেমন আবেগতাড়িত নন, তেমনই প্রখর যুক্তিবাদী বিশ্লেষণও তাঁর স্বভাবধর্ম নয়। তিনি নিজের মগ্নচৈতন্যে যা সত্য বলে জেনেছেন, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাকে অচেনা বলে মনে হয়েছে, গ্রহণে বা বর্জনে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সমান অবিচলিত থেকেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বরনাথের রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়।

সতীনাথ ও হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ উভয়ের উপন্যাসগুলি

উভয় সাহিত্যের ইতিহাসে রাজনৈতিক উপন্যাসরূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯—৪৫) পটভূমিতে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রাম সতীনাথ ভাদুড়ী ও হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে গান্ধীজীর অনশনের (১৯৩২) পরেও সাম্প্রদায়িকতার বীজ উৎপাটিত হয়নি। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের ফলে বৃটিশ ভারতে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসনক্ষমতায় এলেও (১লা এপ্রিল ১৯৩৭) সমস্যার সমাধান হয়নি। অন্য প্রদেশে, বিশেষত বাংলা ও বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে পারেনি। যদি কংগ্রেস সেদিন ফজলুল হকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলায় 'কোয়ালিশন' মন্ত্রীসভা গঠন করত, হয়ত পরবর্তী ইতিহাস এত মর্মান্তিক হত না। তা না হওয়ার ফলে বাংলা মুসলিম লীগের কুক্ষিগত হল। শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ দাঙ্গা (১৬ই আগস্ট ১৯৪৬) কেবল কলকাতাকে নয়, সারা ভারতকে রক্তস্নান করাল। কংগ্রেসের বিখ্যাত 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব (৮ই আগস্ট ১৯৪২) গ্রহণের পরে পরেই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেন, পরদিন (৯ই আগস্ট ১৯৪২) শুরু হল আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২), যা আদৌ অহিংস ছিল না। এই আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু তাঁর 'কিতনে চৌরাহে' উপন্যাস রচনা করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'ও এই পটভূমিতে রচিত। আর এখানেই তাঁদের চরিত্রগুলির মধ্যে তীব্র তিক্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটেছে। শুধু তাই নয়, উভয়ের উপন্যাসগুলির মূল্যায়নে যে পার্থক্য দেখা যায়, তার মূলে আছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের বিভিন্নতা। 'জুলুস', 'কিতনে চৌরাহে' বা ভাদুড়ীজীর 'জাগরী'র সমালোচনায় মেরুপ্রতিম ব্যবধানই তার প্রমাণ।

১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এক রাত্রির কাহিনী সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'। উপন্যাসের চারটি অংশে চারজনের স্বগত চিন্তা বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। সোশালিস্ট পার্টির নিয়োজনে বিয়াল্লিশের সহিংস বিধ্বংসী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ফলে বৃটিশ প্রশাসনের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বিলুর ফাঁসি হবে আগামীকাল ভোরে। সে রয়েছে ফাঁসি সেলে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তার ছোট ভাই নীলু। সে রয়েছে জেলের বাইরে 'জেলগেটে' ভোরে তার দাদার মৃতদেহ নিয়ে যাবে বলে। এই কারাগারের

'স্রাপার ডিভিশন ওয়ার্ড'-এ রয়েছেন বিলু ও নীলুর বাবা—মাস্টারজী, নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী। আর মা রয়েছেন 'আওরৎ কিতা'য় তিনি রাজনীতি করেন না, স্বামীর পদাঙ্কগামিনী। নিজের, অথবা, প্রিয়তম একটি প্রাণের আসন্ন অপঘাত সামনে রেখে চারটি চরিত্র আত্মচিন্তায় মগ্ন। তাদের সেই আত্ম-চিন্তায় কেবল আত্ম-উদ্‌ঘাটন হয়নি, সেইসঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে ঘটনাপুঞ্জও, বিবৃত হয়েছে অনুপুঙ্খভাবে। রাজনৈতিক সংকটের তীব্রতার সঙ্গে এই উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিজীবনের নিবিড় চিন্তা, বারবারই বাইরের পরিবেশ থেকে চরিত্র চলে গেছে ভাবলোকে, বস্তুলোকের সক্রিয়তা থেকে আত্মমগ্নতায়। 'বিপ্লবের বস্তুরূপ' এখানে অবহেলিত হয়নি, কিন্তু তা প্রাধান্য পায়নি।

বাংলা সাহিত্যে 'জাগরী' একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। যেমন হিন্দী সাহিত্যে 'জুলুস'ও একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। জেল বা কংগ্রেস আন্দোলন নিয়েও বাংলায় একাধিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। অনুরূপ হিন্দীতেও কৃষক বিপ্লব, কংগ্রেস আন্দোলন নিয়ে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাংলায় 'জাগরী'র মত এবং হিন্দীতে 'জুলুস' ও 'কিতনে চৌরাহে'র মত সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস রচিত হয়নি। তার কারণ সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বরনাথ রেণুর মত সত্যনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা খুব কম লেখকের মধ্যেই ছিল।

রাজনীতি সম্পর্কে সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ রেণু উভয়েই তাত্ত্বিক এবং বিশ্লেষণী মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন। উভয়েই একই জেলে দীর্ঘ দিন একসঙ্গে বাস করেছেন। সতীনাথের জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতা বিস্ময়কর ছিল এবং তা ফণীশ্বরনাথ রেণুকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত করেছিল। ভাদুড়ীজী রাজনীতির ক্ষেত্রে গ্রহণ এবং বর্জনে আত্যন্ত সক্রিয় এবং সচেতন ছিলেন। 'জাগরী' তাঁর এই নিবিড় চেতনার স্বাক্ষর বহন করে আছে। জেলের পরিবেশে মানুষকে অনেক বেশী করে চেনা যায়। 'জাগরী'র চরিত্রগুলি তাই লেখকের একান্ত-ভাবে চেনা ছিল। ফণীশ্বরনাথ রেণু স্মরণ করেছেন কিভাবে 'জাগরী'র চরিত্র-গুলিকে তিনি নিজের দেখা চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন: "জাগরী'র পাণ্ডুলিপি কেউ পড়েননি। আমার মাঝে মাঝে খুব হাসি পেত। অনেক ব্যক্তিকে দেখে মনে মনে ভাবতে থাকতাম আপনাদের স্কেচ 'জাগরী'তে আঁকা হয়ে গেছে নিখুঁতভাবে।"[১৪]

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসধারায় জাগরী যে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে, তার কারণ

এখানেই নিহিত। মানুষ কি কেবল 'পলিটিক্যাল বিয়িং' মাত্র? সেটাই কি তার মুখ্য পরিচয়? এ কথাটা কি মানুষের সত্যপরিচয়জ্ঞাপনী, না, 'লেবেল' মাত্র? রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত মানুষের সবকিছুকেই কি ভাসিয়ে নেয়? নিতে পারে? না শেষ পর্যন্ত থেকে যায় কিছু সূচিমুখ স্মৃতি? রাজনীতি বড়, না, মানুষ বড়? রাজনৈতিক দর্শনচিন্তা বড়, না, মানবিক বোধ বড়? রাজনীতির সঙ্গে মানবিক অনুভূতির সংযোগ বা বিরোধ কতটা বা কতদূর? এসব প্রশ্নের উত্তর জাগরীতে পাওয়া যায়। জাগরীর প্রথম প্রকাশকালে সূচনায় গ্রন্থলেখকের ভূমিকা :

'রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ বিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে—এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী।

সম্প্রতি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে। কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করা বইখানির উদ্দেশ্য নয়।

স্থানীয় বর্ণবৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেকস্থলে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।'[১৫]

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে জাগরীর একটি কিশোরপাঠ্য সংস্করণ 'ছোটদের জাগরী' নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক পাঠকদের সুবিধার জন্য সতীনাথ গ্রন্থ-সূচনায় যে একটি অবতরণিকা যোগ করেন তা থেকে জাগরীর বিষয়বস্তুর সারমর্ম জানা যায়।

"পূর্ণিয়ার সব চাইতে বড়ো নেতা 'মাষ্টার সাহেব'। ইনি ছিলেন স্থানীয় সরকারী স্কুলের হেড-মাষ্টার। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর থেকে তিনি পূর্ণিয়াতে আশ্রম করে সেইখানেই থাকেন—অবিশ্যি ইংরাজ সরকারের অনুগ্রহে জেলে না থাকতে হয় সেই ক'দিন। তাঁর দুই ছেলে বিলু, নীলু আর তাদের মাকে নিয়ে তাঁর ছোটো পরিবারটি। আশ্রম ছাড়া আর নিজের ঘরবাড়ি বলতে পরিবারটির কিছুই নেই। এঁদের প্রত্যেকেই দেশের কাজে যখনই দরকার হয়েছে হাসিমুখে কারাবরণ করতে দ্বিধা করেননি।

১৯৪৩ সালের মে মাসের একটি রাত্রির ঘটনা। ঘটনার স্থান পূর্ণিয়ার সেণ্ট্রাল জেল—বিহার।

জেলের মধ্যে অনেকগুলি আলাদা আলাদা ওয়ার্ড থাকে। বড়ো ছেলে,

বিলু আছে 'ফাঁসি সেলে' সে কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টির মেম্বর। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় রেললাইন তুলে ফেলবার অপরাধে তার উপর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। সেল মানে হচ্ছে ছোট ঘর। তাকে রাখা হয়েছে এক নম্বর সেলে। যার ফাঁসির দিন সবচাইতে নিকট তাকেই রাখা হয় এক নম্বর সেলে। বাবা (মাষ্টার সাহেব) গান্ধীজীর শিষ্য। তিনি আছেন জেলের 'আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে'। এ কয়েদীরা অপেক্ষাকৃত আরামে থাকতে পায়।

মা হচ্ছেন জেলশুদ্ধ কংগ্রেসকর্মীর মা। স্বামী এ পথে এসেছেন বলে তাঁকেও দেশসেবার ব্রত নিতে হয়েছে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় পুলিশ কংগ্রেসের কাউকে তো বাইরে থাকতে দেয়নি। তাই তাঁকেও জেলে আসতে হয়েছে। তিনি আছেন জেলের মেয়ে ওয়ার্ডে। মেয়ে ওয়ার্ডেরই হিন্দী নাম 'আওরৎ কিতা'।

১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় যেসব রাজনৈতিক দল মনে করেছিল যে সে সময়ে আন্দোলন করার অর্থ পরোক্ষে ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী করা, তাদেরই একটি দলের মেম্বর নীলু। সে দাদার বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছিল। নীলু জেলগেটের বাইরে অপেক্ষা করছে প্রত্যুষে দাদার মৃতদেহ নিয়ে যাবে বলে।

উপর থেকে সেদিন গভর্ণমেণ্টের হুকুম এসেছে যে বিলুর ফাঁসি স্থগিত থাকবে। জেলের মধ্যে কবে কার ফাঁসি হবে সে কথা প্রচার করা হয় না। তিন নম্বর সেলের অন্য একজন কয়েদীর সে দিন ফাঁসি হবে সে খবর কেউ রাখে না। এক নম্বর সেলে কোনো কারণে না নিয়ে যাওয়ায় সকলেই ধরে নিয়েছে যে আজ বিলুর ফাঁসি হবে।

এই ভুলের কথা পরদিন ভোরে সকলেই জানতে পারে।

চারজন চার জায়গায় বসে সারারাত কত কী ভেবে যাচ্ছে। গল্পের মতো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে তো লোকে ভাবতে পারে না। ভাবনাগুলো মনে আসে খাপছাড়া অসংলগ্নভাবে। সেইরকমভাবেই প্রত্যেকের চিন্তাধারা লেখা হয়েছে।"[১৬]

'ছোটদের জাগরী'র এই ভূমিকা থেকে জাগরী উপন্যাসের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। তার কারণ, 'আনুপূর্বিক আখ্যায়িকা হিসাবে সতীনাথ ভাদুড়ী এই উপন্যাসটি রচনা করেন নি। এক প্রলয়ঙ্কর মুহূর্তের প্রতীক্ষায় চারটি মানব মনে একই সময়ে কী কী ভাব, চিন্তা, স্মৃতির প্রবাহ বহিয়া যাইতেছিল, তাহাই উপন্যাসের বিষয়। Browning-এর 'The Ring and the Book' নামক

আখ্যান কাব্যেও এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং সেই কাব্যের ন্যায় এই উপন্যাসেও মুখ্য উদ্দেশ্য ঘটনার বিবৃতি নয়, মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ। প্রত্যেকের মনে যে টুকরো টুকরো স্মৃতি ভাসিয়া আসিতেছে, তাহাই জোড়া-তাড়া দিয়ে পূর্বাপর কাহিনীটি পাঠককে গড়িয়া তুলিতে হয়। এক হিসাবে আখ্যানের এই পদ্ধতির একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। ইহাতে পাঠকের ঔৎসুক্য ও কল্পনাশক্তি সদা জাগ্রত থাকে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের তাৎপর্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় বাহ্যজগতের, ঘটনাস্রোতের সহিত মানবমনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপলব্ধি হয়। এই জন্য গ্রন্থকার আধুনিক সমাজের চারিটি খাঁটি ও উন্নতমনা নরনারীর চিত্তে এক প্রলয়ের সজ্ঘাতে কি প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে তাহা মনো-বিকলনের পদ্ধতিতে তাহাদের স্বগতোক্তির মাধ্যমে আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এক একটি অধ্যায়,—এক একটি গল্পাংশ মাত্র নয়—এক একটি মানব চরিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি। যখন মৃত্যুর তুহিন শীতল নিশ্বাস মজ্জার ভিতর পর্যন্ত একটি শিহরণ উৎপাদন করে, সেই সময়ে মানুষের মস্তিষ্ক তীব্র গতিতে ক্রিয়া করিতে থাকে: বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সব যেন এক সঙ্গে দেখা দেয়, বিস্মৃতির গর্ভ হইতে কত ছোটখাট ঘটনা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, সমস্ত মিলিয়া একটা অভিনব অনুভূতির এমন কি একটা নূতনতর সত্তার আভাস ফুটিয়া উঠে, মানব আত্মার ও বিশ্বসংসারের গোপন রহস্যের যেন একটা আবছায়া গোচর হয়। উপন্যাসে আধুনিকতার ইহাই একটা প্রকৃষ্ট গৌরব।"[১৭]

রচনাভঙ্গী ও শিল্পকলার দিক দিয়ে সেদিন (১৯৪৫—৫০) 'জাগরী' বাংলা ভাষায় সর্বাপেক্ষা আধুনিক উপন্যাসরূপে দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে জাগরী ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। আগস্ট আন্দোলনের রক্তে রাঙা আগুনঝরা দিনগুলোর সঙ্গে শুধু লেখকের নিবিড় পরিচয়ই ছিল তাই নয়, তিনি নিজেই এর অন্যতম নায়ক ছিলেন। 'জাগরী' উপন্যাস আগস্ট আন্দোলনের ইতিহাসমূলক আখ্যান নয়। ইতিহাসের তথ্য দেখানো লেখকের লক্ষ্য নয়। একটি প্রলয়ঙ্কর মুহূর্ত, সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষায় চারটি মানবমনে একই সময়ে কী কী ভাব, চিন্তা ও স্মৃতির প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল তারই বিশ্লেষণ—এর মুখ্য সাধন। তাই সতীনাথের 'জাগরী' উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাস রীতির আলোচনা খুবই জরুরী।

"জেমস জয়েস, টমাস মান, মার্সেল প্রুস্ত, ফ্রানৎস কাফ্‌কা, আলব্যের কামু,

জঁ। পোল সার্তর, ফ্রাঁসোআ মোরিআক, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে, লাকসনেস, পাস্তেরনাক—এই দশজনই আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের প্রধান শিল্পী। এঁদের উপন্যাসের জীবনজিজ্ঞাসা একাধারে বিশ্বমানবের আত্মসন্ধান ও লেখকের আত্মাবিষ্কার।

এর সূচনা প্রথম বিশ্বসমরকালে। জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ, অলডাস হাকসলি, ডরোথী রিচার্ডসন, মে সিনক্লেয়ার, মার্সেল প্রুস্ত-এর আধুনিক উপন্যাস ১৯১৩ থেকে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এ সময়েই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস (১৯১৬), বাইরের রূপে শিথিল, অসংযত, অথচ ভিতরে ভিতরে শিল্পরীতি ও উদ্দেশ্য-সচেতন এইসব উপন্যাসে ইমপ্রেশনের স্থান নিল এক্সপ্রেশন। বাইরের রূপকে নয়, জীবনের 'ইনার রিয়ালিটি'কে দেখানোই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। যে নতুন 'রূপহীনতা' (ফর্মলেসনেস) অনুসৃত হল তা জীবনের অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অন্তঃসংলাপ, চেতনা প্রবাহ, চিন্তার খাপ-ছাড়া অনুষঙ্গ ও স্বেচ্ছাবিহার, অস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি, অবচেতন, প্রতীক ও তির্যক সংলাপ নতুন রীতির উপন্যাসের প্রধান আয়ুধ। সময়ের ছেদ, চিন্তার বিরতি বা অসংলগ্নতা নানা 'মোটিফ'-এর জটিল পুনরাবৃত্ত সমাহার—তারই মধ্য দিয়ে উপন্যাসের অগ্রগতি ঘটল: সুসংগঠিত নির্দিষ্ট প্লটনির্ভর স্পষ্টপরিণতিমুখী নিটোল কাহিনী অপসৃত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পর জীবনের 'ইনার রিয়ালিটি'র সন্ধান আরো তীব্র ও নির্মম হয়ে উঠল, শিল্পরূপ হল আরো জটিল। ভাষা ও সংলাপের উপর জোর পড়ল। চেতনালোক থেকে অবচেতনলোকে চরিত্রের যাত্রার ইঙ্গিত বহন করে ভাষা হয়ে উঠল উজ্জ্বল, প্রসাধিত ও জটিল। কনফেশন ও ডিটেকশন, অপরাধের স্বীকৃতি ও জীবনের সত্যান্বেষণে একালের ঔপন্যাসিক আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই সঙ্গে আছে আত্মবিশ্লেষণ, যা নির্মম, অকুণ্ঠ ও নিরাসক্ত। তার ফলে উপন্যাসে এসেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতাবোধ ও বিষাদ। আধুনিক জীবনের এই তিন লক্ষণ উপন্যাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। এই পরিচিত পৃথিবীকে মনে হয়েছে অচেনা, নিজেকে মনে হয়েছে 'আউট-সাইডার'। তাই নায়কের আত্মসন্ধান আজ ঔপন্যাসিকেরই আত্মানুসন্ধান।

সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের বাতাবরণ আমাদের অনেকের অপরিচিত লাগে, যদিও আমাদের সমাজ ও ব্যক্তি-জীবন নানা আত্মবিরোধ ও সংঘর্ষে

বিশ্লিষ্ট ও জটিল হয়ে উঠেছে। এক ভয়ঙ্কর জটিল সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা অপরের ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, সহযোগিতা ও বিরোধ, তার আত্ম-বিরোধ ও আত্মানুন্ধান সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের বিষয়। মার্সেল প্রুস্তের নায়ক এক বিশাল স্মৃতিচক্রের আবর্তনরেখানুসরণে জীবনকে সন্ধান করেছে। সময়, প্রেম, ঈর্ষা ও স্মৃতির সমবায়ে গঠিত এক অবরুদ্ধ মনকে দেখানো হয়েছে, যা ইচ্ছে করলেই তার অবরোধ ভেঙে ফেলে নেশায় মাতে। প্রুস্তের উপন্যাসে (\ la Recherche du Temps perolue) প্রেমই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, তাকে ঘিরে যত ঈর্ষা ও সংশয়। তাঁর কাছে প্রেম এক প্রকার রোগ, আত্ম-পীড়নে সদাসচেতন। সময় ও স্মৃতির চতুর্থ আয়তন বিশিষ্ট উপন্যাসধারা মানুষের আত্মানুসন্ধানের বিচিত্র ইতিহাস।

ফ্রানৎস কাফ্‌কার উপন্যাসে (Dear prozess Das scholess) মানুষ নিঃসঙ্গ নয়, যার কাছে জীবন তাৎপর্যময় দুঃস্বপ্ন মাত্র। আপন ত্রাস, রোগ, বিশ্বাসহীনতার শিকার এই নায়ক, সে অপরাধ না করে অপরাধের গ্লানিতে ভোগে। সে উদ্‌ভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত, দিশেহারা, তার মনে হয় সমস্ত দুনিয়া তার বিরোধী আর দুনিয়াকে চালায় যেসব শক্তি তারও বিরোধী। সার্ত্র তাঁর উপন্যাসে (La Nausee La Mar) ব্যক্তিজীবনে ও সমাজে হিংসার ভূমিকা দেখিয়েছেন। সমকালীন ঘটনা তার আকার ও রূপ বর্জন করে এক বিভীষিকা-রূপে তাঁর নায়কের সামনে দাঁড়িয়েছে। বিচ্ছিন্নতা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়েছে নায়ক। কাম্যু অস্তিত্ববাদী চিন্তার শরিক। হিংসা ও সংশয়ে প্রোথিত চিন্তা যুগের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাশ্য উত্তরণে সাহায্য করে না। কাম্যুর উপন্যাসের (La paste La Chute) নায়করা এমন চিন্তার অংশীদার। স্বীকারোক্তি ও আত্মকথনের মধ্য দিয়ে তারা আধুনিক জীবনের ভণ্ডামি ও নীচতা, নিষ্ঠুরতা ও চরিত্রহীনতা, স্বার্থপরতা, ও আদর্শহীনতার নির্মম বিশ্লেষণ করেছে। আর টমাস মান তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাসে (Budden Books, Magic Mountain) ইউরোপের জীবনে অবক্ষয়ের থীমকে শিল্পরূপ দিয়েছেন, আর শেষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসে (Joseph and his Brothers) আধুনিক জীবনের ভিতরের রোগ নির্ণয় করেছেন।"[১৮]

সতীনাথ তাঁর ডায়েরিতে, 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনীতে' এবং 'পড়ুয়ার নোট থেকে' প্রবন্ধে বার বার মার্সেল প্রুস্ত-এর সাহিত্যরীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, কেন প্রুস্ত তাঁর প্রিয় লেখক? কেন 'আলারর্শার্সে দু তঁ পাদ্যু',

উপন্যাস তাঁকে বার বার টানে? এর উত্তর তিনি নিজেই 'পড়ুয়ার নোট থেকে' দিয়েছেন।

"তিনি (প্রুস্ত) আজ সেকেলে কিন্তু পৃথিবীর সাহিত্যের উপর তাঁর প্রভাব আজও শেষ হয়নি। জীবনের আপাততুচ্ছ ঘটনাগুলোর উপর এত গুরুত্ব, তার আগে আর কেউ দেয়নি। সেগুলোর সঙ্গেও যে মানুষের মন জড়ানো। আমি মেশানো। আমার মন বাদ দিয়ে কোনো জিনিসের বা ঘটনার কী মূল্য? অনুভূতির মিষ্টি রঙে রাঙাতে পারলে ছাইমাটিও সোনা হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ জিনিসগুলো সাহিত্যের দরবারে আর অপাংক্তেয় থাকে না। তখন সাহিত্যিকদের কাজ হয়ে ওঠে আরো কঠিন। কোনটুকুকে বাদ দিয়ে কোনটুকু রাখবেন সাহিত্যের মালমসলা হিসাবে লেখকের এই সনাতন সমস্যায়, আগের চেয়ে অনেক বেশি অন্তর্দর্শনের দরকার হয়। কারণ তথাকথিত তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে রসের উৎস বলে নিতে পাঠকের মনে একটা স্বাভাবিক বিরোধ আছে। Proust-এর চেয়ে কম প্রতিভার সাহিত্যিকেরা পাঠকের মন ধরে রাখবার জন্য, লেখকদের জানা কতকগুলি পাঠক-ঠকানো কৌশলের সাহায্য নেন। কিন্তু রুচিবান পাঠকরা এতে ভোলেন না। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া লেখার মধ্যে কোন জিনিসের ভেজাল, তা সূক্ষ্মরুচি পাঠকরা সেই সময় ধরে ফেলেছিলেন। পাঠকের কৌতূহল বজায় রাখবার জন্য Proust কিন্তু সে সব পথ মাড়াননি। আপনা থেকে সেসব জিনিস যখন নিজ মূল্যে এসে গিয়েছে, তখন অবশ্য তিনি সেগুলোকে বাদ দেননি। দিলে তাঁর মনের আড়ষ্টতাই প্রমাণিত হত। কোনো বিষয়ের তুচ্ছতা বা গুরুত্ব আমাদের আরোপ করা জিনিস কতকটা মতামতের ব্যাপার। কিন্তু তুচ্ছতম জিনিসের আড়ালেও কত রহস্য আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। সেই সব রহস্যগুলোর উপর নানা দিক থেকে সন্ধানী আলো ফেলে, তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের চোখের সম্মুখে। এই রহস্যের সন্ধানই আমাদের কৌতূহলকে জাগ্রত করে রাখে। নিছক বিশ্লেষণ নয়; আবার শুধু ভাবানুষঙ্গগুলোকে প্রকাশ করাও নয়; তাঁর লেখার সমগ্র রূপ এ দুইয়েরই উর্ধ্বে। নইলে একটার পর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে আমাদের মন হাঁপিয়ে উঠত।"[১৯]

প্রুস্তের এই পদ্ধতি সতীনাথের পদ্ধতি। প্রুস্ত সম্পর্কে সতীনাথ ভাদুড়ী যেসব কথা লিখেছেন তা তাঁর নিজের সম্পর্কেও প্রযুক্ত। "A La Recherche du Temps perlou পড়াবার পর ধারণা জন্মায় যে বইখানি

যেন চমৎকারিত্বে পূর্ণ অনেকগুলি মুহূর্তের যোগফল। এই মুহূর্তগুলির ব্যাপ্তি অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে বিস্তৃত করে দেওয়া হয়েছে। লেখকের কৃতিত্ব যেন উজ্জ্বল মুহূর্তগুলিকে বাছায়, সাজানোতে, তাদের বিস্তৃতি বাড়ানোর কমানোতে। এই রকমের লেখায় সাধারণতঃ লেখকের দৃষ্টি থাকে, যাতে এক পূর্ণ মুহূর্ত থেকে আর এক পূর্ণ মুহূর্তে যাবার সময় পাঠকের মন ঝাঁকানি না খায়। গাঁথুনি আর জোড়ের দাগগুলো যেন হঠাৎ দেখলে বোঝা না যায়। Proust-এর কৌশল আলাদা। তিনি ঝাঁকানি খাইয়ে খাইয়ে মনকে পুরানো মুহূর্তে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। গাড়ির ঝাঁকানিতে কিছুক্ষণের পর যেমন ঘুম আসে, এবেলায়ও হয় তেমনি। গতির ছন্দ আয়ত্ত হয়ে গেলেই ঝাঁকানি থেকে আরাম পাওয়া যায় দোলনের।"[২০]

এই প্রবন্ধেই সতীনাথ গদ্যভাষায় বিরামচিহ্নের প্রয়োগ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন,—

"যখনই মনে পড়াগুলোকে নিয়ে কোনো লেখা চোখে পড়ে, তখনই ভাবি যে, এর জন্য নতুন একটা বিরামচিহ্ন কেন এখনও সৃষ্ট হল না।...বাংলা গদ্যে আগে একটি দাঁড়ি ছাড়া আর কোন ছেদচিহ্ন ছিল না। পরে প্রয়োজনবোধে আমরা বিদেশী ভাষা থেকে বহু বিরামচিহ্ন বাংলায় নিয়েছি। আর একটা বাড়াতে দোষ কি? মুশকিল হচ্ছে যে এই 'স্মরণচিহ্ন বা চিন্তনচিহ্ন' কোনো বিদেশী ভাষাতেও নেই। অথচ এর দরকার সব ভাষাতেই। মনে পড়া বোঝাতে গিয়ে এক একজন লেখক এক একরকম চিহ্ন-ব্যবহার করেন। কোনো একটি চরিত্রের মনে মনে ভাবা চিন্তাগুলোকে যখন আর সাহিত্য থেকে বাদ দেওয়া যায় না, তখন এর জন্য একটা নতুন চিহ্ন সৃষ্টি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর দরকার বোধ হয় দিন দিনই বাড়বে।"[২১]

আসলে এই ভাবনা ও সতীনাথের উপন্যাস শিল্পপদ্ধতিরই একটি রূপ। সতীনাথ স্মৃতিলোক, চিন্তনলোক ও মনোলোকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে মুক্তি দিয়েছেন। বাইরের বস্তুলোক তাদের কাছে গৌণ। অর্থাৎ এটাই সতীনাথের জাগরী উপন্যাসের পদ্ধতি, মানবমনে রহস্যলোকসন্ধানী আলো ফেলে দেখা। এর জন্য সতীনাথের উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, এগুলি অন্তরলোকের উপন্যাস। যা হয়ে উঠেছে আধুনিক পাশ্চাত্যরীতির উপন্যাসের সহযাত্রী।

পূর্ণিয়া প্রবাসী একটি বাঙালী পরিবারকে কেন্দ্র করে ১৯৪২ সালের আগস্ট

আন্দোলনের পটভূমিকায়—'জাগরী' এক রাজনৈতিক উপন্যাস। কিন্তু নিছক রাজনীতিসর্বস্ব উপন্যাস নয়। এর পটভূমি ও চরিত্র সতীনাথের নিজেরই জীবনের ভগ্নাংশ। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই সতীনাথকে এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। আমার মনে হয় 'জাগরী'র মাস্টারমশাই চরিত্রে পুরুলিয়ার সর্বজনশ্রদ্ধেয় হেডমাস্টারমশাই নিবারণ দাশগুপ্তের ছায়াপাত ঘটেছে। এছাড়া নিজের পিতার ও পূর্ণিয়া কংগ্রেসের সভাপতি গোকুলকৃষ্ণ রায়ের প্রেরণাও এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। 'জাগরী'র মা, জেঠাইমা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যেও নিজের মা ও পূর্ণিয়ার সুপরিচিত খোকা ভাওপরের মা কুসুমকুমারী দেবী আত্মগোপন করে আছেন। সতীনাথ নিজে নীলু ও বিলুর মিলিত স্বরূপ ছিলেন।

'জাগরী' উপন্যাসে বর্ণিত পরিবারটি যথার্থই 'রাষ্ট্রীয় পরিবার'—বাপ, মা, দুই ছেলে। বাপ সরকারী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক হয়েছেন 'গান্ধীবাদী' মাস্টারসাহেব, গান্ধীর আদর্শে আশ্রম গড়ে তুলেছেন, 'গঠনমূলক' কার্যে ব্রতী হয়েছেন, দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। ম. বাঙালী হিন্দু নারীর দৃষ্টান্তস্থানীয়। তিনি গান্ধীবাদ ভাল না বুঝলেও স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর আদর্শেও আস্থাবতী। তাঁর নিজের কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস বা প্রেরণা ছিল না, তবু বিনা আপত্তিতে দেশসেবিকার নিঃস্ব ও কঠোর জীবন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেবল তাঁর দুই পুত্রের জননী নন, সারা জেলার কংগ্রেস কর্মীদের মা। বড় ছেলে বিলু দেশসেবার জন্য ব্যক্তিগত সুখ বাসনা কামনা ত্যাগ করেছে। কিন্তু পরে রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে বাপের সঙ্গে মতভেদ ঘটেছে; কংগ্রেসে থাকলেও সে মার্কস-এর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, সে হল কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির সদস্য। আগস্ট আন্দোলনে সে সক্রিয় হয়েছে, ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য ধরা পড়েছে। ছোট ভাইয়ের সাক্ষ্যে সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। আগামী ভোরে ফাঁসির প্রতীক্ষায় আছে বিলু। আর ছোট ছেলে নীলু বুদ্ধিমান কিন্তু অসহিষ্ণু। বড় ছেলে বিলু ভাবপ্রবণ অথচ তীক্ষ্ণধী, সংযত, আদর্শনিষ্ঠ। ছোট ছেলে নীলু প্রত্যক্ষবাদী, স্পষ্ট বক্তা, নির্ভীক, উদ্ধত। কালক্রমে তার রুচি, প্রবৃত্তি তাকে টেনে নিল কমিউনিস্ট পার্টিতে। সাম্যবাদী দলের আদর্শ ও কর্মধারায় বিশ্বাসপরায়ণতার দরুন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজ শক্তির লড়াইকে 'জনযুদ্ধ' বলে বিশ্বাস করেছে ও ভারতস্থ ইংরেজ সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছে, মূল্য নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত 'জনতা পঞ্চায়েৎ' (people's price control committee) নামক সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েছে এবং তার রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসপরায়ণতার দরুন বড় ভাই বিলুর বিচারের সময় তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, চরিত্র নির্মাণে শরৎচন্দ্রীয় পদ্ধতি অপেক্ষা মার্সেল প্রুস্ত-এর পদ্ধতি (অন্তর্লোকের পদ্ধতি) তাঁর কাছে বেশি সমাদৃত। মানব সম্পর্কের আলো আঁধার প্রদেশে তাঁর অন্বেষণ। রাজনীতি ব্যক্তিমানুষের সব নয়, একটা দিক, রাজনৈতিক পরিচয় সমগ্র মানুষকে প্রকাশ করে না। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সমগ্র মানুষটার উন্মোচন, তা রাজনীতির পরিচয়ে সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসে প্রাণিত হয়ে সতীনাথ অন্তর্লোকের গহন আলো আঁধার রাজ্যে ভ্রমণ করতে চেয়েছেন। জাগরীতে তার সূচনা।

তাই জাগরীতে গান্ধীবাদী বাপ, স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণকারিণী মা, সোশালিস্ট বড়ছেলে ও কমিউনিস্ট ছোটছেলের রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত প্রাধান্যলাভ করেনি। প্রাধান্যলাভ করেছে একটি প্রলয়ঙ্কর রজনীতে চারটি মানবমনে একই সময়ে প্রবাহিত ভাবস্রোত, চিন্তাস্রোত, স্মৃতিস্রোত—এই স্রোতের মধ্যে পাঠক দেখতে পান চারটি বিপর্যস্ত মানবসত্তাকে। তাদের স্মৃতি পর্যালোচনা, সমগ্র জীবন পর্যালোচনা, নিজেকে ও বাকি তিনজনকে নিয়ে গড়ে ওঠা পারিবারিক জীবনের পর্যালোচনা স্বগতোক্তির মাধ্যমে রূপায়িত। একই সময়ে বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, স্মৃতি, সত্তা আলোড়িত হয়। দ্রুত প্রবাহিত ঘটনার মিছিলে মনশ্চক্ষুর সামনে ভেসে যায়, মুছে যায় পারিপার্শ্বিক ছবি—মাস্টারমশায়ের চোখের সামনে থেকে সরে যায় 'আপার ডিভিসন ওয়ার্ড', মায়ের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায় 'আওরৎ কিতা', বিলুর চোখের সামনে থেকে মুছে যায় 'ফাঁসি সেল' আর নীলুর দৃষ্টি থেকে সরে যায় 'জেল গেট'। তারা চারজনেই ফিরে যায় স্মৃতিলোকে, বিস্মৃতিগর্ভ থেকে উঠে আসে কত ছোটখাট ঘটনা, বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সব যেন একসঙ্গে দেখা দেয়,—সব মিলে একটা অভিনব অনুভূতির একটা নূতন সত্তা ফুটে ওঠে, মানব আত্মা ও মানবসত্তার এক নবতর পরিচয় পারিপার্শ্বিককে মুছে ফেলে।

'জাগরী' উপন্যাস রচনার পিছনে লেখকের উদ্দেশ্য কী ছিল—এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সতীনাথ রাজনৈতিক মতাদর্শ-সর্বস্ব চরিত্র নির্মাণে বা ব্যক্তির রাজনৈতিক সত্তা চিত্রণে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর আগ্রহ ব্যক্তিচরিত্রের প্রতি—ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, অপরের সঙ্গে মানসিক দূরত্বের প্রতি। বাপ, মা, বড়ছেলে, ছোটছেলে—চারজনেই নিজ নিজ খরস্রোতা স্মৃতিতে ডুব দিয়েছে, তাদের মনে ভেসে উঠেছে কতদিনের কথা, তা নূতন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। চারজনেই ভাবছে বাকি তিনজন তাকে বোঝেনি, কোথায় যেন বাধার প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—"The feeling of not being understanding the world."[২২]

এটাই লেখক সতীনাথকে বেশি করে টেনেছে। তাঁর মনে হয়েছে একটি মানুষ আর একটি মানুষের কাছে ঠিকমত নিজ মনোভাব পৌছে দিতে পারছে না। "The most moving variation is the realisation of the utter precariousness of human communication (speech etc)."[২৩]

এই যে ব্যবধান, পরস্পরের কাছে ঠিকমত্ পৌছতে না পারা, কম্যুনিকেশনের জট, তা কীভাবে একজন মানুষকে নিঃসঙ্গ, নিষ্প্রভ, ছন্নছাড়া করে দেয়, সেটাই লেখক ধরতে চেয়েছেন 'জাগরী' উপন্যাসে।

এবার 'জাগরী' উপন্যাসের চারটি অধ্যায় অবলম্বন করে আমরা এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারি যে, সতীনাথ ভাদুড়ী এই উপন্যাসে রাজনৈতিক মতাদর্শ অপেক্ষা মানবিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সে কারণে তিনি এই উপন্যাসে কোন পথনির্দেশ করেননি। যেমন করেছেন হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু। তাঁর 'জুলুস' ও 'কিতনে চৌরাহে' ঔপন্যাসে রাজনৈতিক মতাদর্শজনিত সংঘর্ষ ও বিরোধই অধিক প্রাধান্যলাভ করেছে। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী মানবিক সূক্ষ্ম আকর্ষণকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সে কারণেই 'জাগরী' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখকের দাবি—"কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করা বইখানির উদ্দেশ্য নয়।" স্মরণীয় যে, এই উপন্যাসের চারটি অধ্যায়ের চারটি চরিত্র যথাক্রমে রাষ্ট্রবাদী বাপ, স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণকারিণী মা, সোশালিস্ট বড় ছেলে ও কমিউনিস্ট ছোট ছেলে।

চারটি অধ্যায়ের চারটি চরিত্রের জবানীতে একথা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়

যে 'জাগরী' উপন্যাসে রাজনীতি কেবল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়নি। তবে একথা স্বীকার্য যে চরিত্রগুলির মানসিক গঠনে রাজনীতি সক্রিয় থেকেছে। নীলু ও বিলুর যেসব উক্তি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মিল আছে, তা হল—উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আসক্তি ও টান। দুজনে দুজনকে চায়, খুব বেশি রকম চায়। দুজনে দুজনের জন্য ব্যাকুল, তবু দুজনের মাঝখানে অদৃশ্য দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের দেয়াল। এই দেয়ালের পাশে এদের ভাবনাস্রোত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে রাজনৈতিক মতভেদের ব্যবধান অপেক্ষা মানসিক ব্যবধানের দিকে লেখকের ঝোঁক বেশি ছিল। এই 'জাগরী'র মাস্টার সাহেবের সঙ্গে তাঁর পত্নীর ব্যবধান, বিলুর সঙ্গে তার পিতার ব্যবধান, নীলুর সঙ্গে তার ও মাতার ব্যবধান, বিলুর সঙ্গে নীলুর ব্যবধান লেখক সুস্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন। চরিত্রের ভাবনার অন্তঃস্রোত তার স্বগতোক্তি স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত। এই অনুক্ত সংলাপের মধ্যেই গড়ে উঠেছে তাঁর ভাবনালোক, যা আমাদের নিয়ে যায় মানব সম্পর্কের আলো-আঁধারি প্রদেশে। সতীনাথ আমাদের সেখানেই নিয়ে যেতে চেয়েছেন, দেখিয়েছেন মানবমনের জটিলতা। তাই সমকালীন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে 'জাগরী' স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক উপন্যাস।

সতীনাথ ভাদুড়ীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (১৯৪৯)। তাঁর বাস্তব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পটভূমিতে এই উপন্যাস রচিত। "একবার কাটিহার জুট মিলে ধর্মঘট হয়। সেখানেও সতীনাথ ধর্মঘটী মজুরদের সঙ্গে একজন। মিল মজদুরদের সঙ্গে একসঙ্গে একত্র আহার, মাথায় ইটের বালিশ নিয়ে রাত্রি-যাপন এবং লোহার কড়ায় তৈরী রান্না সকলের সঙ্গে খেতেন। সেই সময় বিহারের শ্রম কমিশনার ছিলেন সতীনাথের বন্ধু। এই অবস্থায় বন্ধুকে দেখে তিনি বিস্মিত। তাঁরই হস্তক্ষেপে ও সতীনাথের প্রচেষ্টায় ধর্মঘটীদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় এবং স্ট্রাইক প্রত্যাহার করা হয়।"[২৪] এই মিল-মজুরদের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সতীনাথ 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসের কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখক 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাস দুটি রচনা করেন,[২৫] কিন্তু 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এই উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রমিক মালিক বিরোধে শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকা, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো এবং মর্যাদার সঙ্গে তাদের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা, মালিকের মাত্রাতিরিক্ত লোভ, শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে দমন করার জন্য মালিক শ্রেণীর ঘৃণ্য চক্রান্ত ইত্যাদি উপাদান নিয়েই—'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি রচিত। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরদিন ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের একত্রিশে জানুয়ারী 'বলীরামপুর জুট মিলস্'-এর শ্রমিক নেতা অভিমন্যুর অন্তিম সংকার হচ্ছে নদীর ধারে শ্মশানে।[২৬] অভিমন্যুর মৃত্যুতে মিলের সাহেব ম্যানেজার, দেশী সহকারী ম্যানেজার, মজুর, মজুরনী—অনেকেই নিজেদের দোষী মনে করছে। অভিমন্যুর চিতার সামনে বসে তার বন্ধু সহকর্মী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা শিউচন্দ্রিকা নিজেকে অপরাধী বলে ভাবছে, তার একটু দূরে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ছে মিনাকুমারী যে অভিমন্যুকে ভালবেসেছিল। এখান থেকেই ঘোরানো ফিল্মের চাকার মত গল্পের সূচনা। গল্পের শেষে মিনাকুমারী আত্ম-ঘাতী। সে অভিমন্যুকে ভুল বুঝেছিল, তার ডাকে সাড়া না দিয়ে তার চিঠি হস্তান্তরিত করে দিয়েছিল, তারই ফলে মিল কর্তৃপক্ষ অভিমন্যুকে বেইজ্জত করতে পেরেছিল, শেষে অভিমন্যুর অপঘাতে মৃত্যু।

সদ্যমৃত অভিমন্যুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলীরামপুর জুট মিল মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী শিউচন্দ্রিকা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী খদ্দরের আধছেঁড়া আধময়লা ঝোলা থেকে পরিধেয় বস্ত্র আর একগোছা ছেঁড়া কাগজপত্র বার করে। শিউচন্দ্রিকার চিন্তার অন্তঃস্রোতে বয়ে চলে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু অভিমন্যুর জীবনে। অভিমন্যুর রাজনৈতিক জীবন—শ্রমিকদের লড়াইয়ে নেতৃত্বদান, মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাওনা আদায়ে অভিমন্যুর সহযোগী শিউচন্দ্রিকা। কিন্তু এ ছাড়া অভিমন্যুর জীবনে আর একটি স্রোত এসে পড়েছিল—সে স্রোতের উৎস 'মিনাকুমারী'। বলীরামপুর অনাথালয়ের মেয়ে মিনাকুমারীকে জুটমিলের 'ক্যান্টিন'-এ—মজুরদের খাওয়ার চার্জে নিযুক্ত করে মিলের সহকারী ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ। এই মিনাকুমারীর সঙ্গেই অভিমন্যুর গড়ে ওঠে এক গোপন প্রেমের সম্পর্ক। সদ্যমৃত অভিমন্যুর ঝোলা থেকে পাওয়া—অভিমন্যুকে লেখা মিনাকুমারীর চিঠির সূত্র ধরে শিউচন্দ্রিকার মনে পড়ে যায় অভিমন্যুর জীবনের সব কথা। মনে পড়ে মিনাকুমারীকে লেখা অভিমন্যুর একটি চিঠি কিভাবে মিল-কর্তৃপক্ষ গোপনে যোগাড় করে অভিমন্যুর বিরুদ্ধে, শ্রমিক ইউনিয়নের বিরুদ্ধে, বলী-রামপুরের মজুরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, আর তার ফলে পার্টি-মিটিংয়ে

অভিমন্যুকে পার্টি বার করে না দিয়ে শ্রমিক ফ্রন্ট থেকে কিসান-ফ্রন্টে সরিয়ে দেওয়া হয়। বলীরামপুর থেকে অভিমন্যুকে পার্টি পাঠিয়ে দেয় মঘৈলী থানার শিরনিয়া গ্রামে। সেখানের অত্যাচারী জমিদার অযোধিয়া চৌধুরীর শোষণের বিরুদ্ধে অভিমন্যু নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত চাষীদের সংঘবদ্ধ করে দাবি তোলে—ফসলের ভাগ দিতে হবে: শুরু করে দেয় শিরনিয়ার 'বকাশৎ আন্দোলন'। ফলে জমিদারের লেঠেলরা ও মঘৈলী থানার পুলিশরা অভিমন্যুকে লাঠির পর লাঠি মেরে অর্ধমৃত করে ফেলে এবং জমিদার ও পুলিশের যোগ-সাজসে অভিমন্যুর বিরুদ্ধে লুঠতরাজ ডাকাতি অবৈধ জনতার নেতৃত্ব করার অভিযোগে ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেফতারী পরওয়ানা হাসিল করে। অর্ধমৃত অচৈতন্য রক্তাক্ত দেহ অভিমন্যুকে সেদিন গোপনে নিয়ে আসা হয় বলীরামপুর জুট মিল মজদুর ইউনিয়ন অফিসে। সেইখানেই নিউমোনিয়ায় মারা যায় অভিমন্যু। মহাত্মাজীর মৃত্যুতে শোক মিছিলে তার প্রেমিকা মিনাকুমারীকে দেখে উত্তেজনায় শিখরে উপনীত অভিমন্যু শেষ নিঃশ্বাস ফেলে।

অন্তরঙ্গ বন্ধু অভিমন্যুর এই অকালে অপঘাত মৃত্যুতে শোকাভিভূত শিউচন্দ্রিকা নিজেকে ধরে রাখতে পারে না যুক্তি ও মননের বাঁধা পথে। সে বিচলিত হয়ে মিনাকুমারীর কাছে অভিমন্যুর শেষ স্মৃতি ঝোলাটার সঙ্গে অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্য মিনাকুমারীকে অভিযুক্ত করে চিঠি পাঠায়। শিউচন্দ্রিকার দুছত্র চিঠি পড়ে মিনাকুমারী নিজের ভুল বুঝতে পারে, তার মধ্যে ফিরে আসে অভিমন্যুর প্রতি প্রবল ভালবাসা। বুঝতে পারে মিল কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র। সেদিন অভিমন্যু তাকে ডেকেছিল, আঁধারের মধ্যে দীক্ষিতদের আমবাগানে। সে যায়নি। আজ সেই আমবাগানে সব কাজ ফেলে মিনাকুমারী ছুটে যায়। এই আমবাগানে আবার সে অভিমন্যুকে ফিরে পাওয়ার জন্য গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে নেয় স্কার্ফটা—ধীরে ধীরে কণ্ঠাশ্লেষের মাদকতায় অবসন্ন হয়ে আসে তার দেহ। মিনাকুমারী অনুভব করে, যন্ত্রণার তীব্র মধুরতার মধ্যে সে পাচ্ছে অভিমন্যুকে। এই শেষ মুহূর্তে যখন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে তখন মিনাকুমারী অনুভব করে অভিমন্যুর নিবিড় আলিঙ্গনের শ্বাসরুদ্ধ পেষণ।

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসের এই ঘটনা-পরিণাম দেখানোই সতীনাথের উদ্দেশ্য নয়। চিত্রগুপ্ত ছদ্মনামধারী প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক নিরাসক্তচিত্তে নিরাবেগ মোহমুক্ত দৃষ্টিতে এই উপন্যাসে অভিমন্যুর মৃত্যু ও মিনাকুমারীর

আত্মহত্যার পর্যালোচনা করেছেন।[২৭] যদিও উপন্যাসটির কাহিনীকাল স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে গান্ধীজীর মৃত্যুর পরদিন পর্যন্ত—তবুও এই উপন্যাসের উপাদান আজকের দিনেও সত্য। শ্রমিক মালিক পারস্পরিক সম্পর্ক, শ্রমিকের প্রতি মালিকের শোষণ ও উৎপীড়ন, শ্রমিক সংগঠনের বাস্তবোচিত বর্ণনা, সাধারণ শ্রমিকের নিখুঁত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং মালিক শ্রেণীর স্বরূপ উদ্ঘাটনে সতীনাথ একদিকে যেমন তাঁর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে একটি সংযত বিয়োগান্তক প্রেমের কাহিনী বর্ণনায় তেমনিই কবিত্বশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। সতীনাথের সাহিত্যে যুবক-যুবতীর প্রেমের চিত্র খুবই কম। এই উপন্যাসে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার এই অনাবিষ্কৃত দিকটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি জন-জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত, এ জনজীবন 'শ্রমিক জীবন'। শ্রমিক জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এই উপন্যাসটির মধ্যে একটি করুণরসাত্মক প্রেমের কাহিনীই প্রাধান্যলাভ করেছে।

হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'কিতনে চৌরাহে' ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। আধুনিক হিন্দী উপন্যাসে চেতনা-প্রবাহ বলতে যা বোঝায় তারই প্রথম এবং সার্থক প্রয়োগ 'কিতনে চৌরাহে' উপন্যাসে দেখা যায়। এই রীতিতে ঘটনা অপেক্ষা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রতি বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয় বলে অনেক সময় ঘটনার গতি ব্যাহত হয়। 'কিতনে চৌরাহে' রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সতীনাথের 'জাগরী'র মত মূলতঃ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস—এ ধারণা অসঙ্গত নয়।

অররিয়া কোর্টের সরকারী ট্রেজারীর উপর পতাকা উত্তোলন করার প্রচেষ্টায় পাঁচজন কিশোর গুলি খেয়ে প্রাণ হারায়। এই শহীদ কিশোরদের নাম পিয়োদা, কৃত্যানন্দ, আশরফী, ভোলা ও তপু। এই পাঁচজন কিশোর ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় একটি মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে কিশোর সূর্যনারায়ণ ছোরা বিদ্ধ হয়ে মারা যান। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সূর্যনারায়ণের শিক্ষক হাফিজ সাহেবের দেহেও কেরোসিন তেল ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। সূর্যনারায়ণ এবং শিক্ষক হাফিজ সাহেবের মরদেহ যখন চৌরাস্তায় এসে মিলিত হয় তখন প্রবল জনস্রোতের 'রাম রহিম ন জুদা করো ভাই'-এর রবে সমস্ত পরিবেশ ভরে উঠে। মরদেহদের মিলিত স্থানের এই চৌরাস্তা 'মন্দিরোঁ মেঁ হৈ খুদা এবং মসজিদোঁ মেঁ রাম হৈ' [২৮]ভাবনার,আদর্শের

মিলনমন্ত্র। আকস্মিকতা, নাটকীয়তা ইত্যাদিতে নির্দোষ থেকে 'দর্জ পড়ের দেশ কা কাম' করার জন্য কিশোর বিদ্রোহীদের মনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই উপন্যাসটি রচিত। 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম' লেখকের প্রিয় কবি ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করতেন।[২৯] নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটির প্রভাব লেখকের এই উপন্যাসটির মধ্যে কিছুটা পড়েছে।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি সকলেই কিশোর অবস্থার। কৈশোর কালটাই স্বপ্নের। এ সময়ের ঘোড়াটিও পক্ষীরাজ, মাঠটিও তেপান্তর। অর্থাৎ কৈশোরকালটা মানবজীবনের একটা চোরাবালি। এই উপন্যাসের নায়ক মনমোহন পল্লীগ্রামের এক মেধাবী ছেলে। ছাত্রবৃত্তি নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক অনাবিল আশাকে বুকে নিয়ে সে শহরে এসেছে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে। সে মা বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান। মনমোহনকে শহরে পাঠানোর সময় তার বাবা তাকে বার বার বলেছেন "শহর আকর শহরী লড়কা' মত বন জানা। বিড়ি সিগারেট মত পীনা।"[৩০] মনমোহন বুদ্ধিমান মননশীল ছেলে ছিল, তাই শহরে থেকেও শহরের প্রলোভনে পড়ে সে নিজের জীবনকে নষ্ট করেনি। মাতাল মোহরিল মামার বাড়িতে থেকেও সে মদ কখনও স্পর্শ করেনি। শরবতিয়ার মিষ্টি শরবতের সম্পর্কও তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। এরূপ বিরূপ পরিবেশে থেকেও সে ক্লাসের ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছে।

গ্রাম থেকে শহরে পড়তে এলে শহরের বন্ধু-বান্ধবেরা বিপথে নিয়ে যায়। মনমোহন এরূপ ছেলেদের থেকে সব সময় দূরে থাকতো। তাই প্রবল বিশ্বাস ও যুগলের দল অনেক চেষ্টা করেও মনমোহনকে বিচলিত করতে পারেনি। তবে সে প্রিয়োদার সংস্পর্শে এসে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে 'দেশ ও দশের কাজ করতে শিক্ষালাভ করে। তাই পাঁচ টাকার ছাত্রবৃত্তির মোহ ত্যাগ করে গান্ধীজীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে হরতালে শামিল হয়। একাজের জন্য না চাওয়ায় [illegible] হতে হয়। এরপর ভগত সিং-এর ফাঁসির প্রতিবাদে স্কুলে আবার হরতাল হয়, তখনও মনমোহন সেই হরতালের নেতৃত্ব দেয়। ১৯৩৪-এর ভূমিকম্পে পীড়িত মানুষের সেবায় বজমহারাজের সঙ্গে [illegible] করে। তার এই [illegible] মহাত্মা গান্ধীও প্রশংসা করেন। [illegible] হয়ে [illegible] জানলায় মনমোহন আত্মনিয়োগ করে।

পৰী:১৬

এরপর দেশের কাজ করার জন্য প্রিয়োদা কলকাতায় চলে যায় আর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মনমোহন ভাগলপুরে। ঠিক চারবছর পর ১৯৩২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় প্রিয়োদা, মনমোহন আবার মিলিত হয় অররিয়া কোর্টে। ফণীশ্বরনাথ রেণু এই উপন্যাসের সবকিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্র অররিয়া কোর্টের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ডেয়ারীতে পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে প্রিয়োদা, কৃত্যা, আশরফী, ভোলা এবং তপু গুলি খেয়ে শহীদ হয়ে যায়। সে সময় মনমোহনকে নীলু পাগলের মত ধরে রাখে তাই সে শহীদ হতে পারে না। মনমোহনের চোখের সামনে তারই প্রিয় পাঁচজন বন্ধু একেএকে গুলি খেয়ে প্রাণ হারায়। পাঁচ-জনের চিতাতে আগুন দেওয়ার সময় মনমোহন গ্রেফ্‌তার হয় এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। জেলে থেকে সব সময় সে অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়—কেন নীলুর থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিতে পারলাম না? কেন শহীদ হতে পারলাম না? তাই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মনমোহন আর ঘরে ফিরে যায়নি, রাজনীতিও করেনি সে, সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে সচ্চিদানন্দ নাম ধারণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'কিতনে চৌরাহে' উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের স্বার্থ-মোহের উপরে উঠে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই মনমোহন স্টুডেন্টস হোমে গিয়ে নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়েছে। জীবনের সঙ্গে দেশ-প্রেমকে মিশিয়ে নেওয়ার জন্য 'কিতনে চৌরাহে'র মধ্যেও সত্যের পথে নির্ভীক-ভাবে চলার ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার নৈতিক আদর্শ চারপাশের মানুষের থেকে স্বতন্ত্র। তাই ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও মায়ের চোখের জল মোছবার জন্য সাংসারিক জীবনে ফিরে আসেনি, কারণ অনেক মা-ই তখন সন্তানহারা। সমাজজীবনে, এমনকি রাজনৈতিক জীবনেও মনমোহন-এর সাফল্য আসেনি, সর্বত্র অসঙ্গতি তাকে ব্যথিত করেছে। শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে সে একা হয়ে যায়। পাঁচজন সহযোগী তার চোখের সামনে শহীদ হয়ে যাওয়ার আঘাতে সে জেলে গিয়ে একটুও শান্তিতে থাকতে পারেনি। তাই জেল থেকে ফিরে সাংসারিক জীবনে সামাজিক জীবনে না ফিরে গিয়ে সমাজ-সংসার-রাজনীতি থেকে পৃথক সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করে, পীড়িত মানবের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছে। ফণীশ্বরনাথ

রেণু মনমোহনের জীবনের এই ট্রাজেডিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, প্রাসঙ্গিকভাবে ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে মনমোহনকে নিয়ে এসেছেন ; কিন্তু কোথাও বৃহত্তর রাজনীতিতে মনমোহনকে প্রধান পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি। রাজনীতির ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে মনমোহন এমন কোন কাজ করেনি যা তার পরিবেশের পক্ষে অনুপযুক্ত। রেণু সৃষ্ট মনমোহনেব এই চরিত্রের সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র 'ঢোঁড়াই'-এর চবিত্রের অনেকটা মিল আছে। 'ঢোঁড়াই'ও সাংসারিক জীবনে, সমাজ-জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে সফলতা পায়নি। ঢোঁড়াইও বাঁধা পডতেই চেয়েছিল, রামিযাব কাছে জীবনের সার্থকতা খুঁজেছিল— গান্ধীজীর সেবায নিজেকে উৎসর্গ কববে বলে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু কোথাও স্থাযী হতে পাবেনি। অর্থাৎ রাজনীতির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে ঢোঁড়াই-এর প্রকৃতির মানুষের পক্ষে নিজেকে উৎসর্গ করা স্বাভাবিক নয, সতীনাথ ভাদুড়ী একথা ভালভাবে জানতেন। তাই ঢোঁড়াইকে সেভাবে অঙ্কিতও করেননি। ঢোঁড়াই যা করেছে নিজের জীবনবোধের চেতনা থেকেই করেছে। তার জীবনের ব্যর্থতার মধ্য দিযে যেমন সতীনাথ ভাদুড়ী সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক চেহারাটার পরিচয় দিযেছেন ঠিক তেমনি ফণীশ্বরনাথ রেণুও মনমোহনের চরিত্রের মধ্যে দেখিযেছেন। সেখানে মনমোহন ও ঢোঁড়াইযের মত অনেক লোকই দেশের অস্থিরতার মধ্যে নিজেকে জড়িযে ফেলেছিল।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'জুলুস' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। কিন্তু এই উপন্যাসটির পটভূমি ১৯৬১ সাল। এই উপন্যাসের ভূমিকা থেকে তাঁর মানস পটভূমির পরিচয পাওয়া যায়। রেণু তাঁর জুলুস উপন্যাসের ভূমিকাতে লিখেছেন :

"দিন-রাত সোতে-বৈঠতে, খাতে-পীতে-মুঝে লগতা হে কি এক বিশাল জুলুসকে সাথ চল রহা হুঁ। ইস ভীড় সে অলগ হোনে কী সামর্থ মুঝমে নহী। ইস জুলুস মে চলনে বালে নর নারিয়োঁ•• সে মেরা পরিচয় নহী হো সকতা।"৩১

এই বিশাল মিছিল থেকে পৃথক হতে না পারার অক্ষমতাই রেণুর জুলুস উপন্যাস রচনার মূল ক্ষমতা।

'জুলুস' উপন্যাসটির পটভূমি স্বাধীনতার চৌদ্দ বছর পর ১৯৬১ সালের

ভারতের পটভূমি। কিছু লোকের মতে ১৪ বছরে ভারতের অনেক উন্নতি হয়েছে। রেণুও একথা মানেন। ভারতে দু-বার সাধারণ নির্বাচন আট দশ মাসের পরে হতে যাচ্ছে। প্রত্যেক খদ্দরধারী লোকেরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য টিকিট পেতে নির্বাচন অফিসে ঘোরাঘুরি করছেন। এই ১৪ বছরে সরকারও কিছু কম কাজ করেননি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ বি ডি ও-র মত 'ও' অফিসারদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি থেকে বেশ বুঝা যায়। সাধারণ জনগণও কম সচেতন নন। জনগণের মধ্যে প্রত্যেক ম্যাট্রিক ফেল যুবকেরা রাজনীতিক পার্টিতে যোগ দিয়েছে এবং প্রত্যেক সিভিল পাশ ছেলেরা কন্ট্রাক্টরী করার স্বপ্ন দেখছে।

উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির পথে অনেক বাধা যাতে মানুষের কোন হাত নেই। কখনও কখনও সময়ে বর্ষা হয় না আবার কখনও অতি বৃষ্টিতে বন্যা এসে যায়। মৌসমের উপর, ঋতুচক্রের উপর কারো কোনো ভরসা নেই।

'সূরজ চাঁদ-তারোঁ কী ভী কোই বিশ্বাস নহী—ক্যা জানে কিস দিন অচানক উগনা বন্দ কর দেঁ, কুছ কহা নহী জা সকতা।'[৩২]

এছাড়া বড় এবং পুরাতন রাজ-নেতাদের অসময়ে মৃত্যুতেও দেশ অনাথ হয়ে যাচ্ছে। এক একটি আলো নিভে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় অষ্টগ্রহের প্রভাবে সমস্ত দেশ এক অজানা ভয়ে সব সময় আতঙ্কিত, তাই দান,পুণ্য, দয়া-ধর্ম যা কিছু করবে এই বছর করে নিচ্ছে কারণ আগামী বছর কি হবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। রেণু এই (১৯৬১) বছরের জন্য বলেছেন:

'চৌদহ বর্ষ বনবাস কে। চৌদহ বর্ষ হুয়ে সুরাজ্য কে।'[৩৩]

অষ্টগ্রহের মধ্যে রেণুর দৃষ্টি একটি বিশেষ তারার উপর কেন্দ্রিত। যার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

"...তীর কে বেগ সে এক 'তারা' চল রহা হৈ আকাশ মে—রুশ কা স্পুৎনিক।"

সামনের বছরের মালিক যে কেউ হন না কেন, কিন্তু গোড়িয়র গ্রামের জন্য ১৯৬১ সালের মালিক তালেবর গোড়ি। যে নিজের গ্রামের সবথেকে সম্পন্ন, ধনী, মানী, জ্ঞানী, ধার্মিক, তীর্থযাত্রী এবং চরিত্রহীন ব্যক্তি। গোড়িয়ার গ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে রেণু লিখেছেন:

"গোড়িয়ার মেঁ পন্দ্রহ ঘর বৈথিল, চার পরিবার রাজপুতোঁ কে—যহী হৈ গোড়িয়ার গাঁও কা বাবু টোলা। বীস ঘর গোয়ালে, আঠ ধানুক, চৌদহ ঘর

গোড়ি—গোড়িয়র গাঁও কা আসল নাম ইসী গোড়িটোলা সে হুয়া জহাঁ 'গোড়ি' (যাঁরা মাছ ধরেন—জেলেজাতি) লোগ রহতে হৈঁ—গোড়িয়ার। গোড়িয়ার সে গোড়িয়র গাঁও কা সবসে সুখী সম্পন্ন অউর শিক্ষিত পরিবার গোড়ি কা হী হৈ। 'ব্রাহ্মণ টোলী মে চৌধরী পরিবার অউর রাজপুতৌ মে গিনগুঁথ কর এক ঘর বাবু সাহব। বাকী লোগ যজমানী, পহলবানী, গাড়ীবানী, ঘোড়ালদাই, দুকান, নৌকরী, খেতী মজদুরী অউর চোরী করকে জীবন যাপন করতে হৈঁ · চৌধরী কে ঘর কী হী সারী সম্পত্তি ধীরে ধীরে তালেবর গোড়িকে ঘর চলি গই হৈ। জমীন পোখরে, বাগ-বাগীচে অউর মবেশী (গৃহপালিত পশু)—বড়ে মুকদমোঁ মে সভী রেহন বন্ধকী গিরবী কে রূপ মে তালেবর গোড়ি নে লিখবা লিয়া।'[৩৪]

ফণীশ্বরনাথ রেণু এই 'জুলুস' উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজের ত্রুটি, নীচতা, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, দেশশাসনে বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্রের কর্মশৈথিল্য, দায়িত্বহীনতা ও অর্থলোলুপতা, সরকারী অব্যবস্থা, রাজনীতিকদের নীতিহীনতা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুদান লাভের প্রয়াস, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থ-হরিজন সমস্যা সবকিছু সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।[৩৫]

অপরদিকে পূর্ব পাকিস্থান বর্তমান বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তদের বাসস্থানের জন্য তৈরি নবীনগর কলোনীর সুন্দরী বিদুষী মহিলা পবিত্রার মধ্য দিয়ে ফণীশ্বরনাথ রেণু জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতার কৃত্রিম ভেদাভেদ ভুলে এক নূতন সমাজ গঠনের সংকল্পকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। 'পবিত্রা' জুমাপুর গ্রামের কাশীনাথ চ্যাটার্জীর কন্যা। তার বিবাহ বিনোদের সঙ্গে ঠিক হয়েছিল আশীর্বাদও হয়ে গেছিল। তার ঘরের পাশেই কাসিম চাচার বাড়ি ছিল, যিনি নিজে এই অনিন্দ্যসুন্দরী পবিত্রাকে নিজের বিবি বানাতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় হঠাৎ হিন্দুস্থান পাকিস্থান বিভাজনের ফলে পূর্ব বাংলায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয়। কাসিম চাচাও সুযোগ পেয়ে যান। তিনি পবিত্রার বাগ্‌দত্ত বিনোদের মাথা কেটে ভালের ডগায় রেখে জুলুসের সামনে ঘোরায় এবং পবিত্রার মা-বাবা, ভাই-বোন—সকলকে হত্যা করে যাতে পবিত্রা তার কাছে সহজে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এত কিছু করার পরও পবিত্রা কাসিমের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি সে [illegible] (শরণার্থী)-দের সঙ্গে পালিয়ে আসে হিন্দুস্থানে। লেখক পবিত্রার [illegible] সম্মানে [illegible] দিয়েছেন।

'পবিত্রা কো মা, মৌসী, দিদি, দাদী, নানী—কিসী কা ভী প্যার কভী নহী মিলা। উসকে কিসী ভাই নে ভী কভী প্যার নহী কিয়া। ইস্ সংসার মে সির্ফ পিতা কা প্যার উসে মিলা হৈ ...।'[৩৬]

পবিত্রার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জুমাগুর (পূর্ব পাকিস্থান, বর্তমান বাংলাদেশের) উদ্বাস্তুদের সবথেকে ভাল জায়গায় পুনর্বাসন করা হয়। জুমাগুর-এ যা ছিল এখানে তার থেকে কিছু কম নেই। গাছ, পালা, ফল, ফুল গৃহপালিত পশু-পাখি সবকিছুই তেমনি আছে যেমনি এদের জুমাগুর-এ ছিল। এখানকার অধিবাসীরাও তাদের মত ধান-পাটের চাষ করে মাছ ভাত খায়। এই নবীনগরের গোলপার্কে দাঁড়িয়ে পরবাহা গ্রামের দিকে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি কুমাগুর-এর পুকুরে দাঁড়িয়ে অছিমুদ্দিনের দিকে তাকালেও ঠিক তেমনি দেখাত। এই দৃশ্য দেখে পবিত্রার মনে হয়েছে ভগবান নবীনগরকে জুমাগুর মনে করে এই মাটিকে ভালবাসার সঙ্কেত দিয়েছেন। তাই পবিত্রা বিহারের বিভিন্ন স্থানে থেকে হিন্দীতে কথা বলতে শিখে নিয়েছে। সে নবীনগরের স্কুলে গোড়িয়র ছেলেদেরও শিক্ষা দিতে চেয়েছে। শুধু তাই নয় এখানকার স্থানীয় লোকদের সঙ্গে রুটি-বেটির সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছে। পবিত্রার চিন্তার মধ্য দিয়ে ফণীশ্বরনাথ রেণু নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ গোড়িয়র গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে নবীনগর কলোনীর লোকদের প্রতি যে বিরূপতা, বৈষম্য ছিল তা দূর করতে চেয়েছেন।

নবীনগরের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ কিন্তু পবিত্রার কথা মেনে নিতে পারেননি। কারণ তাঁদের কাছে 'পরভূমি কৈসী ভী হো, আখির পরভূমি হী হৈ।'[৩৭] তাই যেদিন পবিত্রা উপস্থিত থাকে না সেদিন এই নবীনগরের অধিবাসীরা এখানকার লোক, এখানকার ভাষা এই পরভূমির মাটি এমনকি এখানকার সূর্য-চাঁদেরও নিন্দা করতে ছাড়েন না। এঁরা মনে করেন 'এ দেশের সব কিছু আজগুবি।'[৩৮] তাই এঁরা এখানকার হিন্দুস্থানী ভাষা শিখতে ঘৃণা করেন। তাই গোপাল গাইনের বৌ বলে, 'দেশ গয়া, গাঁও গয়া, জাতি ধর্ম বাকী থা সো য়ঁহা অব সমঝো গয়া। সুনতী হো, বাংলা নহী, বচ্চোঁ কো হিন্দুস্থানী ভাষা পড়না হোগা।'[৩৯] সেজন্য তাদেবর গোড়িয়র ঘোষিত ভোজের কথাতে শারদা বর্মণ খুশী হতে পারেনি। তার মতে বিহারীদের সঙ্গে 'জিলান'-'পিলান' এবং 'মিলান'-'এলান' একথা ঠিক নয়। খুদোবাবুর সবচেয়ে বড় অভিমান এই যে তাঁরা (তিন চার বাংলা ঘরে) ৩০০

বছর ধরে পূর্ণিয়া জেলায় বসবাস করছেন তবু এখনও খুদোবাবু থেকে খুদোপ্রসাদ বা খুদো বর্মা হয়ে যাননি। বিহারীদের কাছ থেকে কলোনীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য 'কলোনী রক্ষা দল' গঠিত করেন নবীনগরের বাসিন্দারা, যার নায়ক শারদা বর্মণ।

দোষ শুধু বাঙালীদেরই নয়, প্রাদেশিকতার, সাম্প্রদায়িকতার, জাতীয়তার ভাবনা বিহারীদেরও কম নয়। গোড়িয়র গ্রামের লোকেরা নবীনগরকে পাকিস্থান টোলা বলে ব্যঙ্গ করে। পাকিস্থান থেকে বিতাড়িত এই উদ্বাস্তু বাঙালীদের স্থানীয়লোক বাঙ্গালী-কাঙ্গালী বলে উপহাস করেন। বাঙালীদের রাগানোর জন্য এখানকার স্থানীয় ছেলেরা বলে 'দাল পকায়া, ভাত পকায়া, পরবল কী তরকারী, মীম মারকর ভোগ লগাবে অধম জাত বাঙ্গালী।'[৩১] শুধু তাই নয় বাঙালীদের মাংসাহার প্রবৃত্তি নিয়েও এখানকার বিহারীরা আলোচনা করে। বাঙালীরা মাছকে নিরামিষ মানেন। প্রবাদবাক্যও প্রচলিত আছে যে 'মাগুর মাছ খা বেটা হরি হরি বোল।' শুধু তাই নয় বিহারীরা মনে করেন যে মুসলমানেরা জোর করে এই উদ্বাস্তু বাঙালীদের গো-মাংস খাইয়ে ভ্রষ্ট করে দিয়েছে। পবিত্রা জানে একথা প্রচার করে চৌধুরীর দোকানদার বেটা, কারণ একথা প্রচার না করলে তার দোকানের পচা বিস্কুট কিনবে কে? সকলেই ফেরীবালা বাঙালী হিন্দুর ভাল বিস্কুটই কিনবে। বাঙালী ও বিহারীর মধ্যে এই নবীনগর ও গোড়িয়র গ্রামের ঈর্ষার-ঝগড়ার আর একটি বিশেষ কারণ নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। সরস্বতী দেবী গোড়িয়র গ্রামের শিক্ষিত মহিলা। তিনি মনে করেন তিনি গ্রামে থাকতে এক বাঙালী মহিলা লীডর হয়ে মিটিং করতে পূর্ণিয়া যাচ্ছে এটা বিহারীদের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কারণ। কিন্তু তিনি কি করে জানবেন যে 'পবিত্রা' কলোনী কমিটির বৈঠকের জন্য পূর্ণিয়ায় গেছে, আর সরস্বতী কলোনীর সঙ্গে জড়িত নন তাই তিনি পবিত্রার স্থানে যেতে পারেন না। শারদা বর্মণও পবিত্রার বিরুদ্ধে নবীনগরের বাসিন্দাদের উত্তেজিত করার জন্য বলেন 'ঔরত কলোনী মেম্বর জঁহা রহঙ্গে বঁহা কে মর্দ কী বাত কা ক্যা ভ্যালু'।[৩২]

ধর্ম, প্রান্ত, জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি বৈষম্য ছাড়া সবচেয়ে বড় পার্থক্য আর্থিক বিষমতা দেশের প্রায় জায়গায়ই পরিব্যাপ্ত। ধনীদের অবস্থা পৃথিবীর থেকে এই পৃথিবীর অধিবাসীদের থেকে যেন পৃথক। কারণ 'বিজনেস ঔর মিল চলানে বালোঁ কে হল আসমান মে চলতে হৈ।' তাই সবাই প্রাকৃতিক

বিপর্যয় (ভূকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ) হয় তখন ধনীদেরই ধনবৃদ্ধি হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দৈব প্রকোপে শুধু ধনীদেরই নয় ভণ্ড দেশসেবকেরও বিশেষ লাভ হয়। দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় সহায়তা করার জন্য বেশ নগদ আমদানী হয়, যা পরের ইলেকশনে বিশেষ লাভপ্রদ। তাই এঁরাও মাঝে মাঝে বন্যা ও দুর্ভিক্ষকে ভগবানের আশীর্বাদ মনে করেন। রেণু ধনী ও এইসব ছদ্মবেশী দেশনেতাদের উলঙ্গ চিত্র তাঁর উপন্যাসের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন।

বিভিন্ন কারণে মানুষে মানুষে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একে অপরের সঙ্গে যে বৈষম্য তা দূর করার জন্য ফণীশ্বরনাথ রেণু তাঁর 'জুলুস' উপন্যাসে অনেক তত্ত্ব দিয়েছেন। বিভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য তিনি বিশেষ করে লোক-সংস্কৃতির দ্বারাই গ্রামলক্ষ্মীর মলিন মুখে আবার হাসি ফোটাতে চেয়েছেন। তাই রেণু এই গ্রামলক্ষ্মী সম্বন্ধে বলছেন :

"চারোঁ ঔর পাটকে খেত হরে ভরে। লক্ষ্মী খেতোঁ মে সজীধজী খড়ী হৈ ধানী রঙ্গ কী সাড়ী পহন কর। খেতোঁ মে লক্ষ্মী হঁসতী হৈ, ঘর মে লক্ষ্মী হৈ। লেকিন জব তালেবর গোড়ি কা মিল চলনে লগতা যে তো লক্ষ্মী কে চেহরে পর এক আতঙ্ক কী ছায়া ছা জাতী হে। হঁসী মিলা জাতী হে। গীত রুক জাতা হে। তুত-তুত, তুত-তুত, তুত-তুত-হঁস তাল পর সভী কা গীত 'বেতাল' হো জাতা হে।"[৪১]

পরিশেষে পবিত্রা যখন নরেশের সঙ্গে সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করে বলেছে :

"মৈ জী গই ফির। মৈ কঁহী নির্জন মে নহী। মৈ এক বিশাল পরিবার কী বেটি হুঁ···ইন আত্মীয় সজনোঁ কে বীচ পারস্পরিক সহানুভূতি ঔর সহযোগিতা কো ফির সে পাউঙ্গী মৈ। অপনে গাঁও সমাজ মৈ—লোগোঁ কে বীরান হৃদয় মে—আনন্দমুখর স্বর মে ফির সে ভরনা হোগা···খোই হুই চীজোঁ কা উদ্ধার করনা হোগা···অপরিচয়, অজনবীপন, উদাসীনতা, অকেলাপন, আত্মকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা কো দূর করকে ভুলে-ভটকে লোগোঁ কে পাস লৌটা কর লানা হোগা। ···মৈ অপনী সত্ত্বা কো ইস্ সমাজ মে বিলীন কর রহী হুঁ। লোক সংস্কৃতি-মূলক সমাজ কে গঠন কে লিয়ে"—'আমি আমাকে উৎসর্গ করলাম। আমি আজ জীবনে প্রথম বার ধন্য হইলাম।"[৪২]

প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ফণীশ্বরনাথ রেণু 'পবিত্রা'-র জীবনের একটি সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার

জন্য আটাশ বছর সময়সীমা বেছে নিয়েছিলেন। এই আটাশ বছর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক ঘটনা-বহুল সময়। উদ্বাস্তু সমস্যা, হিন্দুস্থান-পাকিস্থান বিভাজন ইত্যাদি সকল ঘটনা কেবল শহরাঞ্চলের মধ্যেই বা পশ্চিম-বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্য প্রদেশের গ্রাম গ্রামান্তরে তার অভিঘাত এসে নিস্তরঙ্গ জীবনে নতুন চিন্তার আলোড়ন তুলেছিল।

উপন্যাসের সমস্ত ঘটনাই 'নবীনগর' কলোনী ও 'পবিত্রা'র জীবনকে নিয়ে। মোতিয়াকে রবীন্দ্রনাথের বাংলা গানের পঙ্‌ক্তিগুলি লেখাতে গিয়ে পবিত্রা নিজের জীবনের দৃঢ় সংকল্পের কথাই ব্যক্ত করেছে :

'আমি বিকাব না কিছুতে আর আপনারে,
আমি দাঁড়াতে চাই সবার তলে সবার সাথে এক সারে।'

অর্থাৎ উপন্যাসকার 'জুলুস' উপন্যাসের সেখানেই সমাপ্তি করেছেন যেখানে পৌঁছে 'দিন-রাত সোতে-বৈঠতে, খাতে,-পীতে লগতা হৈ কি এক বিশাল জুলুস কে সাথ চল রহা হৈ। অবিরাম…'।[৪৩] এটাই জুলুস উপন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য।

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই 'পবিত্রা' নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা পেয়েছে। জীবনের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমকে মিশিয়ে নেওয়ার জন্য সত্যের পথে নির্ভীকভাবে চলার ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার নৈতিক আদর্শ তারই চারপাশের মানুষের, নবীনগর কলোনীর বাসিন্দাদের থেকে স্বতন্ত্র, তাই সাংসারিক জীবনে এমনকি রাজনৈতিক জীবনেও পবিত্রার সাফল্য আসে নি ; সর্বত্র অসঙ্গতি তাকে ব্যথিত করে এবং শেষ পর্যন্ত সে একা হয়ে যায়। 'পবিত্রা'র জীবনের মূল ট্রাজেডি এখানেই।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর প্রকৃত কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি 'পবিত্রা'র জীবনের ট্রাজেডিটি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনীতির মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'পবিত্রা'র মত মেয়ের পক্ষে নিজেকে উৎসর্গ করা সম্ভব নয়। অবশ্য রেণু সেভাবে 'পবিত্রা'কে অঙ্কিতও করেননি। 'পবিত্রা' যা করেছে নিজের জীবনবোধের চেতনা থেকেই করেছে। তার জীবনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে লেখক সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের মধ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা ও সে সময়কার রাজনৈতিক চেহেরাটার পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে 'পবিত্রা'র মত অনেক মেয়েই দেশের এই অস্থিরতার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল।

পরিশেষে সতীনাথ ভাদুড়ীর ও হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর রাজ-

নৈতিক উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাদুড়ীজীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (দুই খণ্ড) ও রেণুর 'মৈলা আঁচল' ও 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসগুলির উপর রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। যদিও এগুলি আঞ্চলিক উপন্যাস কিন্তু এই উপন্যাসগুলির রাজনৈতিক দিকটাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'—এ ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজী, কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ বিহারে এবং বিহারের গ্রামাঞ্চলেও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে জাগরণ ঘটাচ্ছিল তারই রাজনৈতিক কাহিনী মহাকাব্যোপম বিস্তার নিয়ে দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সতীনাথ গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন; অসহায়, শোষিত, পীড়িত মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনচর্চা বিষয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। চোখে দেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে যে সকল অতি সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্ত রচনা করেছেন তারা হল জাতে তাঁতী, বৃত্তিতে ঘরামী, তাৎমাটুলির মানুষজন, ধাঙ্গড়টুলির ওরাওঁ গোষ্ঠীর ধাঙ্গড়েরা, কিংবা এখানকার উপেক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন, জ্ঞানালোক-বর্জিত এবং শোষিত, শাসিত অত্যাচারিত অগণ্য মুসহর, সাঁওতাল, রাজবংশী, তিয়ার প্রভৃতি ক্ষেত-মজুর, দিনমজুর। এদের সঙ্গে জোতদার-মহাজনদের জীবনকথা জুড়ে দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

'ঢোড়াই চরিত মানস' তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এর ভাবাদর্শে বর্তমান যুগের রামকথা। প্রয়াত নারায়ণ চৌধুরীর ভাষায় "উত্তর পূর্ব বিহারের লৌকিক জীবনের একটি নাতিবৃহৎ 'সাগা'। এই উপন্যাসের Stunt হীন নামের মাহাত্ম্য বুঝতেই আমাদের অনেক কাল লাগবে।"[৪৫]

আধুনিক যুগের রাজনৈতিক আলো হাওয়ায় জেগে ওঠা হরিজন মহাকাব্য। অত্যাচারী মহাজন, শাসকশ্রেণী, শোষকশ্রেণী কেউই বাদ যায়নি। বাদ যায়নি রাজনৈতিক দল ও তাদের স্বার্থান্বেষী দলাদলি। সতীনাথ এই গ্রন্থের মূল পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানিয়েছেন :

"এই ঢোঁড়াইকে এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল আমার সম্মুখে। শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। রামায়ণের দিকে আমার নজর পড়েছিল আরও কয়েকটি কারণে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে রামায়ণের কাঠামোতে ফেলা বই বেমানান হবে না, এ ছিল আমার ধারণা।

এ ছাড়া আরও একটা বড় প্রয়োজনের তাগিদ ছিল। ইচ্ছা ছিল আমার জানা গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমন করে বদলাতে দেখেছি, কেমন ভাবে তারা ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই দিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজকে তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে; পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে।'[৪৬]

'জিরানিয়া' তথা পূর্ণিয়া অঞ্চলটাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। তাৎমাটুলি, ধাঙ্গড়টুলি, কোয়েরীটোলা প্রভৃতি অন্ত্যজ পল্লীর জীবনকথায় পূর্ণ এই উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াই এই অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাৎমাটুলির বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই। বুধনী বিধবা হয়ে আবার বিয়ে করে এবং তখন থেকেই তিন বছরের ঢোঁড়াই মায়ের, আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হলেও 'বৌকা বাওয়ার' স্নেহলাভে সে বঞ্চিত হয়নি। তাঁরই আস্তানায় মানুষ হয় সে। বৌকা বাওয়া তাকে 'ভগত' করবে—এর চেয়ে বেশী বড় হওয়ার এবং সৌভাগ্যের কল্পনাই তাদের সমাজে কেউ করতে পারে না। কিন্তু ঢোঁড়াই সে পথে গেল না। ঠিক এই সময়েই ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ঢেউ আছড়ে পড়ল অন্যান্য প্রদেশের মতো বিহারেও। পূর্ণিয়া জেলার সঙ্গে সঙ্গে জিরানিয়ায়ও লাগল সে তরঙ্গের ঢেউ। 'গান্হী বাওয়া' সে আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা। পরে তিনি হলেন মহাত্মাজী। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজজীবনেও উঠল আলোড়ন—বিশেষত হরিজন সম্প্রদায়ের সমাজ অতি দ্রুত পাল্টাতে লাগল। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষগুলির জীবনে এল পরিবর্তন। গতির এবং নতুন জীবনের স্বপ্ন ও আদর্শের তড়িৎ স্পর্শে শ্লথ অনড়-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের দারিদ্রপীড়িত সমাজে এল উন্মাদনা, উদ্দীপন, এবং জীবনাবেগ। বৌকা বাওয়ায় আস্তানায় যে ঢোঁড়াই ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করত সে ধীরে ধীরে তাদের সমাজের তরুণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হয়ে উঠল। এবং রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হল, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লিখিয়ে। কিন্তু এখানে এসে ক্রমশ সে দেখল গান্ধীর আন্দোলন থেকে সরে এসে নীতিজ্ঞানহীনতা, স্বার্থান্বেষণ, অসততা, এমনকি নাম ভাঁড়িয়ে অর্থ আদায়, হিংসাত্মক কাজ ও নানা অন্যায় রাজনীতিকে গ্রাস করেছে। এক দারুণ নিরাশা ঢোঁড়াইকে গ্রাস করে। সে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়।

বাস্তবিকরূপে দেখা যায় সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (২ খণ্ড) রাজনৈতিক পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে জীবনের রহস্য সন্ধান, জীবনমুক্তির পথ সন্ধান ও জীবনসত্য আবিষ্কারের চেষ্টা। শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপাল হালদার বলেছেন :

"ঢোঁড়াইয়ের প্রেরণা সতীনাথের দেখা সাধারণ লোকের মন পরিবর্তনের কথা, এবং তার পিছনকার এই উপলব্ধি—'মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে।' এই চেতনা হোমারের ওডিসিতেও ছিল না, তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানসেও না, জয়েসের ইউলসিস-এও না—এ প্রেরণা ছিল গান্ধী আন্দোলনে জাগ্রত জনজীবনের সহানুভূতি পরিপুষ্ট সতীনাথেরই অন্তরে ও জ্ঞানে।"[৪৭] অর্থাৎ ১৯১৫-৪৫ খ্রীস্টাব্দে এই ত্রিশ বছরের কালব্যাপ্তিতে উত্তর বিহারের পশ্চাৎপদ গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে সতীনাথ একটি গ্রাম্য কিশোর চরিত্রকে অবলম্বন করে গ্রামীণ ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙার কাহিনী রচনা করেছেন।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'মৈলা আঁচল' ও 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসদ্বয়ের মধ্যে একদিকে বিদেশী বণিক ইংরেজশোষিত ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজী, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সোশালিস্ট পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ, বিহারের পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে কীভাবে জাগরণ ঘটিয়ে ছে—অপরদিকে স্বাধীনতা লাভের পর এইসব রাজনৈতিক দলের কার্যপদ্ধতি এবং স্বাধীনতার ফল কতদূর সার্থক হয়েছে। পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে তার কি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তারই রাজনৈতিক কাহিনী মহাকাব্যোপম রূপে উদ্ভাসিত। রেণু বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলেরই ঔরাহী হিঙ্গনা গ্রামের অধিবাসী। এখানকার অসহায়, নির্যাতিত, শোষিত, পীড়িত-নিপীড়িত অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের পাশাপাশি অনেক দিন যাপন করেছেন। এখানকার যাদব, ভূমিহার, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, উপেক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন জ্ঞানালোক বর্জিত শোষিত অত্যাচারিত অগণ্য সাঁওতাল, ক্ষেতমজুর, দিন-মজুরদের সঙ্গে এখানকার জোতদার-মহাজনদের, স্বাধীনতার পরও যাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ একটুও কমেনি—জীবনচর্চার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাই ফণীশ্বরনাথের 'মৈলা আঁচল' স্বপ্ন-উদ্যানের ফুল নয়, জীবনের রসে তার পাপড়িগুলি ফুটেছিল, আর এই চোখে দেখা অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করার

করে তিনি শোষক ও শোষিতের যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন সেগুলি প্রাণহীন নয়। রাজনীতির পোশাক পরা পুতুল নয়—সেগুলি রক্তমাংসে গড়া যথার্থ মানুষ।

'মৈলা আঁচল' বিহারের পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চলে অনগ্রসর মেরীগঞ্জ গ্রামের সার্থক জীবনচিত্র। স্বাধীনতালাভের কিছু পূর্বে গ্রামীণ জীবনের জাতিপ্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীবৈষম্য, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, রাজনীতির নামে জনগণের উপর যে শোষণ এবং ভণ্ডামি তারই কলঙ্কময় জীবনের উলঙ্গ চিত্র রেণু এই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন।

হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে সর্বপ্রথম রেণুর উপন্যাসেই গ্রামীণ জীবনের এই বাস্তবিক হৃৎস্পন্দনটি প্রথম সার্থক রূপ ধারণ করেছে তাঁর 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে। তিনি নিজে এই উপন্যাসের ভূমিকাতে ব্যক্ত করেছেন :

'ইসমে ফুল ভী হৈ শূল ভী হৈ, ধূল ভী হৈ গোলাপ ভী, কীচড় ভী হৈ চন্দন ভী, সুন্দরতা ভী হৈ কুরূপতা ভী—মৈ কিসীসে দামন বঁচাকর নিকল নহী পায়া।'

রেণুর জীবনের রাজনীতি তাই সম্পূর্ণ হয়েছে এই ধূলভরা 'মৈলা সা আঁচল' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের নয়, কোন বিশেষ সিদ্ধান্তকেও ভিত্তি করে নয়। আমাদের দেশের যেসব রাজনৈতিক দলের কর্ণধাররা সুদৃশ্য সুউচ্চ অট্টালিকার এয়ার কণ্ডিশনড ঘরে গদি আঁটা আরাম কুর্সিতে বসে গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনায় ব্যস্ত, বায়ুপথে গ্রাম পরিদর্শন করে গ্রামীণ ভারতের তিনিও একজন বলে চিহ্নিত হয়ে গর্বিত হন তাঁরা সাহিত্যকার রেণুর চিত্রিত গ্রামের ছায়াও স্পর্শ করতে পারেননি। রেণু তাঁদের মুখোশটিও উন্মোচন করে যথার্থ রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

স্বাধীনতার পরেও ভারতীয় গ্রাম থেকে শোষণ-উৎপীড়ন উঠে যায়নি, একটুও কমেনি জোতদার-মহাজন-সামন্তবাদীদের প্রতিপত্তি। রেণু সমস্ত জীবন ধরেই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষ করেছেন। দেখেছেন আদর্শহীন রাজনীতি, দেখেছেন জাতিবাদের শিকলে অবরুদ্ধ সমাজকে, দেখেছেন তিনি ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে—মানবতার নামে অনৈতিকতাকে আর এই ঘুণ ধরা সমাজের পঙ্গু অর্থ অবস্থাকে। তাই এই বৈষম্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিপীড়িত, নির্যাতিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে অনুন্নত এলাকার নিপীড়িত মানুষের মানসিকতায় 'এ আজাদী ঝুটি হ্যায়' বলে প্রতিবাদ করে উঠেছেন তিনি।

কমলা নদী বিধৌত মেরীগঞ্জ গ্রামের প্রকৃতি ও মানুষ এ উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চাষবাস, হাটবাজার, জাতি পাঁতি, উচ্চনীচ, জমিদার মহাজন, কংগ্রেস সোশালিস্ট, মঠ, হাসপাতাল, রোগী, পুলিশের অত্যাচার, স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি নানা ঘটনা। স্বাধীনতা আন্দোলনের টুকরো টুকরো ছবি, গান্ধীজী-নেতাজীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি। সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার প্রতিক্রিয়া, ভীরু নিরীহ, নির্বোধ, অসহায়, লোভী মানুষগুলির ভুলভ্রান্তি দুর্বলতার নানা ছবি—অর্থাৎ সব মিলিয়ে একটা যেন অচেনা পৃথিবী উদ্‌ঘাটিত করেছেন। রেণু গ্রামীণ ভারতবর্ষের পরিবর্তিত রূপকে দেহাতি মাটির গন্ধে, গাছগাছালি লতাপাতার স্থলে, গ্রাম্য নরনারী চরিত্রে সরল বিশ্বাস, ধর্মবোধ সংস্কার, আচার আচরণের যে পরিমণ্ডল 'মৈলা আঁচল' ও 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসে রচনা করেছেন, তা ভারতীয় গ্রামজীবনের অকৃত্রিমরূপ। ফণীশ্বরনাথ রেণু এই অঞ্চলের লোক, তাই বিহারের অনগ্রসর লোকজীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও নিশ্ছিদ্র সম্পর্ক ছিল। সম্পূর্ণ উপন্যাসটি গ্রামাঞ্চলের সমস্যারই মহাসাগর। রেণু স্বাধীন ভারতবর্ষের এই শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত জনগণকে শোষণের কালচক্র থেকে বের করে এক শোষণবিহীন সমাজের স্থাপনা করতে চেয়েছেন। বর্তমানের রাজনীতি প্রশাসনিক ও সামাজিক জীবনের ছদ্ম রূপটিকে খুলে তাদের ছলনা, প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনার যথার্থ রূপটিকে তুলে ধরেছেন। স্বাধীন ভারতে জমিদার-পুঁজিপতিদের আইন আদালত, পুলিশ প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা সব কিছুই বিশেষ এক শ্রেণী পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্য। তিনি তাদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এবং বিহারের শিক্ষাবর্জিত অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের ভীরু চাষী, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর এবং ভূমিহার কোয়েরি-সাঁওতাল প্রভৃতি নীচুতলার সর্বহারা মানুষদের মধ্যে জাগরণ ঘটিয়ে তাদের নিয়ে এক শোষণবিহীন, শ্রেণীহীন, সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

১. The Charter House of Parma (standard-24)

২. Politics and Literature : G. D. H. Cale p p. I7-18

৩. Ibid page 23

৪. The Political Novel : J. L. Blotner. p 2

৫. Ibid

৬. রাজনৈতিক উপন্যাস : সাহিত্য কোষ : কথাসাহিত্য : ড. অলোক রায় সম্পাদিত, পৃ ১৯৭-৯৮।

৭. ······materialism and imagination cannot go to bed together. The result they suggest, would not be creation, but simply an unholy row." R. Fox, p. 69

৮. কালান্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী : জন্মশতবার্ষিকী সং পৃ ৩৩৩।

৯. উপন্যাস ও রাজনীতি তিন লেখকের বক্তব্য (সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু ও অসীম রায়) : আনন্দবাজার পত্রিকা, সোমবার, ৯ই কার্তিক, ১৩/৮, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৮১।

১০. তদেব।

১১. তদেব।

১২. সত্যি ভ্রমণকাহিনী (১৯৫০), সতীনাথ গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড), পৃ ১।

১৩. ভাদুড়ীজী : সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত সতীনাথ স্মরণে, পৃঃ ৩।

১৪. জাগরীর প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের ভূমিকা পূর্ণিয়া, ৭।৯।৪৫ সতীনাথ ভাদুড়ী স্বাক্ষরিত।

১৫. ছোটদের জাগরী, ভূমিকা সতীনাথ ভাদুড়ী, ১৯৪৮।

১৬. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, 'জাগরী' (আশুতোষ কলেজ পত্রিকা, ১৯৫৫)।

১৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : সতীনাথ ভাদুড়ী, কালের প্রতিমা, (১৯৭৪,) পৃ ১৪৫—৪৭।

১৮. পড়ুয়ার নোট থেকে : সতীনাথ গ্রন্থাবলী (৪র্থ খণ্ড) পৃ ৫৩৮-৩৪।

১৯. -তদেব।

২০. তদেব।

২১. ১৯৫৪ ডায়েরী : সতীনাথ ভাদুড়ী।

২২. তদেব।

২৩. চিত্রগুপ্তের ফাইল : সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯৪৯)

২৪. ঢোঁড়াই চরিত মানস (১৯৫১)।

২৫. গোপাল হালদার : সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা, পৃ ৪২ ৪৩।

২৬. সুবল গঙ্গোপাধ্যায় : ইতিকথা সতীনাথ স্মরণে, নভেম্বর, ১৯৭২।

২৭. কিতনে চৌরাহে (১ম সং) ফণীশ্বরনাথ রেণু।

২৮. তদেব।

২৯. বনতুলসী কী গন্ধ : ভারত যাযাবর সম্পাদিত।

৩০. কিতনে চৌরাহে : ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ ৭।

৩১. জুলুস : পৃ ৫।

৩২. তদেদ, পৃ ১০১।

৩৩. তদেব।

৩৪. আধুনিক সামাজিক আন্দোলন ও আধুনিক হিন্দী উপন্যাস : কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, পৃ ৩১৭।

৩৫. জুলুস : ফণীশ্বরনাথ রেণু, ভূমিকা পৃ ১।

৩৬. তদেব, পৃ ১১৯।

৩৭. তদেব, পৃ ১৫।

৩৮. তদেব, পৃ ১০২।

৩৯ তদেব, পৃ ২৮।

৪০. তদেব, পৃ ৭৬।

৪১. তদেব, পৃ ১৬০।

৪২. তদেব, পৃ ১৫৫।

৪৩. সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবন ও সাহিত্য : ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্য- পৃ ৪৬।

৪৪. 'লেখকের লেখক সতীনাথ', পৃ ৮৯।

৪৫ সতীনাথ বিচিত্রা, প্রকাশ ভান, কার্তিক, ১৩৭২, পৃ ২১৭ ২১৮।

৪৬. সতীনাথ ভাদুড়া : জীবন সাহিত্য : ড. ভট্টাচার্য : পৃ ৫৯ ৬০।

৪৫. সতীনাথ ভাদুড়ী জীবন ও সাহিত্য : ড. অরূপকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৬।

৪৬. 'লেখকের লেখক সতীনাথ' পৃ. ৮৯।

৪৭. সতীনাথ বিচিত্রা, প্রকাশ ভবন, কার্তিক, ১৩৭২, পৃ ২১৭, ১৮।

৪৮. সতীনাথ ভাদুড়ী সাহিত্য ও সাধনা, পৃ. ৫৯-৬০



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোটগল্প

উপন্যাসিকরূপে বাংলা সাহিত্যজগতে যেমন সতীনাথ ঠিক তেমনি হিন্দী সাহিত্যজগতে ফণীশ্বরনাথ রেণু বিশেষ সম্মানিত। তাই তাঁদের রচিত ছোটগল্পগুলিকে অনেকেই গৌণ বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। দুজনেই অনেকগুলি অসাধারণ ছোটগল্প রচনা করে গেছেন যার যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি।

বাংলা 'ছোটগল্পে' যেমন হিন্দী ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক পালাবদলের পর এসেছেন সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ।

'ছোটগল্পে' সাম্প্রতিক পালাবদলের শুরু কবে থেকে? বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে। ঐ সময় থেকে পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত বিশ বছর (১৯৩৯-৫৯) সময়সীমার মধ্যে এ যুগের একটি বিশিষ্ট চেহারা, রূপ ও চরিত্র সুস্পষ্ট আকার পেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে বারুদের উদ্গার তার মশলা অনেক আগে থেকেই অবশ্য জমা হতে শুরু করেছিল, কিন্তু সাহিত্য-চেতনায় উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচণ্ড আলোড়নের যুগের প্রত্যক্ষ পরিচয় এই সময়সীমার লেখকদেরই হয়েছে। প্রথম চোখ খোলার সঙ্গেই তাঁরা বহ্নিবলয়-বেষ্টিত বিক্ষুব্ধ দিগন্ত দেখেছেন বলা যায়।

উদ্ভ্রান্ত বিক্ষোভের জগতে সাহিত্যকার হিসাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দরুন তাঁদের সকলের রচনায় বারুদের গন্ধ লেগেছে একথা অবশ্য ভুল। অন্তরের যে নিভৃত ধ্যানলোকে সৃষ্টির সত্যকার বীজ অঙ্কুরিত হয় সেখানে বাহ্যিক আলোড়নের ঢেউ তাঁদের অনেকেই পৌঁছতে দেননি, কিন্তু যুগের অশান্ত বাষ্পমণ্ডল তাঁদের দৃষ্টিকে কিছুটা রঙীন ও তির্যক বা অপ্রত্যাশিত দিকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে।[১]

সতীনাথের ছোটগল্পের সংখ্যা মোট উনষাটটি। তাঁর রচিত এই ৫৯টি গল্প ৭টি গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। প্রকাশকালের ক্রমানুযায়ী গ্রন্থতালিকাটি হলো, 'গণনায়ক' (১৯৪৮), 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (১৯৪৯), 'অপরিচিতা' (১৯৫৪)

'চকাচকী' (১৯৫৬), 'পত্রলেখার বাবা' (১৯৬১), 'জলভ্রমি' (১৯৬২), 'অলোক-দৃষ্টি' (১৯৬৪)। সতীনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'জামাইবাবু' মুদ্রিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ সংখ্যায় (১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে)। এই হিসাবে বলা যায় সতীনাথ গল্প লিখেছেন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে। অবশ্য একথা স্বীকার্য, 'জাগরী' উপন্যাস (১৯৪৫) প্রকাশের পরেই সতীনাথ সাহিত্যকে তাঁর কর্মজীবনের একমাত্র আশ্রয় করেছেন।[২] তার আগে তিনি ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে লেখা গল্প নিয়ে প্রকাশিত প্রথম গল্পসংকলন 'গণনায়ক' (১৯৪৮) থেকেই তাঁর গল্পরচনায় রীতিমত সূত্রপাত, যা বজায় ছিল তাঁর মৃত্যু (১৯৬৫) পর্যন্ত।

১৯৪৬ থেকে ১৯৬৫ এই বিশ বছর সতীনাথের গল্পচর্চার পর্ব। উনিশ বছরে সাতটি গল্পগ্রন্থ, মোট গল্পের সংখ্যা উনষাট। সতীনাথ-গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে বারটি, দ্বিতীয়ে সতেরটি, তৃতীয়ে উনিশটি আর চতুর্থে চৌদ্দটি ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে নিতান্ত কম না হলেও ছোটগল্পকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সতীনাথের পরিচিতি নিতান্তই অল্প। অথচ তাঁর গল্পগুলি জনপ্রিয় প্রচলিত পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'চকাচকী' গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায় ১৫ই শ্রাবণ ১৩৬১তে প্রকাশিত হয়েছে। 'বৈয়াকরণ' গল্পটিও 'দেশ' পত্রিকায় (২৯শে পৌষ, ১৩৬২), 'মুষ্টিযোগ' 'দেশ' শারদীয় (১৩৬১), 'তবে কি' 'দেশ' ১৬ আষাঢ় (১৩৬৩), 'বাহাত্তুরে' দেশ শারদীয় (১৩৬৬), এছাড়া 'ডাকাতের মা' গল্পটি ১৯৬১তে 'যুগান্তর' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সতীনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'জামাইবাবু' (সতীনাথ গ্রন্থাবলী চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত)। এই গল্পটি সতীনাথের পঁচিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। গল্পটি মাত্র ছেচল্লিশটি পংক্তিতে সম্পূর্ণ। এই গল্পটি সাতটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। 'জামাইবাবু' গল্পটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গল্পটিতে অল্পকথায় অনেক কথা বলা হয়েছে। তখনকার প্রচলিত এক ব্রহ্মচারী বিবাহ করে, তার পর পর তিনটি কন্যা জন্মায়, চতুর্থবার প্রসবের সময় স্ত্রী ও নবজাতকের মৃত্যু ঘটে। শ্বশুরবাড়িতে থেকে তাঁরই অনুগ্রহ গ্রহণ করে, তাঁরই দেওয়া চাকরি করে, পরে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে রেলে চাকরি করতে যান জামাইবাবু। পরে জানা গেল 'জামাইবাবু' চুয়াডাঙায় আবার বিয়ে করেছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জামাইবাবু ধাপ্পা দিয়েই চালিয়েছেন।

এই গল্প সম্পর্কে সে সময় একটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত এক সমালোচকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

"তুলির দুই চারিটি রেখার টানে যেমন একটি মূর্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে, লেখনীর দু চার আঁচড়েই তেমনই ভাদুড়ী মশায়ের সম্পূর্ণ একটি চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে। ছোট দুই চারিটি ছত্র, কিন্তু তাহারই মধ্যে আমাদের অতি পরিচিত একটি মানব চরিত্র পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছে। 'জামাইবাবু' একটি সার্থক রচনা। লেখকের লিপিনৈপুণ্যের তারিফ করি। পাঁচের পরিচ্ছেদটি লিখনভঙ্গীর দিক দিয়া চমৎকার।"

প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশংসা পেয়েছিলেন পশ্চিমবাংলা থেকে দূরে এক প্রবাসী বাঙালী তরুণ লেখক। কিন্তু সেদিন আর গল্প লেখেননি সতীনাথ। চলে গিয়েছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। আবার রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে আবার গল্প লেখা শুরু করেছিলেন ঠিক পনের বছর পরে (১৯৪৬)। বিশ বছর যাবৎ (১৯৪৫-১৯৬৫) লেখা বাষট্টিটি ছোটগল্পগুলি আলোচনা করে বলা যায় সতীনাথ প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক। আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর গল্পগুলিকে চারপর্বে বিভক্ত করে বিচার করা যায়।

প্রথম পর্বে—'গণনায়ক' (১৯৪৮)। এই গ্রন্থে পাঁচটি গল্প সংকলিত আছে,—'গণনায়ক, 'বন্যা', 'সনটা বাংলা' 'পংকতিলক' এবং 'ভূত'।

দ্বিতীয় পর্ব—'অপরিচিতা' (১৯৫৪) ও 'চকাচকী' (১৯৫৬)। দ্বিতীয় পর্বের 'অপরিচিতা' গ্রন্থে 'অপরিচিতা', 'পরিচিতা', 'ফেরবার পথ', 'রথের তলে,' 'ষড়যন্ত্র' 'মামলার রায়,' 'অনাবশ্যক,' 'ঈর্ষা,' এই সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে।

'চকাচকী' গ্রন্থে আছে—'চকাচকী', 'বৈয়াকরণ', 'ডাকাতের মা', 'বিবেকের গণ্ডি', 'মুষ্টিযোগ', 'রাজকবি', 'মুনাফা ঠাকুরুণ', 'তবে কি' এই আটটি গল্প আছে।

তৃতীয় পর্ব—'পত্রলেখার বাবা' (১৯৫৯)। এতে নয়টি গল্প সংকলিত 'পত্রলেখার বাবা', 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ,' 'বাহাত্তুরে,' 'সাঁঝের শীতল,' 'একটি কিংবদন্তীর জন্ম,' 'স্মৃতিগন্ধ,' 'অভিজ্ঞতা,' 'ধস'।

চতুর্থ পর্ব—'জলভ্রমি' (১৯৬২) ও 'আলোকদৃষ্টি' (১৯৬৪)। 'জলভ্রমি' গ্রন্থে সংকলিত আছে নয়টি গল্প 'মহিলা-ইন-চার্জ', 'কৃষ্ণকলি', 'জলভ্রমি', 'স্বর্গের স্বাদ' 'চরণদাস এম. এল. এ.', 'দাম্পত্য সীমান্তে', 'এই অপ্রয়োজনীয় পদার্থ' এবং 'হিসাবনিকাশ'।

'অলোকদৃষ্টি' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে দশটি গল্প—'অলোকদৃষ্টি', 'ভাক্লুগাণ্ডি', 'ব্যর্থ', 'তপস্যা', 'পরকীয় সন-ইন-ল', 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ', 'জোড়কলম', 'ধরোকমি', 'শেষ সংখ্যান', 'গৌজ', 'সরমা'।

সতীনাথের গল্পগুলির পরিবেশ ও চরিত্র এসেছে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই। অবশ্য নিছক কল্পনাজাত বা অধ্যয়নজাত সতীনাথের কিছু গল্প আছে, তবে তা সংখ্যায় খুবই কম।[৪] বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি নিজের চারপাশে দেখা ঘটনা, পরিবেশ থেকে সাদামাটা চরিত্র তুলে নিয়েছেন, কিন্তু সেখানেই থেমে যাননি। "চরিত্রগুলি যেন কোনো আশ্চর্য স্পর্শে আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করার মতন শক্তি সঞ্চার করে নিয়েছে। দুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, প্রেম, দাম্পত্য সম্পর্কে নানাবিধ বিষয় নিয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলি লেখা, অথচ একালের অধিকাংশ লেখকের মতন এইসব গল্পে অকারণ চাকচিক্য, প্রগলভতা ও তৃতীয় শ্রেণীর নাটকীয়তা নেই।"[৫]

"সতীনাথ ব্যক্তিচরিত্রের ফাঁকি ও ত্রুটি যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি এঁকেছেন মহৎ মানবিক প্রকাশ, ধরেছেন জীবনের কয়েকটি "উজ্জ্বল মুহূর্ত"। স্বাধীনতার পর দেশ শাসনে বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্র, সরকারী অব্যবস্থা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহ লাভের প্রয়াস, অর্থলোলুপতা, স্বার্থপরতা, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থ-হরিজন সমস্যা তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে, রূপ পেয়েছে ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক গল্পে।"[৬]

স্বাধীনতালাভের কয়েকদিন পরেই সতীনাথের 'গণনায়ক' গল্পটি 'দৈনিক কৃষক'-এর শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। একদিকে যখন নূতন স্বাধীনতার আনন্দে দেশবাসী মত্ত তখন অপরদিকে স্বাধীনতার অন্ধকার দিকটি সতীনাথ তুলে ধরেছেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে দেশভাগের পটভূমিকায় সদ্যোজাত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সাধারণ জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও মুনীমজীর মতো লোকের 'গণনায়ক' হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

সীমান্তবর্তী অঞ্চল আবুয়াখোয়ায় হাট বসে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি চোরা-কারবারের ঘাঁটি। এ স্থান পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানার অন্তর্গত। এর অপরদিকে দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানা। মাঝখানে 'নাগর' নদী যোগসূত্র। মালদা, পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে যাওয়ার জন্য হাটের পাশ দিয়েই একটি রাস্তা আছে। এই হাটের বৈশিষ্ট্য লেখকের বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়েছে।

"বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ষোল মাইল দূরের বুধানী স্টেশন থেকে

চোরাকারবারের কেন্দ্র আবুয়াখোয়া বাজার থেকে পুল পার হয়ে যায় গরু, মোষ, চিনি, ঘি, আর বাংলাদেশ আসে চাল আর ধান।"[১]

"এই 'আবুয়াখোয়া হাট'-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে হিন্দু, মুসলমান উভয়েরই বাস। হিন্দুদের অধিকাংশই রাজবংশী। হাটের ইজারাদার মুসলমান হাজী সাহেব। তিনি সব হাটুরেদের কাছ থেকে তোলা সংগ্রহ করেন। এই হাটের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি—সুধানী-গোলার জহরমল ডোকানিয়ার মুনীমজী। কারণ "সে অতবড় গোলার লেখাপড়া জানা মুনীম: তার উপর তাঁর মালিকের বাড়িতে 'বিজলী'তে খবর আনবার কল আছে। সেই কলে লাটসাহেব পর্যন্ত ডোকানিয়াজীর সঙ্গে কথা বলেন, কত লোক কত খবর সেখানে দেয়, কত আওরৎ তাঁকে খুশী করবার জন্য গান বাজনা শোনায়।"[২]

মুনীমজী হাটে এসেছেন, সকলেই তাঁর কাছে জানতে চায় কোন্ জেলা কোন্ দেশে পড়েছে। রাজবংশীদের পুরোহিত জলপাইগুড়ি জেলার তিতলিয়া থানার বজরগাঁর পোড়া গোঁসাই। তিতলিয়া থানা হিন্দুস্থানে থাকার সপক্ষে তাঁর যুক্তি হলো, "বাপ পিতামহর আমল থেকে আমরা রয়েছি বজরগাঁয়। পাকিস্থানে চলে গেলেই হল। জল্পেশ্বরের এলাকা, মহাকালের রাজ্য। চলে যাবে পাকিস্থানে?"[৩] এরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে হিন্দু হলেই পাকিস্তান ছাড়তে হবে এবং মুসলমান হলে হিন্দুস্থান ছাড়তে হবে। কলিকাতা, নোয়াখালি ও বিহারের নানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আবহমানকাল পাশাপাশি দুই জগতের সম্পর্ক প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়েছে। যে-কোন সংবাদেই এরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ও একে অপরকে ঘৃণা, বিদ্বেষের চোখে দেখেছে। হিন্দুরা মুসলমান ইজারাদারকে তোলা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইজারাদার সাহেবের মত লোকও নিজের সমাজ ছেড়ে থাকতে সাহস করছেন না। হাটুরে কাসেম শুধুমাত্র মুসলমান বলেই অনায়াসে ইজারাদার সাহেবের কাছে যেতে সাহস করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্বে এ সাহস তার ছিল না।

দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানার রাজবংশী দর্শন সিংয়ের পরিবারের সম্পূর্ণ চিত্র সতীনাথের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীপুর থানা পাকিস্তানে পড়ার সংবাদে দলে দলে হিন্দু এদিকে আসছে। সপরিবারে দর্শন সিংয়ের স্ত্রীকে সাওজীর প্রশ্নে সে সময় সাধারণ মানুষের কৌতূহল কোন্ পর্যায়ে পৌছেছিল বুঝতে পারা যায়। সে জানতে চেয়েছে, "তোমরা তো পুলের ওপারে

পাকিস্থান হওয়ার পর একদিন ছিলে। হাওয়াতে কি রসুন ফোড়নের দুর্গন্ধ নাকি? লোকগুলো শাক ডাঁটা সে রাতে কাউকে খেতে দিয়েছিল? বজ্জাতি আরম্ভ করেছিল বুঝি! ..[৪]

রাজবংশীর মেয়েকে দর্শন সিংয়ের চাকর এরফানের বিবাহ করার সম্ভাবনায় দর্শন সিংয়ের বাবা উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে যায়। তার স্বাজাত্যভিমান জেগে ওঠে। কিন্তু এরফানের কাছে নিজের জাতের চেয়ে প্রভুর প্রতি আনুগত্য বেশী। সে প্রভুর কন্যা-জামাতা ও দৌহিত্রকে নির্বিঘ্নে সীমান্ত পার করে দেয়।

এই 'গণনায়ক' গল্পটিতে পূর্ণিয়া জেলার বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে, "পূর্ণিয়া জেলার একদিকটা ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের এলাকা। পড়তি জমি পড়ে আছে কোশের পর কোশ অভাব পয়সার, অভাব চাষ করবার লোকের।"[৫] এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু তাঁর 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসে ও 'ঠুমরী' গল্পে পূর্ণিয়া জেলার এই চিত্র উপস্থাপিত করেছেন।[৬]

দর্শন সিংয়ের বৃদ্ধ পিতার অনুভূতি আমাদের মনকে বেদনার্ত করে তোলে। এই দেশবিভাগের সময় সাধারণ জীবনের সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সাধারণ মানুষের অসহায়তা লক্ষণীয়। একদিকে দর্শন সিংয়ের বৃদ্ধ পিতা ভেবেছে "শ্রীপুর হিন্দুস্থানে আসবে এ দুরাশা যে কদিন জীইয়ে রাখা যায়। তারপরই তো সম্মুখে পড়ে আছে দুঃখ-বেদনাময় জীবন যার সূচনা আরম্ভ হয়ে গেছে সেই পুল পার হওয়ার দিন থেকেই দীর্ঘ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির স্মৃতি, সব সেই দিন ওপারে রেখে এসেছে। এই বুড়ো বয়সে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করা কি সম্ভব? আর, এই দেশে? এতটা বয়স হল—'নাগর' নদীর পশ্চিমের দেশকে তারা জ্বরের দেশ বলে জেনে এসেছে। আজ একে সোনার হিন্দুস্থান বলে জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ করে নাচার অসংগতি বৃদ্ধের সংসারাভিজ্ঞ মনে খচ খচ করে বেঁধে। কেন এমন হল তা সে ভেবে কূল কিনারা পায় না। সেবার "নাগর" যখন ঘর দোর ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তখনও মাচা বেঁধে বাঁধের রাস্তার উপর কতদিন কাটাতে হয়েছে। এপারে আসবার কথা কল্পনাতেও আনতে পারেনি।"[৭] অপরদিকে মুসলমান অছিমদ্দী বলে, "গাঁ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম হরিপুরের দিকে। মীরপুর হিন্দুস্থান হয়ে গিয়েছে পরশু থেকে। শুনেছি পূর্বদিকে মুখ করিয়ে নামাজ পড়াবে। মুরগী জবাই করতে দেবে না। তাই এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছি।"[৮]

দেশ ভাগ হয়েছে। কিন্তু ভারতকে কেন্দ্র করে ছেলেদের ভূত ভূত খেলা সত্যই পীড়াদায়ক। আরও পীড়াদায়ক এই খেলায় বড়দের উল্লাস। যা ছোটদের উৎসাহিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সকলে যেন ভাল মন্দের বোধশূন্য হয়েছে। দেশ ভাগ হওয়ার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ উচ্ছ্বসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে। রিলিফ কাম্পের বিজয় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ঝাণ্ডা ভূতের খেলা দেখানো হচ্ছে।

মুনীমজীর ব্যবহার মানবতাবোধশূন্য। তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে দ্বিধা করেননি। তাঁর লুব্ধ মনোবৃত্তির পরিচয় সাধারণ মানুষের অগোচরে থেকে গেছে। সহানুভূতি ও সেবার অন্তরালে তাঁর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পায়নি। লেখক তা খুবই সুন্দরভাবে এই গল্পে তুলে ধরেছেন—

"মুনীম সাহেব কী জয়, মহাত্মা গান্ধীজী জয়।"—

জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। মুনীমজী ওপারে সকল লোককে বলেন যে, 'সকালে পাকিস্থান ফ্ল্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে দিও। আমি গভর্ণমেণ্টের কাছে জমা করে দেব। হিন্দুস্থানে পাকিস্থানী ফ্ল্যাগ রাখা বারণ।'

তাঁরই দেওয়া পাকিস্থান-নিশানগুলি আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে।

তিনি মনে মনে ভাবেন—এগুলি নিয়ে কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। গোড়া গোঁসাইয়ের খালি বাড়িতে উঠবেন, তার জমিটমিগুলো একবার দেখেও আসবেন, সেখানে বেচতে হবে এই পাকিস্থান ঝাণ্ডাগুলো। আর সেখানে যোগাড় করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থানী পতাকাগুলি। একই জিনিস দু'দুবার করে বেচবেন। তিনি হিসেব করেন সব মিলিয়ে তাঁর কত হল।" (গণনায়ক—সতীনাথ ভাদুড়ী) মুসহর সাও, আছিমুদ্দী, কাসেম, রহমত, দর্শন সিং সবাইকে মুনীমজী বোকা বানান।

প্রথাসিদ্ধ কাহিনী না থাকলেও 'গণনায়ক' গল্পটির মূল্য কম নয়। তিনি গল্পটিতে বহু চরিত্র এনেছেন। অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে তিনি গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের মানসিকতার বিশ্লেষণ করেছেন।

সতীনাথের 'বন্যা' গল্পটি 'গণনায়কে'র সমগোত্রীয় রচনা। গল্পটিতে সতীনাথ বিহারের অনগ্রসর সমাজের সামাজিক সমস্যার সঙ্গে মানুষের মুগ্ধ বৃত্তিগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ অতি বাস্তবানুগভাবে করেছেন।

হঠাৎ কুশী নদীতে বান আসায় রসিকপুরা গ্রাম কিছু সময়ের মধ্যে ডুবে যায়। কোনো ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক প্রকাশ ছাড়া রসিকপুরা গ্রামের সকলে একমত কখনও হয় না। আজ হঠাৎ বন্যার প্রকোপে সবাই মিলেছে। তিয়র, মুসহর, ঝা, ধাঙর, বাঁতার তাতমা, মুসলমান—সব জাতের লোক রিলিফ-পার্টির নৌকাতে করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় গঞ্জের বাজারে উঁচু জায়গায় রিলিফ ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুমৃৎ তিয়র, নৌখে ঝা, পেমুয়া মুসহর, তুরিয়া বাঁতার, তিয়র, ঝা বাড়ির মেয়ে-বৌরা, সাঁওতালরা, মুনিরুদ্দি বাধিয়া প্রমুখ শীর্ষাবাদিয়া মুসলমানরা সবাই জাতের বিরোধ ভুলে এক হয়। কিন্তু বন্যার জল নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আবার পারস্পরিক কলহ-বিবাদ-ঈর্ষা-ইতরতা দেখা দেয়। কয়দিনের হৃদ্যতা উবে যায়, দেখা দেয় পুরনো শত্রুতা। এ কয়দিন বন্যার স্রোতে গ্রামের কলহ, মনের পঙ্কিলতা ভেসে গিয়েছিল। জল নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে পুরনো স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, রেষারেষি, জাতপাতের বিবেচনা। 'বন্যা' গল্প তারই জীবন্ত চিত্র।

সতীনাথের 'অপরিচিতা' ও 'চকাচকী' গ্রন্থের পনেরটি গল্পে তাঁর নিজস্বতা ধরা পড়েছে। মানসলোকের আলো-আঁধারি চোরা গলিপথে তাঁর স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ ও গভীর সমীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখনীয় গল্প 'চকাচকী' আর 'বৈয়াকরণ' যার মধ্য দিয়ে লেখক মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রতি সন্ধানী আলো ফেলেছেন।

পূর্ণিয়া অঞ্চলেরই ধামদাহা হাটের দুবে-দুবেনী। তাদেরই লেখক নাম দিয়েছেন চকাচকী। রাজনীতির কাজের সূত্রেই তিনি তাঁর সহকর্মী কানা মুসাফিরলালের সঙ্গে উত্তর বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। মুসাফিরলালই তাঁকে ধামদাহা হাটের দুবে-দুবেনীর কুটিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। হরদা বাজারের সর্বপরিচিত দুবে-দুবেনী, 'জাগরী' উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছেন ধামদাহা হাটের-দুবে দুবেনী। বাস্তব থেকে তুলে আনা চরিত্র ও ঘটনা এখানে শিল্পরূপ পেয়েছে।

বিশ্বনিন্দুক সহকর্মী মুসাফিরলাল দুবে-দুবেনীকে চকাচকী না বলে চড়ুই-চড়ুইনী বলতো, তার ভাষায় "তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ির; এখনও কি ঠমক? ছেঁদো কথার কী বাঁধুনি। দেখেন না নেচে চলে। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াতে চায় চড়ুই পাখির মত। এ গাঁয়ের বুড়োদের কাছ থেকে শোনা যে লোটা আর দুবেনীকে সম্বল করে চল্লিশ বছর আগে,

ডুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের মালিক বিনা সেলামীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল শুধু ডুবেনীর কোমরের লচক দেখে।" এই কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে মুসাফিরলালের চরিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যায়। সব জিনিসেই মুসাফিরলাল খারাপের গন্ধ পায়। কিন্তু ডুবে-ডুবেনীর আতিথেয়তা, সৌজন্য, ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন কথক। শুধু লেখকই নয় পূর্ণিয়া জেলার সব রাজনৈতিক কর্মীকে ডুবে-ডুবেনীর আতিথ্য স্বীকার করতে হত।

ডুবেজীর মৃত্যুশয্যায় ডুবেনী লেখকের কাছে ফাঁস করে দেয় তাদের জীবনের গোপন কথা – চোখের জলে ভেসে ডুবেনী জানায় "আমি ডুবেজীর নিকট আত্মীয়া। ডুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তারা আমারও আপনার লোক। ফিরবার পথ জন্মের মত বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসেছিলাম। যাক, সে-সব ছেড়ে এসেছিলাম বলে দুঃখ নেই। আমার কথা বাদ দাও। কিন্তু নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না পেয়ে ডুবেজী চলে যাবে : তা কি হয়? মুখে আগুনটুকু পাবে না? তবে আর লোকের ছেলে হয় কিসের জন্য? তুমি বাবুজী, ওর ছেলেকে যেমন করে পার নিয়ে এস বাড়ি থেকে।"

ডুবেনীর কাতর অনুনয়ে লেখককে যেতেই হয় ডুবের বাড়ি। নিয়ে আসেন ডুবেনীর অনিচ্ছুক ছেলেকে সৎকারের জন্য —বাপের মুখে আগুন দেবার জন্য। ফিরে এসে শোনেন ডুবেনী সব কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে অজ্ঞাতে সরে গেছেন। ডুবেজীর সৎকার হয় ছোট নদীর ধারে শ্মশানে। নদীর ওপারে কাশবন হঠাৎ নড়ে উঠল—কাশের সমুদ্রের মধ্যে ঘসঘসানির ঢেউটা মিলিয়ে গেল। মুসাফিরলাল বলে—'শিয়াল হবে বোধ হয়।' লেখক বিশ্বনিন্দুক মুসাফিরলালকে হঠাৎ নতুন করে চিনলেন। 'ভেতরের কথা কেবল তারা দুজনেই জানেন। ডুবেজীর শেষ কৃত্যের, স্বর্গলাভের জন্য ডুবেনী চল্লিশ বছরের ভালবাসার দাবি সরিয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে : তবু সমাজ-অস্বীকৃত সেই ভালবাসার টানে রাতে নদীর ওপারে কাশবনে লুকিয়ে দেখেছেন ডুবেজীর শেষকৃত্য। কেউ জানল না ডুবেনীর আত্মত্যাগ। জানলেন কেবল কথক আর মুসাফিরলাল।' (চকাচকী)।

যদিও লেখক গল্পের আরম্ভে বলেছেন—'এ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের প্রতি।' কিন্তু ডুবে-ডুবেনীর প্রেমের সঙ্গে মুসাফিরলালের চরিত্রটিও উজ্জ্বলতর

হয়ে উঠেছে। মনোগহনের জটিল পথে সতীনাথের স্বচ্ছন্দ পরিক্রমণের ফলশ্রুতি 'চকাচকী' একটি সার্থক গল্প।

'পত্রলেখার বাবা' গ্রন্থটিতে সতীনাথের যে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে অলৌকিক নারকীয় অতিসূক্ষ্ম গূঢ় অস্বাভাবিক বক্রগতি মনোবিকার ইত্যাদিকে তিনি সুনিপুণ শিল্পচাতুর্যে তুলে ধরেছেন। যেমন 'পত্রলেখার বাবা' গল্পটিতে অভিনব মনোবিকারের পরিচয় দিয়েছেন—পরছিদ্রান্বেষী দোল-গোবিন্দবাবু বেনামা চিঠি ঝেড়ে উদ্দিষ্টের উপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে আনন্দ পান, শেষে তারই মেয়ের গোপন প্রেমপত্র মেয়ের বই থেকে পেয়ে হতবাক হলেন, তখন নিজের স্ত্রীকেই বেনামা পত্র লিখতে বসলেন। এই গ্রন্থের 'পুতিগন্ধ' ও 'সাঁঝের শীতল' এক ধরনের নৈতিক অধঃপতনের নিষ্ঠুর গল্প। ঠিক তেমনি 'ধস' গল্পে এক রমণীর অবচেতন মনে বাসা বেঁধেছে এক অপরাধবোধ—মনচনিয়ার সদ্যোজাত ছেলেটি তার স্তনভারে চাপা পড়ে মারা যায়—বাড়ির বুড়ি কুত্তী করিয়া যখন আশ্রিত বাচ্চা কুকুরকে স্তন্যদান করে তখন নিজের অপরাধবোধে বেদনা পায় মনচনিয়া। মনোবিকার আর মনের বিচিত্র বক্রগতি 'পত্রলেখার বাবা' গল্পসংকলনে শিল্পরূপ পেয়েছে।

উপরোক্ত গল্পগুলি ছাড়া সতীনাথ ভাদুড়ী কিছু গল্পের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজের ত্রুটি, নীচতা, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, দেশশাসনে বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্রের কর্মশৈথিল্য, দায়িত্বহীনতা ও অর্থলোলুপতা, সরকারী অব্যবস্থা, রাজনীতিকদের নীতিহীনতা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহলাভের প্রয়াস, উত্তর বিহারের রাজপুত-ভূমিহার কায়স্থ হরিজন সমস্যা ইত্যাদি বিষয় 'চরণ দাস এম. এল. এ.' 'তিলোত্তমা সংস্কৃতি সংঘ', 'পরকীয় সন-ইন-ল', 'জোড়-কলম', 'মা আম্রফলেষু', 'এক ঘণ্টার রাজা', 'সরমা', 'একচক্ষু', 'একঘণ্টার রাজা' এবং 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' গল্পগুলিতে প্রকাশ করেছেন।

হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'ও হিন্দী সাহিত্যজগতে সর্বপ্রথম ছোটগল্প নিয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'বটবাবা' ১৯৪৫-এ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বিশ্বমিত্রে' মুদ্রিত। প্রেমচন্দের পর হিন্দী কথাসাহিত্যে জৈনেন্দ্রকুমার, নাগার্জুন, ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ী, অজ্ঞেয়, উপেন্দ্রনাথ অশক, ভগবতীচরণ বর্মা, ইলাচন্দ্র জোশী প্রভৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। আধুনিক হিন্দী ছোটগল্পের ধারার সঙ্গে ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র গল্পের

বিশেষ কোন সাদৃশ্য নেই। তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন রাজনৈতিক মতবাদ অথবা নবলব্ধ পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন অবলম্বন করে কোন তত্ত্বভিত্তিক কাহিনী রচনা করেননি, কর্মজীবনে যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সমষ্টিগতভাবে তাদের পরিচয় প্রদান করেছেন। সমস্ত গল্পগুলির মধ্য দিয়ে পূর্ণিয়া অঞ্চলের সাধারণ মানুষের লৌকিক আচার-আচরণ, তাদের ভাষা, জাতিপ্রথা ইত্যাদির দ্বারা তাদের জীবনের এমন নিখুঁত পরিচয় দান করেছেন। তিনি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন, তাই তাদের নিম্নস্তরের যে জীবন তারও রহস্য তিনি উদ্ধার করেছিলেন।

জাতপাত অন্ধ কুসংস্কারে ভরা বিহারের নিম্নবিত্ত গ্রাম্যসমাজের ঘরের ছবি আশ্চর্যরকমভাবে ফণীশ্বরনাথ রেণুর তাঁর ছোটগল্পে সার্থক করে তুলেছেন। এখানেই সতীনাথের সঙ্গে ফণীশ্বরনাথ রেণুর ছোটগল্পের চরম সার্থকতা। পূর্ণিয়া অঞ্চলেরই গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় 'রেণু'র 'তিসরী কসম' 'উর্ফ মারে গয়ে গুলফাম,' 'রসপ্রিয়া', 'দীর্ঘতপা', 'ঠেস', 'লাল পান কী বেগম', 'তিন বিন্দিয়া', তীর্থোদক', 'আদিম রাত্রি কী মহক', 'অচ্ছে আদমী' 'অগিনখোর', 'রেখায়েঁ', 'বৃত্তচক্র' 'ভিত্তি চিত্র কী ময়ূরী' এবং 'অক্ল অউর ভৈঁস' ইত্যাদি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি প্রচলিত এবং জনপ্রিয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র 'ঠুমরী' (১৯৫৯), 'আদিম রাত্রি কী মহক' (১৯৬৭), 'অগিনখোর' (১৯৭৫) ইত্যাদি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

'ঠুমরী' (১৯৫৯) গ্রন্থটিতে নয়টি গল্প 'রসপ্রিয়া', 'তীর্থোদক', 'ঠেস', 'নিত্যলীলা', 'পঞ্চলাইট', 'সিরপঞ্চমী কা সগুন', 'তিসরী কসম', 'উর্ফ মারে গয়ে গুলফাম', 'লাল পান কী বেগম' এবং 'তিন বিন্দিয়াঁ'। এই গ্রন্থটির 'ঠুমরী' নামের সার্থকতা সম্পর্কে রেণু নিজেই বলেছেন—'এই গ্রন্থটি ঠুমরীধর্মী কারণ এতে সংকলিত সব গল্পগুলির একই বৈশিষ্ট্য। বিষয় বৈচিত্র্যে আলাদা হলেও অন্তঃস্থিত একই ভাবধারা গল্পগুলির প্রাণ'।[৯] 'ঠুমরী' গ্রন্থের মধ্যে 'তিসরী কসম' উর্ফ মারে গয়ে গুলফাম' গল্পটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গল্পটিকে নিয়ে শৈলেন্দ্র 'তিসরী কসম' নামক হিন্দী চলচিত্র ১৯৬৬তে তৈরি করেছিলেন, যা শ্রেষ্ঠ হিন্দী চলচ্চিত্র হিসাবে স্বর্ণপদক পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এই গল্পটি সম্পর্কে ড. নামবর সিং মন্তব্য করেছেন, এতে কোন প্রথাসিদ্ধ কাহিনী নেই এবং এর সংযোজন ঔপন্যাসিক হয়েছে। কিন্তু পরে আবার নিজের কথাকে সংশোধন ড. সিং মন্তব্য করেছেন; সংগীতের দ্রুত স্বরের মত সংবেদনার [illegible]

একেকটি প্রতিক্রিয়া নিজের স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে এবং শেষে এক নিবিড় প্রভাবে মিলেমিশে যায়।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'তিসরী কসম' গল্পটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হীরামন আমাদের মনের মধ্যে একটা বিশেষ রণন তুলে। হীরামন এখন হিন্দী কথাসাহিত্যের ক্লাসিক চরিত্র হয়ে গেছে। তার কোমল ধুকধুক হৃদয়, তার তরল অতৃপ্ত প্রেম, তার অন্তরের অনুরাগ এবং পরে যে বিষাদের চিত্র ফণীশ্বরনাথ চিত্রিত করেছেন তা ভোলা যায় না।

"হীরামন কী পাঠ মেঁ গুদগুদী লগতী হৈ।" "রহ-রহকর চম্পা কা ফুল খিল যাতা হে উসকী গড়ী মেঁ।" "হীরামন হীরাবাঈ কে তকিয়ে কো সুঁঘতা হৈ। ইতনী সুগন্ধ "

তার মনে হয় সে যেন একসঙ্গে পাঁচ ছিলিম গাঁজা খেয়েছে, নিশ্চয়ই তার নেশা হয়েছে। হীরামনের অনুরাগকে এর চেয়ে অধিক ব্যঞ্জনা দিয়ে বোঝানো যায় না। গল্পটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কলাকৌশলে এবং শিল্প-চাতুর্যে পরিপূর্ণ। গল্পটির মধ্য দিয়ে সহজ-সরল-সহৃদয়-গেঁয়ো হীরামন গাড়োয়ানের ঝুমুর যাত্রা কোম্পানীর নৃত্যাঙ্গনা হীরাবাঈয়ের প্রতি স্বাভাবিক নিষ্কাম ভাললাগা ভালবাসার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। উভয়ের প্রেম অধিক সোচ্চার হতে পারেনি কারণ তা অনুভব করার জন্য, অভিব্যক্তিত করার জন্য নয়। 'রেণু'র রচনাকৌশলে এ প্রেম শব্দাতীত হয়েছে। হীরামনের একাকিত্বই সমস্ত কাহিনীটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে যা 'রেণু'র নিজের জীবনদর্শন 'হীরামন' গাড়োয়ানের চরিত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। হীরামনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সহজ, সরল, স্বাভাবিক, কুশল গল্পকারের গুণ রঙ্গ-রস, হাসানোর প্রবৃত্তি, গাঁয়ের প্রতি আকর্ষণ চিত্রিত হয়েছে তা 'রেণু'র চরিত্রেও পরিপূর্ণ ছিল। হীরামনের মত 'রেণু'ও তাঁর জীবনে তিনটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। প্রথমত তিনি যা রচনা করবেন তার মধ্য দিয়ে পূর্ণিয়া অঞ্চলের নির্যাতিত, নিপীড়িত, সহজ সরল সুখদুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ, অভাব-অনটনে ভরা মাটির মানুষের ছবি আঁকবেন, তাঁদের মানুষের মত বাঁচার জন্য তাদের মুখে ভাষা দেবেন। যা তাঁর স্রষ্ট 'মৈলা আঁচল' ও 'পরতী পরিকথা' উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা যখনই রচনা করতে অসমর্থ হয়েছেন ঠিক তখনই তিনি নির্বাচনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৪-এ সত্যাগ্রহীদের উপর সরকারের

লাঠি প্রহারের প্রতিবাদে সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' উপাধি এবং সরকারী বৃত্তি পরিত্যাগ করেন, জরুরী অবস্থার সময় বিহারের বিভিন্ন শহরে সরকারের বিরুদ্ধে সভা করেন, মিছিল করতে গিয়ে লাঠির আঘাতে আহত হন। আর তাঁর জীবনে তৃতীয় প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি কোনদিন কোন অবস্থাতেই পরাজয় স্বীকার করবেন না, এমনকি মৃত্যুর কাছেও নয়; তাই হাসপাতালে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েও অপারেশন করার পূর্বমুহূর্তে জনতা দলের বিজয়বার্তা শোনার জন্য রোগ থেকে উঠে গিয়ে গান্ধী ময়দানে চলে এসেছিলেন। 'রেণু' আজ নেই কিন্তু তাঁর সংঘর্ষপূর্ণ জীবনে রচনার মধ্য দিয়ে যে আগুন প্রজ্বলিত করে গেছেন তার তাপশক্তি এখনও ততটাই আছে যা তাঁর জীবিতকালে ছিল।

হীরামন গাড়োয়ানের মনে যে বিচিত্র আশঙ্কার উদয় হয়েছে তা মানুষের সহজ মনেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। জোছনারাতে যখন এক টুকরো চাঁদের আলো হীরাবাঈয়ের মুখে পড়েছে সেই নরম আলোয় হীরাবাঈয়ের অতুলনীয় সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়ে চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেছে—'অরে বাপ। ইতো পরী হৈ।' আশ্বিন-কার্তিক মাসের ভোরবেলায় ঘন কুয়াশায় সে অনেকবার দিকভ্রষ্ট হয়ে ভুল পথে চলে গেছে কিন্তু আজ আর পথ ভুল হবে না কারণ তার গাড়িতে চাঁপা ফুল ফুটেছে। যার গন্ধ সে মাঝে-মাঝে পাচ্ছে। পিঠে একটা বিশেষ শিহরণ, সেই ফুলের মাঝে একটি পরী বসে আছে। যে স্বপ্নলোকের পরী নয়, সাক্ষাৎ পরী—হীরাবাঈ। এরপর কুয়াশা ছেড়ে যাবার পর চাদর নিয়ে গাড়ির দুদিকেই হীরামন পরদা লাগিয়ে দিয়েছে। পথের লোকেরা জিজ্ঞেস করায় হীরাবাইকে 'বিদাগী' (অর্থাৎ নূতন বৌ যে শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছে) বলে পরিচয় দিয়েছে, পথে যেতে যেতে সেই অঞ্চলের বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা করেছে, বিড়ি খাওয়ার আগে হীরাবাঈয়ের অনুমতি নেওয়া ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পকার রেণু হীরাবাঈয়ের প্রতি হীরামনের প্রেমকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। সম্পূর্ণ গল্পটিতে হীরামনের একাকিত্ব গভীর অনুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

রেণুর এই গল্পটিতে যে পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ অঞ্চল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 'সজনওয়া বৈরী হো গয়ে হমার' সঙ্গীতটি জামলগর, কজরী নদী ও মহুয়া ঘটওয়ারিন ইত্যাদি লোককথার বর্ণনার মধ্যে হীরাবাঈ ও হীরামনের গভীরতম হৃদয়ের অন্তস্তলে যে সম্পর্ক

অজান্তে দানা বাঁধছিল তারই সূচনা করেছে। 'তিসরী কসম' গল্পটির 'গান' ও 'কথা' গল্পের আকারে গড়ে চরিত্রগুলির জীবনকথার অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

"লালি-লালি ডোলিয়া * মেঁ
লালি রে দুলহনিয়াঁ। *
পান খায়ে···।

যখন হীরামন তার গাড়িতে হীরাবাঈকে বসিয়ে ঘোরাতে নিয়ে চলেছে তখন এ গানটি শুনে তার মনের সুপ্ত বাসনার প্রতিচ্ছবি যেন ঠিক সেই সময়েই হীরাবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে হীরামনের সহজ-সরল সুন্দর হাসিতে ফুটে উঠেছে। হীরামন হেসেছে। নতুন বৌ, পান খেয়ে যার ঠোঁট লাল, যে মুখ মুছতে গিয়ে বরের কাপড়কে রাঙিয়ে ফেলেছে। তেগছিয়া গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা পাল্কির পিছনে গান গেয়ে নতুন বৌকে বলছে—ও টুকটুকে লাল বৌ তুমি এই তেগছিয়া গাঁয়ের আমাদের ভুলে যেও না। আসার সময় পাটালি গুড় আনবে। তোমার বর লাখ বছর বাঁচবে। গানটির মধ্য দিয়ে যেন হীরামনের অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা বাণীরূপ পেয়েছে। 'মহুয়া ঘটওয়ারিন'-এর গানে ভরা করুণ কাহিনী যেন হীরাবাঈ ও হীরামনের জীবনা-লেখ্য হয়ে উঠেছে। মহুয়া ঘটওয়ারিনও কুমারী ছিল, হীরাবাঈও তাই, ওদিকে মহুয়াকে সওদাগর দাম দিয়ে একদিন পাল তোলা নৌকাতে তুলে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি হীরাবাঈকে নাট্য কোম্পানীর মালিক নিয়ে যায়। হীরামনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হীরাবাঈ বলেছে—

"তুমহারা জী বহুত ছোটা হো গয়া হৈ। ক্যোঁ মীতা? ···মহুয়া ঘটওয়ারিণ কো সোদাগর নে জো খরিদ লিয়া হৈ, গুরুজী।"

এই প্রসঙ্গে হীরামনের জন্য হীরাবাঈ যে 'মিতা' ও 'গুরুজী' সম্বোধন করেছে তা তার গভীরতম হৃদয়ের আন্তরিক অভিব্যক্তি যা অনুভব করার বস্তু। আলোচ্য গল্পটিতে মহুয়া ঘটয়ারিনের যে উপকথার বর্ণনা করা হয়েছে তা যেন হীরামন ও হীরাবাঈদের জন্য 'ম্যাগনিফাইং' কাঁচের কাজ করেছে, কারণ এতে উভয়ের জীবনেরই আন্তরিক ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মেলার পরিবেশটিও হীরামনের চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে উদ্ঘাটিত করেছে। হীরামন নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে এমনকি ধরে মেরেছে শুধু এজন্য যে

* ডোলি—পাল্কি।
* দুলহনিয়া—নতুন বৌ।

তারা হীরাবাঈকে 'রাণ্ডী' বলে উপহাস করেছে। হীরাবাঈ শুধু হীরামনের জন্যই নয় তার সমস্ত সঙ্গীদের জন্যই টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। গল্পটির মধ্যে পরিবেশের যথার্থতা প্রেম সংবেদনার একটা জীবন্ত রূপ হয়ে উঠেছে, যা গল্পটির শেষে মর্মস্পর্শী অতল গভীর রূপ হয়ে উঠেছে।

'উসনে উলট কর দেখা, বোরে ভী নহী, বাঘ ভী নহী ··পরী···দেবী ···মিতা···হীরাদেবী···মহুয়া ঘটওয়ারিণ···কোই নহী। ঘরে হয়ে মুহূর্তোঁ কী গুঙ্গী আওয়াজেঁ মুখর হোনা চাহতী হৈ। হীরামন কে ওঠ হিল রহে হৈঁ। শায়দ য়হ 'তীসরী কসম' খা রহা হে কম্পনী কে ঔরত কী লদনী··· ।' (তিসরী কসম উর্ফ মারে গয়ে গুলফাম, পৃ-১৬৫।)

হীরামনের আন্তরিক একাকিত্ব বাহ্য একাকিত্বের তীব্রতায় মুখর হয়ে উঠেছে। বাস্তবে যদি হীরামনের বেদনা শুধুমাত্র একজন অপরজনের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ারই বেদনা হতো তা হলে তা এত জীবন্ত, এত সর্বজনীন হয়ে উঠতো না।

সংবেদনশীল শিল্পী ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র রচনাকৌশলে হীরামন ও হীরাবাঈয়ের যে সহজ, সরল, অনুভূতিপ্রবণ নিঃস্বার্থ যৌন প্রেমের ছবি সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে অঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যে কোথাও অস্বাভাবিকতা নেই। স্মরণীয় যে গল্পটির মধ্যে ঘটনা, চরিত্র, বিষয় বৈচিত্র্য সব দিক দিয়ে 'তিসরী কসম উর্ফ মারে গয়ে গুলফাম' একটি শিল্পসার্থক গল্প।

যথার্থ রোমান্টিকতাই গল্পটির প্রাণ। বলরামপুরে নাচের দিন আঙিনায় রোদ্দুর, জল ভরতে গিয়ে যুবতীদের কোলাহল (খিল-খিল হাসি), মিঠা রুটি, গরুর গলার ঘন্টি, ধানের শীষের দোলন, মিঠা সুগন্ধিত চাল, রূপার দ্বিরাগমনের গাড়িতে গন্ধতেল ও টিপ সিঁদুরের গন্ধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিহারের লৌকিক জীবন, ভদ্রেতর শ্রেণীর লোকায়ত সংস্কার এবং তাদের আচার-আচরণ ফণীশ্বরনাথ রেণুর এই গল্পটিতে বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পটির মধ্যে প্রতীক রূপচিত্র, প্রকৃতি-অলৌকিক। সংগীতের মধুর সুর গল্পটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। ফণীশ্বরনাথ রেণুর গল্পের বিশেষত্ব হল কাহিনীর চরম মুহূর্তে পাঠক যখন ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীন হয় সেই মুহূর্তেই কাহিনীর ঘটনা অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ফণীশ্বরনাথ রেণু জীবনমুখী লেখক ছিলেন। তিনি বিহারেরই অধিবাসী তাই বিহারের গ্রাম্য মানুষদের স্বার্থপরতা, কূপমণ্ডুকতা, উদারতা প্রভৃতি দিকে

তাঁর যেমন বিশেষ পরিচয় ছিল, তেমনি মধ্যবিত্ত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। 'লাল পান কী বেগম' এমনই একটি গল্প। এই গল্পটির মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনচর্যা, তাদের প্রকৃতি তাদের জীবনের বেলাভূমি থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। গল্পটিতে পূর্ণিয়া জেলার ফারবিসগঞ্জ অঞ্চলের জীবনচিত্র পরিপূর্ণ পরিবেশে পরিস্ফুট হয়েছে। গল্পটিতে তথ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা তার আশা-নিরাশা, উৎকণ্ঠা গল্পটির শেষ লগ্নে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। 'লাল পান কী বেগম' গল্পটিতে শুধুমাত্র কাহিনীর অবয়বের মধ্যেই যে জটিলতা আছে তাই নয় লেখকের জীবনোপলব্ধির মধ্যেও নানা তত্ত্ব আভাসিত হয়েছে। কিন্তু লেখক তাঁর বিমূর্ত ভাব প্রকাশের মাধ্যম স্বরূপ যে চরিত্রদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তারা স্থানীয় সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছে, লেখকের চিন্তা বা ভাবনার ভারবাহী যন্ত্রে পরিণত হয়নি।

'ঠুমরী' গল্পসংগ্রহের পর 'আদিম রাত্রি কী মহক' ফণীশ্বরনাথ রেণুর দ্বিতীয় কাহিনীসংগ্রহ। এই গ্রন্থটিতে চৌদ্দটি গল্প:সংকলিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি গল্পের নাম 'এক আদিম রাত্রি কী মহক'। এই গল্পটির নামানুসারে এই সংগ্রহটির নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এখানে স্মরণীয় যে "এক"-কে বাদ দিয়ে গ্রন্থটির নাম শুধুমাত্র আদিম রাত্রি কী মহক রাখা হয়েছে অর্থাৎ এই সংগ্রহের সমস্ত গল্পগুলির মধ্যেই সেই আদিম রাত্রির মহক আছে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে যে আদিম রাত্রির মহক কি? আমার মনে হয় এই নামকরণের মধ্য দিয়ে রেণু মানুষের জীবনের মূল প্রবৃত্তি বা যৌন সম্বন্ধে সম্পৃক্ত সে বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের সবগুলি গল্পের মধ্যে এই মহক পাওয়া যায় না।[১২] একথা ঠিক যে রেণুর রচনায় যৌনপ্রবৃত্তির প্রতি এক সহজ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তাঁর ভাষা এবং শব্দপ্রয়োগের আদিমতায়, কিন্তু এই গ্রন্থের কয়েকটি গল্পে যৌন প্রবৃত্তির একটুও মহক নেই।

এই গ্রন্থের গল্পগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই পর্বে রেণু অনেক বেশি অন্তর্মুখী, সূক্ষ্মতর আর গল্পগুলির প্রকাশভঙ্গীও ব্যঙ্গবক্র, অন্তর্গূঢ়। প্রথম পর্বের গল্পগুলিতে গ্রামের লোকেদের শহরের প্রতি যে অন্ধ মোহ তার জন্য পঞ্চবট ছায়া, অবারিত মাঠ, সহজ সরল জীবনকে ছেড়ে স্বার্থপরতা, কৃত্রিমতা, আত্মম্ভরিতা, যান্ত্রিকতা পরিপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল নগরজীবনে এসে সে নিজেকে

হারিয়ে ফেলে। রেণুর এই পর্বের গল্পগুলিতে গ্রামজীবনের এই ভাঙন, গ্রামীণ সমাজের ত্রুটি, নীচতা, উদাসীনতা, অস্তিত্বহীন মানসিকতার সঙ্গে নগর-জীবনের স্বার্থপরতা, বিশৃঙ্খলা, সরকারী কর্মচারীদের অর্থলোলুপতা, দায়িত্বহীন অব্যবস্থা ও বিশেষ করে রাজনীতি-রাজনীতিকদের রাজপুত, কায়স্থ, ভূমিহার ও হরিজন সমস্যা ইত্যাদি পরিস্থিতিকে তাঁর গল্পের মধ্যে জীবন্ত করে তুলেছেন।[১৩] 'বিঘটন কে ক্ষণ' এবং 'উচ্চাটন' ইত্যাদি গল্পগুলির মাধ্যমে এগুলি তিনি খুবই সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন।

'উচ্চাটন' গল্পের নায়ক রামবিলাস গ্রাম থেকে পালিয়ে পাটনা শহরে চলে আসে এবং জীবিকা হিসেবে রিক্শা চালানোর কাজ বেছে নেয়। বেশ টাকাও রোজগার করে। দু বছর পর সে যখন গ্রামে ফিরে যায় তখন তার পোশাকে, কথাবার্তায়, চাল-চলনে সব কিছুর মধ্যেই শহরের সুস্পষ্ট ছাপ। সে গ্রামে এসে প্রথমে মহাজন মিশির মহারাজের সব দেনা শোধ করে দেয়। তার সমবয়েসী সঙ্গীদের মনভরে খাওয়ায়। তখন গ্রামের অনেক যুবকই তার সঙ্গে শহরে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন রামবিলাস জানতে পারলো যে তারই অনুপস্থিতিতে শিবধারী যে তার বাড়ির দেখাশোনা করতো সে তার স্ত্রী ঝুমকীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত, তখন রামবিলাসের মনের সব আনন্দ উবে যায়। নগরের প্রতি মোহও তার কেটে যায়। শহরে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সে আবার গ্রামেই থেকে যায়। তার এই পরিবর্তনে গ্রামের যুবকেরাও শহরে যাওয়ার সংকল্প ছেড়ে দেয়। ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' খুবই সহজভাবে গ্রামের লোকদের নগরের প্রতি আকর্ষণ আলোচ্য গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন: গ্রাম থেকে পালানোর একমাত্র কারণ আর্থিক বিপর্যস্ততা আর শহরের মধ্যে শিল্পবিকাশের অনিবার্যতা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পগুলি মনস্তত্ত্বমূলক। 'আজাদ পরিন্দে', 'কাকচরিত', 'জড়ায়ু মুখড়া', 'নৈনাজোগিন', 'এক আদিম রাত্রি কী মহক' ইত্যাদি গল্প-গুলিতে পুরুষ এবং নারীর চিরন্তন প্রেম ও যৌনপ্রবৃত্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের 'তব একলা চলরে', 'জলবা', 'পুরানী কহানী, নয়া পাঠ' এবং 'আত্মসাক্ষী' ইত্যাদি গল্পগুলি সমসাময়িক রাজনৈতিক দলের নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা, জাতিবাদকে বিষয়বস্তু করে রচনা করেছেন। যারা প্রকৃতই জনসেবার জন্য সবকিছু ত্যাগ করে, বাস্তবেই যারা প্রকৃত দেশসেবক, সমাজ-সেবক রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে তাকেই সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছনা ভোগ

করতে হয় যা তিনি 'আত্মসাক্ষী' গল্পটিতে 'গণপতে'র চরিত্রের মধ্যে উদ্ঘাটিত করেছেন। এ সম্বন্ধে ড পরমানন্দ শ্রীবাস্তব বলেছেন, "রেণু নে ইতিহাস অউর সময় কে আঘাত কা অনুভব করনে বালে মনুষ্য কো বিশেষ অঞ্চল কে বীচ সে উদ্‌ঘাটিত করনা চাহা।"[১৪]

গণপত ইতিহাস এবং সময়ের আঘাতকে মেনে নিয়েছিল, তাকে এই যুদ্ধের যোদ্ধারূপে এঁকে রেণু তার চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন। তার পরাজয়ের মধ্যেই মানবীয় মূল্যের যে জয় হয়েছে তাতে একটা সুন্দর বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চারপাশের ঘটনা ও মানুষ লেখককে প্রেরণা জুগিয়েছে মনোবিকলন, মনোবিকার ও মনোগহনের জটিল রহস্য নিয়ে গল্প লিখতে, যা এই পর্বের শেষ গল্প 'পুরানী কহানী, নয়া পাঠ'-এ অঙ্কিত হয়েছে।[১৫] কোশী নদীর বন্যার পটভূমিতে একদিকে গ্রাম্য মানুষের স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা এবং পরস্পর দলাদলির চিত্র, অপরদিকে রাজনীতির ষড়যন্ত্রের উপর গল্পটি রচিত।[১৬] বন্যা আসায় সাধারণ লোকের দুঃখকষ্টের শেষ নেই। কিন্তু রাজনীতির খেলোয়াড়গণ এরই মধ্য দিয়ে নিজের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এই গল্পটির সঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'বন্যা' গল্পটির একটা বিশেষ মিল আছে। উভয় শিল্পীর রচনায় সেই একই মানবিকতা, একই সমকাল ও একই পরিবেশে দুজনেই সমাজ-জীবনের সেই চিরন্তন সত্য রেষারেষি, জাতপাত ও গ্রাম্য মানুষের কলহ ও তাদের মনের পঙ্কিলতাকে দেখিয়েছেন। অপরদিকে রাজনৈতিক দল ও কিছু রাজনৈতিক নেতাদের বন্যাকে কেন্দ্র করে প্রভাব বিস্তারের জন্য যে ষড়যন্ত্র তাকে জীবন্ত করেছেন।

মানুষের অন্তর্লোকের জটিল রহস্য উন্মোচনে লেখকের দক্ষতা 'রসপ্রীয়া' 'টেবুল' 'তিন বিন্দিয়া' 'তীর্থোদক' 'টেস' 'পঞ্চলাইট' 'সিরপঞ্চমী' গল্পগুলির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে। মানবমনের গহনে যে বিচিত্র জটিল রহস্য আছে তার সবটুকু এখনো হিন্দী সাহিত্যের পাঠকের গোচরে আসেনি।[১৭] তাঁর সাহিত্যগুরু সতীনাথ ভাদুড়ীর মত ফণীশ্বরনাথ রেণু মানবমনের জটিলতা উন্মোচনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[১৮]

১। প্রেমেন্দ্র মিত্র : ভূমিকা, 'সিন্ধুর স্বাদ' (গল্প সংকলন), ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬০।

২। ড. মৈত্রেয়ী ঘোষ : সতীনাথ ভাদুড়ী : বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়, পৃ ২৪০।

৩। ভবানী মুখোপাধ্যায় : 'মহৎ লেখকের শেষ উপন্যাস', সতীনাথ স্মরণে (সম্পাদক সুবল গাঙ্গুলী), পাটনা পৃ ১৩৭।

৪। ড. মৈত্রেয়ী ঘোষ : সতীনাথ ভাদুড়ী : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়, পৃ ২৪২।

৫। বিমল কর : 'সতীনাথ ভাদুড়ী—যেমন ভেবেছি', দেশ, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৬৫।

৬। ড. মৈত্রেয়ী ঘোষ : সতীনাথ ভাদুড়ী : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়, পৃঃ ২৪২।

৭। সতীনাথের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা—হরদা হাটের সুপরিচিত "দুবে-দুবেনী" সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, 'ইতিকথা', সতীনাথ স্মরণে, পৃ ১০।

৮। ফণীশ্বরনাথ রেণু কী কহানিয়াঁ, পৃ ৩১৩।

৯। অগিনখোর কে কথা সূত্র, সারিকা, রেণু স্মৃতি অঙ্ক, পৃ ৬০-৬১।

১০। নঈ কাহিনী সন্দর্ভ প্রকৃতি : ড. নামবর সিং, পৃ ১৯৪।

১১। ঐ ... ... পৃ ১৯৫।

১২। ড. রামদরশ মিশ্র : হিন্দী কহানী : এক অন্তরঙ্গ পহচান, পৃ ১২৩।

১৩। বিবেকী রায় : স্বতন্ত্রোত্তর হিন্দী কথাসাহিত্য এবং গ্রামজীবন, এলাহাবাদ, ১৯৭৪, পৃ ১৪৪।

১৪। ড. পরমানন্দ শ্রীবাস্তব, হিন্দী কহানী কী রচনা প্রক্রিয়া, কানপুর, ১৯৬৫, পৃ ২৭৭।

১৫। লক্ষ্মণ দত্ত গৌতম : আধুনিক হিন্দী কহানী-সাহিত্য মে প্রগতি-চেতনা, দিল্লী, ১৯৭২, পৃ ৩৮১।

১৬। শিবপ্রসাদ সিংহ : আধুনিক পরিবেশ অওর নওলেখন, এলাহাবাদ, ১৯৭০, পৃ ১৫৬।

১৭। সন্তবক্স সিং : নঈ কহানী : কথা অউর শিল্প, এলাহাবাদ, ১৯৭৩, পৃ ১৬০।

১৮। রাজেন্দ্র যাদব : কহানী : স্বরূপ অওর সংবেদনা, দিল্লী, ১৯৬৮, পৃ ৮৮।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ক. উপসংহার

বাংলা ভাষার ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী এবং হিন্দী ভাষার ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু উভয়েই মানবতার পূজারী। উভয়েই সাহিত্যে মানবতাবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বৃহত্তর সমাজবোধে ভাবিত হয়ে ভাদুড়ী এবং রেণু আমাদের সমাজজীবনের সব অসঙ্গতিকে তীব্র আঘাত হেনেছেন। বিদ্বেষ না থাকলেও শ্লেষের অভাব তাতে নেই। উভয়েই সংযত হৃদয়াবেগে সমগ্র ভারতবর্ষকে আপন করে নিয়েছিলেন। স্মরণীয় যে উভয়ের মূল সাহিত্য-প্রেরণার শিকড় প্রোথিত ছিল উত্তর বিহারের এক বিশিষ্ট অঞ্চলের রুক্ষ প্রকৃতি এবং তার মধ্যে প্রতিপালিত অনগ্রসর মানুষগুলির জীবনাচরণের মধ্যেই।

সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বরনাথ রেণু উভয়েরই বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতে জন্ম, কর্মস্থল এবং সাহিত্য সাধনা, এমনকি উভয়ের মৃত্যুও ঘটে বিহারেই। সতীনাথ যেমন যৌবনে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকে অনেকবার কারাবরণ করেছেন, ঠিক তেমনি রেণুও ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন। উভয়েই রাজনৈতিক জীবনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি হয়েছিলেন।

জন্ম এবং কর্মসূত্রে উভয়েই উত্তর বিহারের হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলের পথ-ঘাট মাঠ প্রান্তর জনজীবন ও তাদের বিচিত্র জীবনচর্যার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর যেমন সতীনাথ রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন ঠিক তেমনি ফণীশ্বরও রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

উভয়ে এইভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তাঁদের কাছাকাছি যেসব সাধারণ মানুষ ছিলেন তাঁদের কেউই দুজনের মন থেকে অপসৃত হননি। উভয়েই ঐ সব মানুষের জীবনাচরণের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন। তাই

উভয়ের স্পষ্ট উপন্যাসগুলিত ঐসব মানুষের জীবনচিত্র গভীর মমতায়, অপরিসীম শ্রদ্ধায়, অশেষ যত্নে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁদের সরল সহজ জীবন, অভাব অনটন সুখের দুঃখের ও হৃদয়ের ভাষা, শক্তিমানের প্রতি আনুগত্য, সংস্কার ইত্যাদি সবকিছুই উষ্ণ আবেগে সতীনাথ এবং রেণুর সাহিত্যকর্মে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বিহারের কৃষিজীবী মানুষগুলির উচ্চাবচ জীবনকথা উভয়েই বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষভাবে শিল্প-কুশলতায় তুলে ধরেছেন।

সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথের উপন্যাসগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উভয়ের রচনাতেই শুধুমাত্র হিন্দীভাষী মানুষের জীবনযাপনের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উভয়ের বাঙালী চেতনা মূলত প্রবাসী বাঙালীদের কেন্দ্র করে বিবর্তিত। সতীনাথ ছিলেন বাঙালী আর রেণু আজীবন বাঙালীদের সাহচর্যে বাস করেছেন এমনকি পরবর্তীকালে লতিকা ঘোষ নাম্নী জনৈকা বাঙালী সেবিকা (নার্স) কে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই বাংলা ও বাঙালীর প্রতি তাঁর ছিল ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তারই ফলে তাঁর উপন্যাসে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বিহার-প্রবাসী বাঙালী বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু চরিত্র স্থান পেয়েছে। এরই পাশাপাশি সতীনাথের রচনায় তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতালব্ধ সম্পূর্ণ অন্যদেশী চরিত্র রয়েছে। ঠিক তেমনি রেণুর রচনাতেও নেপাল প্রবাসের অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু উপাদান এবং রাজনৈতিক ঘটনা স্থান পেয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী যেমন তাঁর 'জাগরী' উপন্যাসে একদিকে মার্কসবাদ এবং অপরদিকে গান্ধীবাদ—এইটি আধুনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন রেণুও তেমনি তাঁর 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসের কাহিনী উক্ত দুই মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন। সতীনাথ 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' ঢোঁড়াই-এর মানসিক পরিবর্তনে গান্ধীবাদের প্রসঙ্গ এনেছেন, তেমনি রেণু তাঁর 'পরতী পরিকথা' এবং 'মৈলা আঁচল' উপন্যাসে কালীচরণ, বালদেব ও মুন্সী জলধারী দাসের চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে গান্ধীবাদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিষয়ের বিচারে সতীনাথ ও রেণু উভয়েই উত্তর বিহারের অনগ্রসর পূর্ণিয়া অঞ্চলের গ্রামকেন্দ্রিক লেখক। একজনের উপন্যাস 'জিরানিয়া', অপরজনের 'মেরীগঞ্জ'-এর জীবনকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। দুটি গ্রামই রুক্ষ ধূসর

এবং পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এত মিল সত্ত্বেও উভয়ের মানসিকতার পার্থক্য দুস্তর, দৃষ্টিভঙ্গির বৈসাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

সতীনাথের উপন্যাসে প্রকৃতি প্রেক্ষাপটমাত্র, মূল লক্ষ্য সেই প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষ। অপরপক্ষে ফণীশ্বরনাথ রেণুর চিন্তা প্রকৃতির রূপে প্রায় আচ্ছন্ন বললেই চলে। অর্থাৎ ফণীশ্বরের সৃষ্ট চরিত্রকে তার প্রকৃতি থেকে পৃথক করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে আমরা তাঁর 'তিসরী কসমে'র হীরামন, 'মৈলা আঁচলে'র কমলী, কালীচরণ, বালদেব প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে পারি।

এঁরা উভয়েই স্বভাবশিল্পী ছিলেন। কোনো কষ্টার্জিত রীতিসিদ্ধ প্রয়াস বা আরোপিত কোন চিন্তা এঁদের রচনায় দেখা যায়নি। তবু রেণু সতীনাথ অপেক্ষা অনেক বেশী সমাজসচেতন লেখক। অনুরূপে রেণু তাঁর রচনাগুলিতে সৃষ্টিশীলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সতীনাথও বিদগ্ধ মননশীল লেখক ছিলেন কিন্তু তাঁর বৈদগ্ধ কখনই শিল্পচেতনাকে আচ্ছন্ন করেনি।

এছাড়া মানবপ্রেমের ক্ষেত্রেও উভয়ের সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় দরদ দুজনেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে প্রকাশ করেছেন। রেণুর মানবপ্রেম সহজ অনাড়ম্বর প্রকৃতিধর্মী। সতীনাথের ক্ষেত্রে এই মানবপ্রেম ব্যাপকতর পরিধিতে ব্যক্ত।

মার্কসবাদ গান্ধীবাদ আঞ্চলিকতা মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোর প্রতি অকৃত্রিম দরদ ইত্যাদি বিষয়ে সতীনাথের সঙ্গে ফণীশ্বরের মিল আছে ঠিকই কিন্তু রেণু যেমন কোনদিনই সতীনাথের মতো মার্জিত বৈদগ্ধের অধিকারী ছিলেন না অন্যদিকে সতীনাথও তাঁর নাতিদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে রেণুর মতো বৈচিত্র্য ও বিশালতা অর্জন করতে পারেননি। এইখানেই উভয়ের মধ্যে মিল এবং পার্থক্য ও এই সূত্রেই দুজনের সাহিত্যকৃতির আলোচনার যথার্থতা।

খ. গ্রন্থপঞ্জী

॥ বাংলা ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনা সম্পর্কিত আলোচনার তালিকা ও হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর রচনা সম্পর্কিত আলোচনার তালিকা ॥

ক) বাংলা ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনা সম্পর্কিত আলোচনার তালিকা :

১। সতীনাথ গ্রন্থাবলীর চারটি খণ্ডের ভূমিকা :

সতীনাথ গ্রন্থাবলী : প্রথম খণ্ড

সতীনাথ ভাদুড়ী : প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা (পৃষ্ঠা ক-য) এই ভূমিকায় তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই তিনটি প্রবন্ধের রচয়িতা ও প্রথম প্রকাশ :

১) অতুলচন্দ্র গুপ্ত : প্রথম প্রকাশ 'দেশ' পত্রিকায় (১৩৫২ সালের ৩০শে চৈত্র)।

২) নীরেন্দ্রনাথ রায় : প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৫২ সালের ১০ ভাদ্র।)

৩) গোপাল হালদার : (প্রথম রচনাকাল ১৩৫৩ সালে রচনাটি 'বাংলা সাহিত্যে মানব স্বীকৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত)।

সতীনাথ ভাদুড়ীর গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ প্রসঙ্গে আছে—

ক) আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত হিন্দী 'জাগরীর' প্রাক্কথন।

খ) হিন্দী জাগরীর প্রকাশকের নিবেদন।

গ) জাগরীর ইংরেজী অনুবাদ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্নী শ্রীমতী লীলা রায়। তার ভূমিকা।

ঘ) নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'গণনায়ক' গল্পগ্রন্থের আলোচনা। এই আলোচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে।

ঙ) এবং নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত (একাদশ সংখ্যা, ১৩৭২) সুবিমল বসাক রচিত প্রবন্ধের উল্লেখ আছে।

সতীনাথ গ্রন্থাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড

সতীনাথ ভাদুড়ী : নিঃসঙ্গ দীক্ষা (পৃষ্ঠা ক-দ)

সতীনাথ ভাদুড়ী গ্রন্থাবলী : তৃতীয় খণ্ড

সতীনাথ ভাদুড়ী : অসম্পন্ন সাধনা (পৃষ্ঠা ক-ঠ)

সতীনাথ গ্রন্থাবলী : চতুর্থ খণ্ড

সতীনাথ ভাদুড়ী : জীবনযাপন (পৃষ্ঠা ক-ঢ়)

সতীনাথের মৃত্যুসংবাদ : চিরনিদ্রায় জাগরী লেখক সতীনাথ আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃষ্ঠা ১-৩, (১ এপ্রিল, ১৯৬৫)

সতীনাথ ভাদুড়ী : কমলাকান্তের আসর (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ এপ্রিল, ১৯৬৫)

(এই প্রবন্ধ সম্পর্কিত পত্র আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষুতে প্রকাশিত হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৫৬.)।

পত্রলেখকদ্বয় সুবল গঙ্গোপাধ্যায় ও মন্মথ মজুমদার।

বি. দ্র. সতীনাথের মৃত্যুতে কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত শোকসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা আনন্দবাজার পত্রিকায় 'সতীনাথ স্মরণে' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

॥ সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনা সংগ্রহ ॥

সতীনাথ বিচিত্রা : সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২।

বইটির সমালোচনা দেশ পত্রিকার পুস্তক পরিচয় বিভাগে বেরোয়।

সমালোচনা : দেশ, পুস্তক পরিচয়, ১৯৬৫, পৃ ১১২৯-১১৩০।

বিস্মৃত লেখক : সনাতন পাঠক, দেশ, সাহিত্য সংবাদ, ১৯৭২।

সতীনাথ স্মরণে : সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত।

সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা : গোপাল হালদার।

সতীনাথ ভাদুড়ী আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায় : ড. মৈত্রেয়ী ঘোষ।

সতীনাথ জীবন ও সাহিত্য : ড. সন্তোষকুমার ঘোষ।

সতীনাথ ভাদুড়ী ও ঢোঁড়াই চরিত মানস : স্বস্তি মণ্ডল।

সতীনাথ ভাদুড়ী ও আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায় : ড. মৈত্রেয়ী ঘোষ।

উল্লিখিত বই দুইটির একত্রে আলোচনা করেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকার 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে

(শিরোনাম : সতীনাথ চর্চায় সহায়ক হবে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ আগস্ট, ১৯৮৫)

সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ, বেঙ্গল পাবলিশার্স।

সমালোচনা : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৮৩।

সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার 'গ্রন্থলোক' বিভাগে ড. মৈত্রেয়ী ঘোষের 'সতীনাথ ভাদুড়ী আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়' গ্রন্থটির সমালোচনা সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ও জীবন এই শিরোনামে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬তে প্রকাশিত হয়, পৃ ৯৩-৯৫ ।

স্থান কালের নিকষে : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থটির সমালোচনা সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার 'গ্রন্থলোক' 'বিভাগে মিতভাষী এবং মিতলেখক' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয় ২৬ জানুয়ারী, ১৯৮৫।

সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা : 'জলার্ক', তৃতীয়-চতুর্থ পঞ্চম সংকলন কার্তিক, ১৩৮৭—আষাঢ়, ১৩৮৮।

বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি : নাজমা জেসমিন চৌধুরী।

'কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস' এই অধ্যায়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসের আলোচনা আছে, পৃঃ ২১৩-২২২।

জাগরী চরিত্রে ও চেতনায় : শঙ্কর ঘোষ।

বইটির আলোচনা করেন অজিতকুমার ঘোষ, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬)।

বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা : ড মহীতোষ বিশ্বাস লিখিত এই গ্রন্থটিতে সতীনাথ ভাদুড়ীর সম্পর্কে আলোচনা আছে।

॥ সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ ॥

ক) সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখায় আদিবাসী ও অবহেলিত মানুষ: শঙ্কর ঘোষ। বেতার জগৎ, ১৬-৩১ জানুয়ারী, ১৯৮৩, ৫৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বেতারের কথিকার সম্পাদিত সংস্করণ।

খ) আধুনিক এপিক : ঢোড়াইচরিত মানস : ড. অশ্রুকুমার শিকদার
'পরিচয়' আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮০।

গ) বাঙালীর ফরাসী চর্চা : স্বপন দাসাধিকারী
অন্বিষ্ট : ফরাসী সাহিত্য সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৭।

ঘ) সতীনাথ প্রসঙ্গে : ফণীশ্বরনাথ রেণু
কৃত্তিবাস, অগ্রহায়ণ, ৮১।

ঙ) পূর্ণিয়া ও সতীনাথ : সুবল গঙ্গোপাধ্যায়
স্মরণিকা, বিহার বাঙালী সমিতি, পাটনা, আগস্ট, ১৯৮১।

চ) বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাস : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিলাদিত্য, জুলাই, ১৯৮১।

ছ) তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই : রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
বীক্ষণ, শারদ সংকলন, ১৯৭৭।

জ) সতীনাথ সাহিত্য : বীণা রায়,
শারদীয় কথাসাহিত্য, পঞ্চবিংশ বর্ষ, কার্তিক, ১৩৮০, পৃ ১৯০-১৯৬।

ঝ) সতীনাথ ভাদুড়ী : রাজনীতি ও সাহিত্য : ইরাবান বসু রায়
অনুষ্টুপ, ২, ৩, ৪, সংখ্যা, ১৩৮৬, পৃ ৪৭-৪৮।

ঞ) সতীনাথ ভাদুড়ী : আশা দেবী
অমৃত নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৭৬।

দেশ পত্রিকার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে 'পুরাতনী' শিরোনামে এই পত্রিকায় অতীতে প্রকাশিত নির্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়। এর মধ্যে সতীনাথের 'মধুসূদন ও লা ফঁতেন' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়, এর লেখক পরিচিতি, দেশ ২০ আগস্ট, ১৯৮৩, (পুরাতনী, পৃ ৫৭)।

কৌশিকী—রজত জয়ন্তী সংকলন, পূর্ণিয়া, ১৩৮৯, গ্রন্থটিতে সতীনাথ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ আছে :

ক) প্রসঙ্গ—সতীনাথ, পৃ ৭

খ) সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী : আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য : দিলীপকুমার সেন, পৃ ১০।

গ) সতীনাথ ভাদুড়ীর ভ্রমণ প্রসঙ্গ : (প্রবন্ধ) : অরূপকুমার ভট্টাচার্য, পৃ ১০।

ঘ) স্মৃতিচারণা : পূর্ণিয়ার অগ্রী সাহিত্যিক : সন্তোষকুমার মজুমদার, পৃ ১১।

খ(স্মৃতিচারণায় লেখক দাদামশায় বনফুলের সঙ্গে সতীনাথেরও স্মৃতিচারণ করেছেন।)

কথাসাহিত্য (৩৪ বর্ষ, দশম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৯০)

সাহিত্যে কে থাকে কে যায় ? এই শিরোনামে শ্রীপ্রসিত রায়চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এতে সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা আছে।

(১৩৭৯, ১৩৭৯, ১৩৮০, ১৩৮৫, ১৩৮৮)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জাগরী পাঠের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে চিঠির দর্পণে' দেশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, পৃ ৪৮।

দেশ ২২ পৌষ, ১৩৭৩, গোপীনাথ মোহান্তির সাহিত্য আলোচনায় (সনাতন পাঠক, সাহিত্য সংবাদ, দেশ) সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রসঙ্গ আছে, পৃ ১০, ২৯)

জলার্ক সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা সংক্রান্ত, সত্যযুগ, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১।

দৈনিক বসুমতী, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮১।

পাটনার সুবল গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি খণ্ডিত সংবাদ দিয়েছেন। দেশ ও অমৃত পত্রিকায় ১৯৭৬-এ জুন থেকে ডিসেম্বর-এর মধ্যে সুবলবাবুর দুটি লেখা বেরিয়েছে। একটি প্রবন্ধ দিল্লী থেকে প্রকাশিত বাগর্থ-তে। সতীনাথ ও রেণুর তুলনামূলক আলোচনাও তিনি করেছিলেন, এছাড়া সতীনাথ স্মরণের সমালোচনা বেরিয়েছিল পরিচয় অমৃতবাজার আনন্দবাজার রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, অমৃত এবং পাটনার দৈনিক সার্চলাইট পত্রিকায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় বাংলা উপন্যাস ও জাগরী : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সারস্বত পত্রিকা, শারদীয়, ১৩৮৮, পৃ ১৯৩-২০৯। জনপদের জাগরণ : বিজন ভট্টাচার্য-এর উপন্যাস : সুবীর রায়চৌধুরী, গান্ধর্ব, আশ্বিন, ১৩৯৪, পৃ ৬২।

জলার্ক : জগদীশ গুপ্ত সংখ্যাতে শেষভাগে সতীনাথ অনুপূরক ক্রোড়পত্র (ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম সংকলন শ্রাবণ, ১৩৮৮—চৈত্র ১৩৮৮) সংশ্লিষ্ট হয়েছে, এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি হচ্ছে :

ক) জাগরীর বাস্তব : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

খ) রামায়ণী প্লট ও ঢোঁড়াই : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ) সতীনাথ : প্রাসঙ্গিক তথ্য

ঘ) সতীনাথ ভাদুড়ী বিষয়ক রচনাপঞ্জি

১৯৪২-৪৩ সালে সতীনাথের দুইবার গ্রেপ্তারের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সতীনাথ ভাদুড়ী : আশুতোষ দেব সংকলিত 'বাংলা অভিধান' পৃ ১৩০২

সমালোচনার নামতা ও ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী : উদয়নারায়ণ সিংহ, গাঙ্গেয় পত্র, তৃতীয় সংকলন, আশ্বিন, ১৩৮৩, পৃ ১২-২৯।

: হিন্দী বই ও প্রবন্ধ :

ক) বনতুলসী কা গন্ধ : ফণীশ্বরনাথ রেণু

ভারত যাযাবর সম্পাদিত দিল্লীর রাজকমল প্রকাশন থেকে ১৯৮৬তে প্রকাশিত গ্রন্থে সতীনাথের কথা আছে, 'ভাদুড়ীজী' পৃ ১১৩।

রেণু স্মৃতিগ্রন্থ (১ম খণ্ড) : (রেণু স্মরণ অওর শ্রদ্ধাঞ্জলি)

প্রোফেসর রামবুঝাবন সিং এবং ড. রামবচন রায় সম্পাদিত রেণু স্মরণ এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি (পাটনা, ১৯৭৮) পৃ ৮১। এতে সতীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে ফণীশ্বরনাথের আলোচনা আছে।

রেণু স্মৃতিগ্রন্থ : (২য় খণ্ড), পাটনা, ১৯৮৩।

ঙ. সিয়ারাম তেওয়ারীর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাতে সতীনাথের আলোচনা আছে।

সারিকা : (১-৫ এপ্রিল, ১৯৭৯)

শ্রীকানাইলাল নন্দনের 'রচনাকর কী বিরাসত' শীর্ষক প্রবন্ধে শীর্ষক প্রবন্ধে সতীনাথের আলোচনা আছে।

গবেষকের সতীনাথ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ :

বাংলা উপন্যাসো মে হিন্দী গদ্যাবতরণ (২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৭)

রাঁচি একসপ্রেস

ঢোঁড়াইচরিত মানস কী প্রতিছবি নহী হৈ মৈলা আঁচল (৩ জুলাই,) ১৯৮৮), প্রভাত খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

খ) ॥ হিন্দী ঔপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর রচনা সম্পর্কিত আলোচনার তালিকা ॥

আঞ্চলিক উপন্যাস অউর রেণু : ড. সত্যনারায়ণ উপাধ্যায়, প্রকাশক, সঞ্জয় প্রকাশন বারাণসী, ১ম সং, ১৯৮০।

কথাকার ফণীশ্বরনাথ রেণু : ড. চন্দ্রভানু সোনবনে প্রকাশক : পঞ্চশীল প্রকাশন, ১৯৭৯।

কাহিনীকার ফণীশ্বরনাথ রেণু : রাজ বৈনা

ফণীশ্বরনাথ রেণু কী উপন্যাসকলা : কুসুম সোকাই, বসুমতী, ১৯৬৮।

রেণু কা আঞ্চলিক কথা সাহিত্য : পূর্ণ দেব আশা প্রকাশন, ১৯৭৩।

রেণু স্মরণ আউর শ্রদ্ধাঞ্জলি : সম্পাদক রামবৃন্দাবন সিং এবং ড. রামবচন রায়, নবনীতা প্রকাশন, পাটনা, ১৯৭৮।

রেণু কতত্ব অউর কৃতিয়া : সম্পাদক ড. সিয়ারাম তেওয়ারী, নবনীতা প্রকাশন, ১৯৮৩।

সারিকা রেণু স্মৃতি অঙ্ক (১-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯)

ফণীশ্বরনাথ রেণু 'ঋণ জল ধন জল', নিউ দিল্লী, ১৯৭৭

শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য : সতীনাথ গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড) অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ ৪৯৫।

'বনতুলসী কী গন্ধ' সম্পাদক ভারত যাযাবর, রাজকমল প্রকাশন, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪।

নেপালী ক্রান্তিকথা : রেণু, রাজকমল প্রকাশন, পাটনা

শ্রুত অশ্রুতপূর্ব : ফণীশ্বরনাথ রেণু, রাজকমল প্রকাশন, দিল্লী।

দিনমান : মার্চ ১৯৭৪, এপ্রিল, ১৯৭৪, জুন ১৯৭৬, এপ্রিল, ১৯৭৭।

ধর্মযুগ (২৭ মার্চ, ১৯৭৬) ওমি সিংহের প্রবন্ধ

ধর্মযুগ (২৩ মার্চ, ১৯৭৫) ফণীশ্বরনাথ রেণু সে এক ভোবার্ত্ত সাক্ষাকর্ত্তাগীতা।

ধর্মযুগ (৫ জুন ১৯৭৭) ফণীশ্বরনাথ রেণু নিজে লিখেছেন—

বহুত বড়া আঘাত হৈ য়হ। অবতো সোচ ঝিনায়া হে। অভী লোহ লোহ রহী সোচ রহা থা অব ইস জালিম সরকার কা এহসান নহী লুঁগা। য়হ পদ্মশ্রী কী উপাধি ভী লৌটা দুঁগা।

ইণ্ডিয়ান নেশন : এপ্রিল ১৯৭৪, জুলাই, ১৯৭৫

বিবেক শিখা জুন ১৯৮৮ (ষষ্ঠ অঙ্ক)

ফণীশ্বরনাথ রেণু কে জীবন অউর সাহিত্য মে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ : শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অনুবাদ : ড. নন্দিতা ভার্গব।

□